অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৮

অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প

কৌশিক বসু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় অর্থনীতির সব কটি দিক তথা বহির্বিশ্বের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা থাকছে অর্থনীতি-গ্রন্থমালায়। লেখকসূচীতে আছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন বাঙালী অর্থনীতিবিদ্। সাধারণভাবে জিজ্ঞাসু পাঠকের উপযোগী করে লিখিত এই রচনাবলীর ভঙ্গি সহজ, ভাষা স্বাদু ও প্রাঞ্জল।

এ-যাবৎ বেরিয়েছে যে-সাতটি গ্রন্থ :

ভবতোষ দত্তের
ভারতের আর্থিক উন্নয়ন

অশোক রুদ্রের
ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি

প্রণব বর্ধনের
রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থা ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি

ধীরেশ ভট্টাচার্যের
ভারতের বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক লেনদেন

মণিমোহন মুখোপাধ্যায়ের
ভারতীয় জাতীয় আয়

অম্লান দত্তের
শতাব্দীর প্রেক্ষিতে ভারতের আর্থিক বিকাশ

অমর্ত্য সেনের
জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি

9 788172 153076

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনীতিবিদ্ হিসেবে কৌশিক বসুর পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত। তা সত্ত্বেও, এই বইতে অন্তর্ভুক্ত নানান বিষয়ে লেখা টুকরো-টুকরো প্রবন্ধগুলিতে সে-পাণ্ডিত্য তিনি কতটা জাহির করেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। কেননা, তা একেবারেই করেননি।

তাই বলে কি এ-গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলি লঘু কিংবা লেখকের বক্তব্য অগভীর ? না, তেমন ভাবলেও ভুল হবে। অর্থনীতির গূঢ় তত্ত্ব ও জটিল নানান ব্যাপারস্যাপারকে কতদূর সহজবোধ্য ভঙ্গিতে পরিবেশন করা যায়, এ-গ্রন্থে তারই উজ্জ্বল উদাহরণ পাতায়-পাতায় ছড়ানো।

যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন কৌশিক বসু, বলতে গেলে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা কৌতূহলী। কেননা, আমাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গেই এসব বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। যেমন, কলকাতার মেট্রোরেল, বাড়িভাড়া আইন, মাইনে ও পার্কস অর্থাৎ অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা, মেধাক্ষরণ, খুচরো পয়সার সংকট, বাজেট, বিলাসদ্রব্য প্রভৃতি। পাশাপাশি, তৃতীয় বিশ্বের ঋণ কিংবা সোভিয়েতে অর্থনৈতিক পেরেস্ত্রৈকা। প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে গভীর তবু প্রাঞ্জল আলোচনা এই বইতে।

ISBN 81-7215-307-4

জন্ম : ৯ জানুয়ারি, ১৯৫২ । কলকাতায় ।
পড়াশোনা : কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স্ কলেজ এবং লন্ডন স্কুল অফ্ ইকোনমিক্স । অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের তত্ত্বাবধানে লন্ডন স্কুল থেকে পিএইচ. ডি ।
বর্তমানে দিল্লী স্কুল অফ্ ইকোনমিক্সের অধ্যাপক । এ-ছাড়াও পড়িয়েছেন লন্ডন স্কুল অফ্ ইকোনমিক্স, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং দেশ-বিদেশের আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে ।
Econometric Society'র Fellow এবং ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কাউন্সিল মেম্বার । ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত Social Choice & Welfare-এর সম্পাদক, লন্ডন স্কুল থেকে প্রকাশিত Journal of Public Economics-এর সম্পাদকীয় উপদেষ্টা, এবং বিশ্বের আরো অন্যান্য জার্নালের সঙ্গে জড়িত । ১৯৮৯ সালে মহলানবিশ স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত ।
প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *Revealed Preference of Government* (Cambridge University Press), *The Less Developed Economy* (Basil Blackwell, Oxford) এবং *Lecture in Industrial Organisation* (Basil Blackwell, Oxford) । হাল্কা একটি প্রবন্ধের বই, *Of People, of places: Sketches from an Economist's Notebook*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ।
শখ : ছবি আঁকা ও ভ্রমণ । দর্শনেও সমান আগ্রহী ।

প্রচ্ছদ □ প্রবীর সেন

অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৮

অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৮

প্রধান সম্পাদক ভবতোষ দত্ত
সহকারী সম্পাদক ধীরেশ ভট্টাচার্য

অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প

কৌশিক বসু

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৪
পঞ্চম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৬

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7215-307-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

ARTHANITIR YUKTI TARKA O GALPA
[Essay]
by
Kousik Basu

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশোক রুদ্র-র স্মৃতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশকের নিবেদন

'অর্থনীতি গ্রন্থমালা'র অষ্টম গ্রন্থ কৌশিক বসুর 'অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প'-এর প্রাথমিক সম্পাদনকালে অধ্যাপক অশোক রুদ্রের আকস্মিকভাবে জীবনাবসান হয়। পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে বইটি সম্পাদনা করেছেন 'অর্থনীতি গ্রন্থমালা'র বর্তমান সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য।

১৯৮৪ সালে অর্থনীতি গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অধ্যাপক অশোক রুদ্র এই গ্রন্থমালার পরিকল্পনা ও প্রকাশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রন্থমালার অষ্টম গ্রন্থ 'অর্থনীতির যুক্তি তর্ক ও গল্প' প্রকাশের মুহূর্তে অধ্যাপক রুদ্রের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

বাংলায় বই প্রকাশের প্রস্তাবনা প্রথম এসেছিল অধ্যাপক অশোক রুদ্রের কাছ থেকে। আমার হ্যাঁ বলতে সময় লাগেনি কেন না বাংলায় দক্ষতা আমার যত কম বাংলায় উৎসাহ ঠিক সেই পরিমাণেই বেশি। উৎসাহের আর একটা কারণ বইটা প্রকাশিত হবে কলকাতা থেকে। পৃথিবীতে কিছু শহর আছে যেগুলো ছেড়ে গিয়েও ছাড়া যায় না। কলকাতা ঠিক ওই রকম। তাই, লেখার মাধ্যমে, আমার ছেলেবেলার শহরের সঙ্গে আর একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করার কথা ভেবে ভালো লেগেছিল খুব

কিন্তু হ্যাঁ বলা এক আর কাজে করা আর এক।. যদিও এই বই-এর বেশির ভাগ প্রবন্ধ পূর্বে ইংরেজীতে লিখেছিলাম এবং বাংলায় অনুবাদ অশোকদা দায়িত্ব নিয়ে করিয়ে দিলেন, তাও নিজে কিছু কিছু অদল বদল করার, কিছু নিজে বাংলায় নতুন করে লেখার ইচ্ছে ছিল। ভাগ্যিস অশোকদা রেগে যেতেন নইলে বই-এর এই শেষ কাজটুকু করতে আরো অনেক সময় লাগত। যেখানে অন্য লোকেরা চিঠি শেষ করেন লিখে ''Please reply soon'', সেখানে অশোক রুদ্র লিখতেন, ''Reply soon, for heaven's sake''। তা সত্ত্বেও শেষের দিকে, বহু কাজে আটকে পড়ে, কিছু মাস বই-এর কাজে গাফিলাতি হলো। মাত্র সাত আট দিনের কাজ বাকি তাও বসা হচ্ছিল না।

২৯ শে অক্টোবর, ১৯৯২, Indian Statistical Institute থেকে বেশ রাত্তিরে বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ মনে হলো অশোকদাকে অনেকদিন চিঠি দেওয়া হয়নি। কি লিখব চিঠিতে, বইয়ের কি কি ব্যাপারে ওনার পরামর্শ নিতে হবে, মনে মনে তার ফর্দ করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। পরের দিন ভোর বেলা Economic Times খবরের কাগজ হাতে নিয়ে প্রথম খবর চোখে পড়ল : অধ্যাপক অশোক রুদ্র আগের দিন শান্তিনিকেতনে মারা গেছেন।

ভীষণ হতাশ লাগল। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও অর্থনীতির অনেক ব্যাপারে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, অশোকদা ছিলেন বন্ধুর মতো। এছাড়া এই বইয়ের প্রতিটি পদে ছিল ওনার উৎসাহ এবং সাহায্য। তাই এই বইটা অশোকদার স্মৃতিতে উৎসর্গ করলাম।

আমার ধারণা আধুনিক বাংলার চেতনায় একটা বিরাট দ্বন্দ্ব আছে। যেটা হওয়া উচিত এবং যেটা বাস্তবে হয় সেই দুইয়ের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব। তাই আমরা মানতে পারি না যে বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন হওয়া উচিত ছিল, যেমন হলে ন্যায়সংগত হত, আসলে তেমন নয়। তাই আমরা মানতে পারি না যে আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যে অনেক অন্যায় অবিচার আছে। এটা দুঃখের ব্যাপার কিন্তু এটা সত্য। অপ্রিয় সত্যের দিক থেকে আমাদের সকলেরই মুখ ঘুরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেই ইচ্ছের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। আমার বইয়ের বহুবিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে যদি কোনও মূল বক্তব্য থাকে তবে সেটা এই। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করার সময় এই pragmatism-কে বর্জন করলে আমাদের দেশেরই ক্ষতি হবে।

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি বহু বছর ধরে লেখা। লিখতে চেষ্টা করেছি সাধারণ ভাষায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার যে সব সরঞ্জাম—অঙ্ক জ্যামিতি এবং পরিসংখ্যান—সব বাদ দিয়ে, প্রতিদিনের কথা সব মানুষের জন্য লেখা।

বই লেখার সময় অনেকেই সাহায্য করেছেন আমাকে। অনুবাদক ছিলেন শ্রীসুব্রত বসু। আমার research assistant ছিল সুমিত্রা পাল। ওর কাছে এবং শ্রীবসুর কাছে কৃতজ্ঞ। হালকা ভাষায় ছোট প্রবন্ধ লেখার গোড়াপত্তন করেছিলাম অধ্যাপক মৃণাল দত্তচৌধুরির প্রস্তাবে বহু বছর আগে। আশা করি উনি ওনার উপদেশের ফলাফল দেখে খুব একটা হতাশ হবেন না। যাঁরা মতামত দিয়ে এবং আলোচনা করে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য, অর্ঘ্য ঘোষ, সৌম্য মিত্র এবং কেয়া মিত্র।

শীতের রোদে, গ্রীষ্মের উত্তাপে এবং শ্রাবণ মাসে বর্ষার বিরতিতে দিল্লি স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের কফি হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে বহু অর্থনীতিবিদ যুক্তি, তর্ক ও গল্পের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

২৫ জুলাই ১৯৯৩ **কৌশিক বসু**
দিল্লি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচীপত্র

১ অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতি ১১-৩৬
অর্থনীতি ও সংশয়বাদ ১৩
ব্যাঙ্গালোরের সম্মেলন ১৫
পুঁজিবাদের অপটু ফেরিওয়ালা ১৭
মিল্টন ফ্রিডম্যানের মতামত ২০
অর্থনৈতিক ভাগ্য গণনা ২৫
জেরার্ড দেব্রু ২৭
মোরিস আলে ২৯
কেইন্‌সের নানারূপ ৩২
সাম্য-অসাম্য ৩৫

২ স্বদেশ-চিন্তা ৩৭-৬৭
ডাম্পিং ৩৯
পয়সা সংকট ৪১
মোটরগাড়ি শিল্পের সংরক্ষণ চাই ? ৪৩
মেধা ক্ষরণের ক্ষতি ৪৫
বিলাস-সামগ্রী নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে ৪৭
দুর্নীতির আভিজাত্য ৪৯
যথোচিত মাত্রার দুর্নীতি ৫১
মৌলকাঠামোর প্রতিবন্ধ ৫৪
সরকারের ভূমিকা উৎপাদন বনাম নিয়ন্ত্রণ ৫৬
মজুরি ও বেতনের সূচকীকরণ ৬০
মূল্যস্ফীতি বনাম সঞ্চয় ৬২
মাইনে বনাম উপরি সুবিধা ৬৪
কয়েকটি বাণিজ্য বিষয়ক ভুল ধারণা ৬৬

৩ বাজেট ও রাজস্ব ৬৯-৮৪
মূল্যস্ফীতি আর করফাঁকি ৭১
সততার স্থিতিস্থাপকতা ৭৫
ভারতের রাজস্বনীতি : প্রভাবজোটের তোষণ ৭৭
আমাদের অর্থনীতি ও বাজেট ৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪ স্থানীয় প্রসঙ্গ ৮৫-৯৪
স্লান ভোল্টেজের শহর ৮৭
কলকাতার মেট্রো ৮৯
একটি গ্রামের আলাপ-আলোচনা ৯১
বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ৯৩

৫ সীমানা পেরিয়ে ৯৫-১০৮
যোগান-পন্থী অর্থনীতি ৯৭
নব্য সমষ্টিগত অর্থনীতি ও স্ট্যাগফ্লেশন ৯৯
সোভিয়েতে অর্থনৈতিক পেরেস্ত্রইকা ১০১
তৃতীয় বিশ্বের ঋণ ১০৩
জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধি ১০৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয় ১০৭

৬ কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্ন ১০৯-১৫১
বাজার, ক্ষমতা ও সামাজিক অনুশাসন ১১১
অর্থনৈতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব ১২১
কারণ ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব ১৩১
উপসাগরীয় যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের রাজস্ব নীতি ১৪৩

নির্ঘণ্ট ১৫৩-১৫৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১
অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনীতি ও সংশয়বাদ

একটা গল্প আছে এক ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টকে নিয়ে—দীর্ঘদিন তাঁর উপরওয়ালা মন্ত্রীর নিগ্রহ সয়ে সয়ে শেষে ভদ্রলোক পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন এক স্বকীয় কায়দায়। এক মহতী সভায় মন্ত্রিবর বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেটি যথারীতি সেই সিভিল সার্ভেন্টেরই লেখা 'মূল্যস্ফীতি, মন্দা (recession), বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি—এগুলোই আজকের সবচেয়ে জরুরি সমস্যা। কিন্তু এগুলো শুধু উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়। আমি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আজ আলোচনা করতে চাই তা হল এগুলোর ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি ?' এখানে পৃষ্ঠা শেষ। পাতা উল্টে তিনি দেখেন লেখা রয়েছে : 'এবার আপনি নিজে বলুন।'

অর্থনীতির চরিত্র ধরা পড়েছে গল্পটিতে। এ বিদ্যা—বা অন্তত তার কিয়দংশ—সাধারণ লোকবুদ্ধির অগম্য নয়, আবার যখন-তখন যে-কারো অনায়াস ভাষণেরও বিষয় নয় তা। ফলে বিদ্যায়তনের নিভৃতি থেকে কোলাহলমুখর জনজীবন অবধি এক অদ্ভুত বিষয়সংকুল এলাকা পরিক্রমা করতে হয় অর্থনীতিবিদকে। এ দেশের বিষয়-আশয়ে—সরকারি ব্যাপারে, বেসরকারি ক্ষেত্রে, বা প্রচারমাধ্যমে—উত্তরোত্তর গত এক দশক জুড়ে, বিশেষত হাল আমলে, অর্থনীতির গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। তবু, বা হয়তো সেজন্যই, জনমনে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বুজরুকির অভিযোগ যত উঠেছে, তত আর কোনো শাস্ত্রের বিরুদ্ধে নয়।

সন্দেহগুলো পুরোপুরি অমূলক নয়। অর্থনীতিবিদদের পেশার বহুবিচিত্র সম্ভাবনার কারণেই এতে বুজরুক আর জালিয়াতের সমাবেশ ঘটেছে অন্য যে কোনো বিদ্যানির্ভর পেশার চেয়ে বেশি, সম্ভবত মনস্তত্ত্বের চেয়েও। কিন্তু তাই বলে এ বিজ্ঞানটিকে ঢালাওভাবে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না। বুঝতে হবে যে অর্থনীতিবিদেরাও অনেকাংশে পুরানো মহার্ঘ বস্তুর কারবারিদের মতোই—কেউ সাচ্চা, কেউ ঝুটা। এ দুইয়ের মধ্যে তফাৎ করা শাস্ত্রটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব্যতিরেকে এক রকম অসম্ভব।

খাঁটি অর্থনৈতিক গবেষণা অন্য যে কোনো বিজ্ঞানেরই সমান মৌলিকতা, কল্পনাশক্তি এবং সাধনা দাবি করে। তবে অর্থনীতির এ দিকটা লোকের অচেনা, সাধারণ মানুষের নাগালে সবচেয়ে সহজে আসে শাস্ত্রটির লৌকিক দিকগুলি, রঙচঙে চিত্তাকর্ষক মোড়কে ঢাকা। অর্থনীতির নাম খারাপ হবার একটা কারণ এটাই—অতিবিজ্ঞাপন। কোনো কোনো হোমিওপ্যাথ ডাক্তার যেমন রোগী হারানোর ভয়ে ক্যান্সার থেকে গলব্লাডারের স্টোন পর্যন্ত সব কিছু বিনা অপারেশনে সারিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, আজকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনীতিবিদও তেমনি কখনও কবুল করেন না যে কোনো কোনো সমস্যার সমাধান তিনি জানেন না।

উপদেষ্টা ব্যবসায় (consultancy) রাতারাতি লাল হওয়ার নেশায় আমরা বিজ্ঞানোচিত সংশয়বাদকে জলাঞ্জলি দিয়েছি। অথচ অনেক বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারার অক্ষমতাকে স্বীকার করার ক্ষমতাই তো বিজ্ঞান ও দর্শনের চরিত্রলক্ষণ। বিশেষত দর্শনে কোনো বিশেষ মত পোষণ না করেও বিশিষ্ট মনীষী হওয়া খুবই সম্ভবপর। Pyrrho ছিলেন গোঁড়া সংশয়বাদী, কদাপি কোনো বই লেখেননি। Wittgenstein তাঁর জীবৎকালে একটি মাত্র গ্রন্থ লিখেছিলেন, সেটারও আবার অনেকটাই তিনি বর্জন করেছিলেন পরবর্তী কালে। Russell লিখেছিলেন অনেক, কিন্তু নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ীই ছিলেন সংশয়বাদী।

অর্থনীতি অবশ্য সর্বমত পরিহারের চরমতম বৈরাগ্য দাবি করে না। কিন্তু তাই বলে এটা ভোলা উচিত নয় যে সংশয়বাদ পুরোপুরি বিসর্জন দিলে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা খোয়াতে হবে, এমন কি যেসব বিষয় আমরা সত্যি বুঝি সেগুলোতেও।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাঙ্গালোরের সম্মেলন

পার্থেনিয়ামে আমার অ্যালার্জি নেই। তাই রাত্রি ন'টা নাগাদ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের গুমোট বাহনটি থেকে ব্যাঙ্গালোরের চনমনে হাওয়ায় বেরিয়ে এসেই মন খুশি হয়ে উঠল। সুটকেশের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ইন্ডিয়ান ইকনোমেট্রিক সোসাইটির যে ভদ্রলোক আমায় নিতে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে একটু হালকা আলাপের চেষ্টা চালালাম 'ডিনারটা হাতছাড়া হয়ে যায়নি তো?'

'আজ্ঞে না স্যর, ডিনার রয়েছে আপনার জন্য সম্মেলনের জায়গাতে।'

ঘনায়মান নীরবতা ভাঙার প্রয়াসে আবার বললাম 'Lance Taylor পৌঁছে গেছেন কি?'

ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন তিনি। 'লাঞ্চের জন্য স্যর কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' আমি আর কথা বাড়ালাম না। এর পর যদি তাঁর মনে হয় সে রাত্রে প্রাতঃরাশ মিলবে কিনা জিগ্যেস করছি, তাহলে নির্ঘাৎ আমাকে ফেলে পালাবেন তিনি।

সেই পেশাদার সম্মেলনের আলাপ-আলোচনার বিবরণে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ হওয়ার কথা নয়। অতএব ইকনোমেট্রিকস, সমীকরণ আর বীজগণিত ডিঙিয়ে সোজা চলুন ৬ জানুয়ারিতে।

সেদিন সকালের বিষয় ছিল 'ভারতবর্ষে পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা'। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অর্থনীতিবিদ, টেকনোক্র্যাট আর যাঁদের বলা চলে ইকনোক্র্যাট। দেখে ভালো লাগল, বেশ কিছু নামজাদা অর্থনীতিবিদ—কেউ কেউ এমন কি সরকারের উপদেষ্টাও—বাস্তববাদী হয়ে সরকার ও অর্থনীতির ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

যেমন সুখময় চক্রবর্তী বললেন তিনি দেশের অর্থনীতি নিয়ে 'গভীরভাবে চিন্তিত'—শুধু এ বছর বা আগামী বছরের জন্য নয়, মাঝারি মেয়াদের ফলশ্রুতি সম্পর্কেও (medium-term prospect)। ব্রহ্মানন্দ উল্লেখ করলেন যে সপ্তম যোজনা কালে আমাদের প্রবৃদ্ধি-হার বার্ষিক শতকরা চারে নেমেছে, কৃষিতে গত তিন বৎসর ব্যাপী অচলতাই নিশ্চয় তার প্রধান কারণ। উক্ত অধিবেশনের সভাপতি জি. ভি. কে. রাও এবং অন্যান্যরা এ মতে সায় দিলেন।

যোজনার অর্থসংস্থানের পন্থাসংক্রান্ত নানা প্রশ্নও আলোচিত হল। এক বক্তা যুক্তি দেখালেন যে আমাদের ব্যাংকগুলি যে স্বল্পকালীন সুদ দেয় তা খুবই কম, প্রায় দুই অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে নগণ্য। টাকা তাই ব্যাংক থেকে সোজা চলে যাচ্ছে বেসরকারি ক্ষেত্রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা অসাধারণ রকমের গভীর না হলেও তার সমালোচনামূলক মেজাজে একটা নতুনত্ব ছিল—গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কাগজে যা বেরোচ্ছিল তা তো অর্থহীন গদ্‌গদ প্রশস্তি মাত্র। একটু বিষয়ান্তরে গিয়ে বলে রাখা ভালো, অতীতের খরার সময়গুলির তুলনায় আমাদের এ বছরের খতিয়ান কিছুটা ভালো হলেও এত তাড়াতাড়ি উল্লসিত হওয়া ঠিক হবে না। খরার পর মাত্র ছ' মাস কেটেছে—সামনের বছরে সত্যি সত্যি বোঝা যাবে কতটা 'খরা-প্রুফ' আমাদের অর্থনীতি।

তাছাড়া মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) শতকরা ১·৭ ভাগ প্রবৃদ্ধি-হার এ বছর আশা করা হচ্ছে তাতেও খুশি হওয়ার কিছু নেই। অনপেক্ষ বিচারে তা খুবই নিচু। এর পূর্ববর্তী খরার বছর ১৯৭৯-তে প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা -৪·৭ ভাগ, তার তুলনায় আমাদের 'সাফল্য' অতিরঞ্জিত হয়েই দেখা দেয়। আমাদের প্রবৃদ্ধি-পথ নাকি এখন উচ্চতর, কিন্তু তাহলে প্রবৃদ্ধি-পথ থেকে বিচ্যুতির মাপে নিশ্চয় আমাদের বর্তমান অবস্থা ১৯৭৯-র থেকে খুব ভালো নয়।

এ-ও মনে রাখা ভালো যে খরার মাত্রা মাপা হয় দেশব্যাপী বৃষ্টিপাতের একটা গড়পড়তা সূচক দিয়ে, অথচ কৃষি বিপুলভাবে নির্ভরশীল অঞ্চলভেদে সেই বৃষ্টিপাতের তারতম্যের উপর। কিছু প্রমাণ আছে যে কয়েকটি জলসেচ-বিরল এলাকায় এ বছর খরা তত তীব্র হয়নি। বিহারের কোনো কোনো অংশে তো চমৎকার বৃষ্টি হয়েছে, ফলনও হয়েছে প্রচুর। অর্থাৎ সামগ্রিক বৃষ্টিপাতের দিক থেকে এটা যদি স্বাধীনতা-উত্তরকালের তীব্রতম খরা হয়েও থাকে তবু খরার আঞ্চলিক তারতম্যের দিক থেকেও অবস্থাটা তা-ই কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। সুতরাং বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সঙ্গে গলা মিলিয়ে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে আমাদের অর্থনীতি 'খরা-প্রুফ' হয়ে গেছে।

৬ তারিখ সকালের অধিবেশনে মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল 'ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও অঞ্চল সমূহের' মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যবৃদ্ধির উপর। আমাদের সমাজে অসাম্য সত্যিই অপরিমেয় কিন্তু তা আমাদের জীবনের এমন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে তা নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্ক হয়-ই না। একজন বক্তা বললেন, আমাদের শিল্পের বহু-বিজ্ঞাপিত প্রবৃদ্ধি ধনীদের ভোগ্যসামগ্রীর প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ আর তাই চলতি অসাম্যের পরিপোষক।

এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে এ দেশে আয়ের বন্টন সরকারি পরিসংখ্যানে যা দেখা যায় তার চেয়ে ঢের খারাপ, কারণ অসাম্যের সরকারি পরিমাপের ভিত্তি সাদা আয়। কালো টাকা যোগ করলে চিত্রটা আরো মলিন হয়ে ওঠে, কেননা কালো টাকা প্রায় পুরোপুরিই বড়লোকের কব্জায়। অর্থাৎ সরকারি পরিসংখ্যানে যা দেখা যায় ধনীরা তার চেয়ে বেশি ধনী, যদিও গরিবদের অবস্থা তথৈবচ।

তারপর সেই অতিপুরাতন সাক্ষরতার প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রগতি শোচনীয়, যদিও শ্রীলংকা ও চীনের মতো প্রতিবেশীদের সাফল্য মন্দ নয়। দেখা গেল আমাদের সাফল্য সবচেয়ে কম, প্রযুক্তিগত মাধ্যমিক শিক্ষায়—দক্ষিণ কোরিয়া এ দিক থেকে ভালোই করেছে, যা তার চমৎকার প্রবৃদ্ধির এটা একটা বড় কারণ।

এক বক্তা আমাদের পরিকল্পনাকারীদের তারিফ করলেন এই বলে যে তাঁরা ভুল স্বীকারে প্রস্তুত। তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। আশা করা যাক, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের পরিকল্পনাকারীদের আর এইভাবে প্রশংসা অর্জন করতে হবে না।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঁজিবাদের অপটু ফেরিওয়ালা

জর্জ গিল্ডারের 'সম্পদ ও দারিদ্র্য' অনেকেরই মতে 'এ দশকের সেরা প্রতিশ্রুতিময় গ্রন্থ', 'ধীশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিতে অনন্য', রাজনীতিবিদ ও আমলাদের অবশ্যপাঠ। বইটি মনে হচ্ছিল কিনসের সৌধকে চিরতরে ধ্বসিয়ে দেবে, বিভ্রান্তিমোচন করবে তা-ই নয়, অবসান ঘটাবে কল্যাণরাষ্ট্রের যত মায়াজালেরও (তার সামাজিক নিরাপত্তা ও বেকারভাতা সহ), আনবে পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ।

বইটা লেখা বেশ উদাত্ত ভঙ্গিতে 'সম্পদ ও দারিদ্র্য অর্থনীতির প্রধান বিচার্য, কিন্তু বিষয় দুটি এত বিশাল ও এত গুরুত্বপূর্ণ যে শুধু অর্থনীতিবিদের হাতে তাদের ছেড়ে দেওয়া যায় না।' সন্দর্ভটি পুঁজিবাদের ও ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপের পক্ষে তিনশো ছ' পৃষ্ঠা ব্যাপী সওয়াল, রীতিমতো দাপট ও মুন্সিয়ানার সঙ্গে করা। শব্দ উদ্ভাবনে ও সংযোজনে, বিশেষণ ওলটপালটে একজন সমাজবিজ্ঞানী সালমান রুশদির যত কাছাকাছি যেতে পারেন গিল্ডার তা গেছেন। অবশ্য ব্যবধান তবু যথেষ্টই, কারণ লিখনশৈলী মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম ঠেকে, পাঠককে সহায়তা না করে প্রতিহত করে। আমাকে বেশ কয়েক বার অভিধান ওল্টাতে হয়েছে, কোনো গড়পড়তা রাজনীতিবিদ একে অবশ্যপাঠ্য রূপে নিতে গেলে যে তাঁর কি হাল দাঁড়াবে তা চিন্তা না করাই ভালো। উপরন্তু গুচ্ছ গুচ্ছ সমার্থক বাক্যাংশ ব্যবহারের গিল্ডারীয় রীতির দরুন বইটাকে অনেক জায়গায় রজেটের থিসোরস (thesaurus) বলে ভুল হয়।

তবু গিল্ডারের লেখার দক্ষতা এবং ভাষার উপর দখল মানতেই হবে। বইটা দুর্বল বিশ্লেষণে যুক্তিগুলো অসম্পূর্ণ, শিথিল, বাজে। এ দিক থেকে রক্ষণশীল মার্কিন লেখকদের মধ্যে তাঁর হাল নিশ্চয় সবচেয়ে শোচনীয়। মিল্টন ফ্রিডম্যান পড়ুন, সারাক্ষণ আপনাকে সজাগ করে রাখবেন তিনি। বিশ্লেষণ প্রাঞ্জল, ব্যবস্থাপত্র স্পষ্ট। গিল্ডার ঠিক তার উল্টো। তিনি শুধু মার্কিন উদারপন্থীদের থেকে নিজেকে পৃথক করতে ব্যস্ত নন, অন্য রক্ষণশীল চিন্তাবিদদের থেকেও। গলব্রেথ ও ফ্রিডম্যান উভয়েই তাঁর কশাঘাতের লক্ষ্য। দুর্ভাগ্য এটুকুই যে তাঁর নিজের অবস্থান আগাগোড়া তালগোল-পাকানো। তিনি Laffer curve-এ বিশ্বাস করেন, যারা করে না তাদের ব্যঙ্গ করেন, কিন্তু নিজের বিশ্বাসের সপক্ষে কণামাত্র প্রমাণ দাখিল না করে এগিয়ে চলেন নির্বিকার ভাবে।

অধিকাংশ পরিসংখ্যান তাঁর কাছে সন্দেহজনক ঠেকে। যেমন ধরুন, আমার মতে সমাজ সম্পর্কে একটি নিদারুণ মন্তব্য 'শতকরা ২ ভাগ পরিবার মোট পারিবারিক সম্পদের শতকরা ৪৪ ভাগের মালিক।' কিন্তু তাঁর কাছে এ মন্তব্য, এবং সাধারণভাবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিসংখ্যান, বিভ্রান্তিকর। কেন ? তাঁর যুক্তি হল 'পরিসংখ্যান অন্তর্নিহিতভাবে স্থাণু।' কি এর অর্থ ? আমি বুঝি না, আমার ধারণা গিল্ডারও বোঝেন না, কারণ এই মোক্ষম জায়গায় এসেই তিনি ভেসে যান অসার বাক্যস্রোতে 'পরিসংখ্যান বিভাজনগুলি (distributions) অন্তর্নিহিতভাবে স্থাণু, ঠিক যেন শহরের আকাশে উঁচিয়ে থাকা কোনো প্রকাণ্ড কোম্পানির সদর দপ্তরের ছবি—সিঁড়ি নেই, এসকালেটর নেই, এলিভেটর নেই, বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠরত বড় সাহেব নেই।'

বারে বারেই এটা ঘটে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রচলিত কোনো প্রকল্প ধরেন তিনি, সাড়ম্বরে যুক্তি শুরু করেন, পাঠকের আশা জাগিয়ে তোলেন, তারপর হঠাৎ রঙিন কথার হরিলুট লাগিয়ে দেন ; আপনি সম্বিৎ ফিরে পেতে পেতে গিল্ডার পিছলে গেছেন গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনো বিষয়ের দিকে। একই কারবার সব কিছু নিয়ে—টাকার পরিমাণতত্ত্ব, সে-র নিয়ম, কীনস বা ওয়ালরাস। কিছুক্ষণ টাকার পরিমাণতত্ত্ব আলোচনার পর তিনি বলছেন 'পরিমাণ তত্ত্ব প্রতিটি মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচ (deflation) ব্যাখ্যা করতে পারে ও ভ্রান্ত কর্মপন্থার সর্বনাশা ফলাফল প্রমাণ করতে পারে এটা প্রতিপন্ন না করেই যে, দামের স্তরের (price level) ইতিহাস সবচেয়ে ভালোভাবে অনুধাবন করা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার জয়গাথা রূপ—কলাশিল্পের, বিজ্ঞান ও হুজুগের, টেকনোতন্ত্রী ও টেকনোবিদ্বেষীর, আলু আর কম্প্যুটারের, পেনিসিলিন ও এটম বোমার...বিবরণ রূপে নয় যদিও এ সবই...' ইত্যাদি। চিত্তচমৎকারী লেখা, তবে কাব্য না সমাজবিজ্ঞান ?

এই ঘূর্ণিপাকের মধ্য থেকে কয়েকটা বিষয় অবশ্য বেরিয়ে আসে। গিল্ডার সৃজনশীলতা ও প্রগতিতে বিশ্বাসী। কর লোককে আপন সৃষ্টির ফল থেকে বঞ্চিত করে। তাই তিনি তার বিরোধী। তিনি সামাজিক নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কারণ তা প্রগতির তাগিদ কমিয়ে দেয়। সমাজতন্ত্র তিনি খারিজ করেছেন তা বড় বেশি আদর্শবাদী বলে নয়, বরং তিনি নিজে আদর্শবাদী বলে, অবাধ পুঁজিবাদ নিয়ে তিনি অলীক স্বপ্নে ভরপুর।

'প্রতিটি ব্যক্তি নিজ স্বার্থ অনুসরণ করতে থাকলেই সমাজ কাম্য পথে চলবে।' অ্যাডাম স্মিথ বা তাঁরও আগে থেকে এই হয়ে এসেছে পুঁজিবাদের প্রথাগত ভিত্তি। গিল্ডার কিন্তু এর সঙ্গে একমত নন মানুষ স্বার্থপর নয় বলেই, মানুষ পরার্থপর বলেই, তাকে সৃজন ও উদ্ভাবনের স্বাধীনতা দিতে হবে।

অথচ দুনিয়াটা তিনি যত সহজ সরল ভাবেন তা ঠিক নয়। এখানে বৃদ্ধেরা আছে, অশক্তরা আছেন, প্রয়োজন তাঁদের অন্যদের চেয়ে কম নয় বরং বেশি, যদিও ক্ষমতা তাঁদের সীমিত। ব্রিটেনের ত্রিশ লক্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ততোধিক আর ভারতে অজানা সংখ্যক বেকারদের সবাই অলস ও অকর্মণ্য নয়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির একটু হাওয়া-বদলেই চাকরি চলে যেতে পারে সদ্য পাশ করা এঞ্জিনিয়রদের, ফ্যাশনের সামান্য হেরফেরে নাপিতদের আয় নেমে যেতে পারে জীবনধারণের সীমার নিচে। এই সব ওলটপালটের সামনে ব্যক্তি হিসাবে আমরা অসহায় বলেই প্রয়োজন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার। সে ব্যবস্থার অপব্যবহার কিছু হওয়াটা খুবই সম্ভব, কিন্তু তাই বলে ব্যবস্থাটা জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না নিশ্চয়।

ভুল ভাববেন না যেন। গিল্ডারের মধ্যে নিষ্ঠুরতা নেই কোনো রকম। তিনি যে দুঃস্থের প্রয়োজনগুলি বাতিল করে দিয়েছেন তা মোটেই নয়—তাঁর বিপুলবিস্তৃত আলোচনাসীমা এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত অবলোকনের মধ্যে এসব বিষয়ে তাঁর সচেতনতার কোনো নিদর্শন মেলে না, এই মাত্র। লোকটি বেশ বদান্য বলেই মনে হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ('ঈশ্বর হচ্ছেন সকল সজীব জ্ঞানের মূলাধার')। তাঁকে আমার প্রতিবেশী রূপে পেতে (বিশেষত এখনকার একজনের পরিবর্তে) ভালোই লাগবে, কিন্তু তাঁর সমাজ আলোচনাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা থেকে যায়।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮২)

জর্জ গিস্ডারের 'ওয়েলথ অ্যান্ড পভার্টি' বইটির সমালোচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলটন ফ্রিডম্যানের মতামত

১

মিলটন ফ্রিডম্যানের সাম্প্রতিক বই 'ফ্রি টু চুজ' রচিত হয়েছে ১৯৮০ সালে তাঁর পরিচালিত বহু বিজ্ঞাপিত এক বি বি সি টেলিভিশন সিরিয়ালের ভিত্তিতে। তা তাঁর 'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ফ্রিডম' (সেটাও তাঁর স্ত্রী রোজ-এর সঙ্গে যৌথভাবে লেখা) গ্রন্থের উত্তরসূরি। কোথায় গেল তাঁর microeconomics-এর সেই চমৎকার বই 'প্রাইস থিওরি'র শাণিত বিশ্লেষণ—যার দেখা মিলত পরিভোগ, চাহিদা ও অনিশ্চয়তা সংক্রান্ত ('পদ্ধতিবিদ্যা' ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হল) তাঁর বিবিধ প্রবন্ধেও ! এ বইয়ের একটাই অসংকোচ লক্ষ্য পুঁজিবাদ ও অবাধ অর্থনীতিকে (laissez faire) যথাসম্ভব মোহময় করে হাজির করা।

অবশ্য তাতে চিন্তার কিছু নেই, আসল গোলমাল ফ্রিডম্যানের কৌশলে। বাস্তব তাৎপর্যসম্পন্ন প্রায় প্রতিটি তত্ত্বেরই পক্ষে-বিপক্ষে নানা জোরালো যুক্তি থাকে। যিনি জ্ঞানান্বেষী (নিছক তার্কিক নন) তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত উভয় দিকের সবচেয়ে জোরালো যুক্তিগুলি দাখিল করে পাঠককে কোনা এক পক্ষাবলম্বনে প্রণোদিত করা। ফ্রিডম্যান কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষকে গোটাকয়েক ছেঁদো যুক্তি হাজির করেই অতি দ্রুত সেগুলো খণ্ডন করে দেন। ফলে নেহাৎ আনাড়ি ছাড়া আর কারো সমর্থন লাভ করা এ বইয়ের পক্ষে কঠিন। ভয় শুধু একটাই—বেশ কজন রাষ্ট্রনায়কই সে দলে পড়ে যাবেন।

বইটার প্রশংসনীয় দিক হল সম্পূর্ণ বাগাম্বড়হীনতা। বাঁধা বুলির ঢক্কানিনাদ নেই, সহজ বিষয়কে ঘোরালো করে দেখানো প্রয়াস নেই। অসাম্য সংক্রান্ত অধ্যায়টি ছাড়া আর কোথাও কথার মারপ্যাঁচের আশ্রয় নেননি ফ্রিডম্যান।

বিদ্যাজীবীদের প্রিয় কাজ অন্য বিদ্যাজীবীদের নিয়ে আলোচনা। বইয়ের আলোচনায় যাবার আগে যদি ও কর্ম একটু সেরে নিই, আশা করি পাঠক ক্ষমা করবেন। মিলটন ফ্রিডম্যান বিজ্ঞান ছেড়ে বিতর্ক ধরলেন কেন ? বিচিত্র সব অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে—কেউ তাঁকে দেখেন এক বিশাল ষড়যন্ত্রের অংশীদার রূপে, কেউ বলেন লোকের পিলে চমকে নিজেকে জাহির করাটাই তাঁর ব্যবসা। ফ্রিডম্যানের অনেক রচনা পাঠের পর আমার কিন্তু ওসব সমালোচনা ঠিক মনে হয় না। বেশির ভাগ মানুষকে ফ্রিডম্যান যেমন অক্লান্ত স্বার্থসন্ধানী ভাবেন তিনি নিজেই তা নন। সৎ লেখক তিনি। শুধু তাঁর বিশ্বাসগুলো হল প্রতিকূল প্রমাণের চাপে কোণঠাসা হয়ে-পড়া লোকের বিশ্বাস। অথচ নিজের কোনো মতই ছাড়বেন না তিনি। সমালোচকদের সঙ্গে কোনো সম্মিষ্ঠ আলোচনাতেও যাবেননা—তাই বেশি বেশি করে অবিশেষজ্ঞ পাঠকের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে তাঁকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইয়ের মূল নীতিটি প্রাচীন প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ অনুসরণ করে যাও, তাহলেই সমাজও আপনা থেকে যেন এক অদৃশ্য হস্তের প্রেরণায় চলতে থাকবে ও প্রগতি লাভ করবে। এরই অনুসিদ্ধান্তরূপে বেরিয়ে আসে তারপর বইয়ের অধিকাংশ মূলতত্ত্ব অবাধ বাণিজ্য বাঞ্ছনীয় (প্রথম অধ্যায়), সমাজতন্ত্র মন্দ (পঞ্চম অধ্যায়), উৎপাদনের গুণমাণ নিয়ন্ত্রণ সাধারণভাবে অবাঞ্ছনীয়। কেবল মূল্যস্ফীতির monetarist তত্ত্বসংক্রান্ত নবম অধ্যায় এই মূল নীতি থেকে উদ্ভূত নয়।

যে অনুসিদ্ধান্তটি তিনি সবচেয়ে ভালোভাবে প্রতিপন্ন করেছেন তা হল অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে। এই একটি বিষয়ে আমলারা, সাংবাদিকরা, এমন কি অর্থনীতিবিদরাও হুজুগে অপযুক্তিতে এত বেশি আচ্ছন্ন যে ফ্রিডম্যানের বিশ্লেষণে মন চাঙা হয়ে ওঠে। তাঁর একান্ত উগ্র বিধানগুলির সঙ্গে একমত না হলেও এ কথা মানতেই হবে যে নিয়ন্ত্রণের (intervention) পক্ষে যুক্তিগুলি অন্তত সচরাচরের চেয়ে অনেক বেশি পরিশীলিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন (এবং এ বিষয়ে আমিও তাঁর সঙ্গে একমত) যে সস্তা আমদানির বিরুদ্ধে এই যে এত ব্যাপক হৈ চৈ (যেমন, মার্কিনীরা ক্রমাগত অভিযোগ করে চলেছে জাপানি টিভি আর মোটরগাড়ি সম্পর্কে), তার আসল কারণ এর কুফলটা কেন্দ্রীভূত একটি ছোট গোষ্ঠীর (মার্কিন টিভি ও মোটর গাড়ির শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের) উপর আর সুফল (সস্তা সামগ্রীর আকারে) ছড়িয়ে রয়েছে পুরো জনগণের মধ্যে। প্রচার-আন্দোলন চালানো ব্যাপক জনসাধারণের চেয়ে একটা ছোট সংহত গোষ্ঠীর পক্ষেই বেশি সহজ। তিনি আরো লিখেছেন (কিন্তু এখানে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই), সর্বপ্রকার বাণিজ্য বিধিনিষেধ খারাপ তো বটেই, উপরন্তু অপর পক্ষ বিধিনিষেধ আরোপ করলেও আমাদের তার প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত নয়। বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ মতবাদের মর্মস্থলে—শিশু শিল্পের যুক্তিতে—আঘাত হানতেও তিনি ছাড়েননি। আর তা করেছেন দারুণ দক্ষতার সঙ্গে, এ-ও মানতে হবে।

অন্য সুবিদিত ফ্রিডম্যানীয় মতবাদেরও পুনরাবৃত্তি রয়েছে বইটিতে। সরকারি স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার বাঁধন আলগা করার জন্য voucher scheme-এর বিষয়ে লিখেছেন তিনি। বলেছেন যে ডাক্তাররা সমবেতভাবে একটা কেতাদুরস্ত ট্রেড ইউনিয়ন মাত্র—ডাক্তারি পাশের পরীক্ষা কঠিন করে তাঁরা ডাক্তারের সংখ্যা কমিয়ে রাখেন, যাতে তাঁদের দক্ষিণা মোটা থাকতে পারে। তিনি এ-ও দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে কোনো কিছুর—এমন কি ওষুধেরও গুণমান নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ অতি সাবধানী আমলারা কোনো বিপজ্জনক ওষুধ অনুমোদনেব ঝুঁকি নেওয়ার বদলে বরং দরকারি ওষুধই নিষিদ্ধ করে দেবেন। আমলাদের অতি-সাবধানতার ব্যাপারটা সম্ভবত সত্য, কিন্তু সেজন্য গুণমাণ নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া যেন মাথাব্যথা সারাতে মাথা কেটে ফেলারই সামিল।

অসাম্য প্রসঙ্গে ফ্রিডম্যান অবশ্য অনেক মৃদুভাষী। তাঁর যে পূর্বতন মতবাদটি কোথাও কোথাও microcconomics পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা আমার মতে ভুল এবং বিপজ্জনক। তিনি বলেছিলেন, আয়ের অধিকাংশ অসাম্যই ইচ্ছাকৃত পছন্দের ফল, অতএব তা নিয়ে আমাদের অতিরিক্ত চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এখানে সৌভাগ্যক্রমে সে মতের তীব্রতা কমিয়েছেন তিনি, তথাপি অসাম্য সংশোধনের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে তিনি এখনও রাজি নন— এই ফাঁপরই পঞ্চম অধ্যায়ের জগাখিচুড়ির মূল কারণ। এমন কি, এ-ও বোধ হয় তিনি জানেন যে এই অধ্যায়টিই তাঁর মতবাদের পক্ষে বিপজ্জনক, কেননা অসাম্যের অস্তিত্ব শুধু যে দুয়েকটা অনুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করে তা-ই নয়, তাঁর বিশ্লেষণের ভিতটাই নড়িয়ে দেয়।

মূল্যস্ফীতি সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি হল সমালোচনা ও প্রমাণের বিরুদ্ধে ফ্রিডম্যানদের একগুঁয়েমির নিদর্শন। কয়েক দশক ধরে যা তিনি বলে আসছেন হুবহু তারই পুনরাবৃত্তি এটি সারানোর ইচ্ছে থাকলে মূল্যস্ফীতি একটা নিতান্ত সামান্য ব্যাধি (অধ্যায়টিতে ব্যবহৃত কয়েকটি শিরোনাম হল 'মূল্যস্ফীতির নিকটতম কারণ', 'মূল্যস্ফীতি নিরাময়', 'নিরাময়ের কয়েকটি পার্শ্বফল', 'পার্শ্বফলের উপশম')। তামাম দুনিয়া জুড়ে তুমুল মূল্যস্ফীতি, বাছা বাছা মাথা লেগে আছে এই প্রহেলিকা ভেদের কাজে—এমন সময় শিরোনামগুলো পড়লে মনে হয় যেন ডাক্তারবাবু খসখস করে ক্যান্সারের প্রেসক্রিপশন লিখে হেসে বলছেন চিন্তার কিছু নেই।

ফ্রিডম্যানের তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থের যোগান বৃদ্ধিই মূল্যস্ফীতির কারণ, তাই মূল্যস্ফীতি রোধের জন্য সরকারের একমাত্র কর্তব্য মুদ্রার যোগান হ্রাস করা। সরকার তা করতে চায় না, কারণ মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি হল বিপুল ব্যয় নির্বাহের সহজ পথ তাছাড়া মুদ্রার যোগান হ্রাসের তাৎক্ষণিক ফলাফল সর্বদাই তিক্ত—বেকারি বৃদ্ধি, চাহিদা হ্রাস।

Monetarism-এর সমালোচনাকে আইডিওলজি থেকে পৃথক রাখা উচিত। এটা ঠিক যে রক্ষণশীল আইডিওলজির লোকেরাই সাধারণত monetarism-এ বিশ্বাসী হয়ে থাকেন। কিন্তু monetarism মতবাদটি আসলে কিন্তু মূল্যবোধ নিরপেক্ষ—তা পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী দুই আইডিওলজির সঙ্গেই সমান সঙ্গতিপূর্ণ।

ভারতের তথ্যাদির সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় থাকায় আমার মনে হয় monetarism দিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা মেলে না। মুদ্রার যোগানের সঙ্গে পণ্যমূল্যের একটা যোগ থাকলেও তা ভঙ্গুর, এবং অন্য বেশ কয়েকটি ভেদক (যেমন কৃষি উৎপাদন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া মুদ্রার অর্থের যোগান বৃদ্ধি ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির মধ্যে সময়-ব্যবধান বড় অনিয়মিত।

Monetarism প্রতিপাদন করতে গিয়ে ফ্রিডম্যান যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা-ও econometricianদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। ডেভিড হেন্ড্রি Economica (১৯৮০)-তে প্রকাশিত সাদামাটা তাঁর নিবন্ধে দেখিয়েছেন দরের উত্থান পতন ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি অবলম্বন করলে ব্রিটেনে বৃষ্টিপাতের উপর্যুপরি পরিমাণই অর্থের যোগানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ভেদকরূপে প্রতীয়মান হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে দু-বছর আগে মিলস মূল্যস্ফীতি ও অর্থের যোগানের পরিবর্তন-হারের মধ্যে যে পারম্পর্য পেয়েছিলেন, এক বছর আগে তার চেয়েও জোরালো পারম্পর্য Llewellyn ও Witcomb প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্কটল্যান্ডের বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ও আমাশয়ের প্রকোপের মধ্যে!

বইটা সত্যি নড়বড়ে হয়ে পড়ে কিন্তু সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে ফ্রিডম্যানের নিপুণতার বহর দেখে মনে হয় যেন কোনো সুমো মল্লবীর নেমেছেন ইকেবানা পুষ্পসজ্জার কাজে। সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ভারত ও চীন উভয়কেই সমাজতন্ত্রী জাতি বলে একাকার করে দেওয়া (পৃ ১৭৯) 'রাশিয়া, চীন বা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত সমাজের বেলাতেও তা সমান সত্য (পৃ ১৮১) 'যান্ত্রিক আবিষ্কারে যাদের দিনগত শ্রমের ভার লাঘব হয়নি এমন মানুষ পেতে হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাকে যেতে হবে অ-পুঁজিবাদী দুনিয়ায়—রাশিয়ায়, চীনে, ভারতে, বাংলাদেশে বা যুগোস্লাভিয়া অংশবিশেষে ; (পৃ ৮০) 'পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও কমিউনিস্ট চীন সকলেই, ভোগ করেছে অর্থনৈতিক অচলতা ও রাজনৈতিক নিপীড়ন।'

এমন যাঁর অনুপুঙ্খ-চেতনা তিনি যে সমাজতন্ত্রের বিচিত্র প্রকারভেদ বিস্মৃত হবেন তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে। দুটি মিশ্র অর্থনীতির মধ্যে শুধু যে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আপেক্ষিক পরিমাণে তফাৎ থাকতে পারে তা-ই নয়, উক্ত দুই ব্যবস্থার কোন কোন উপাদান তারা গ্রহণ করেছে সেদিক থেকেও পার্থক্য থাকতে পারে বিস্তর। এসব উপেক্ষা করে নিছক মাথাপিছু আয় আর সরকারি মালিকানার মধ্যে প্রত্যাবৃত্তি স্থাপন (run a regression) করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

৩

ফ্রিডম্যানদের অভিপ্রায় মহৎ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে রকম দুনিয়ার তাঁরা ব্যবস্থা দেন তা যে খুব আকর্ষণীয় তা নয়। আমার মনে গলদ তাঁদের মূল নীতিতেই। সাধারণ স্থিতি (general equilibrium)-বিষয়ক বহু বৎসরব্যাপী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যক্তিসমূহের স্বার্থসন্ধান সামাজিক কাম্যতার উৎস—এই নীতিটাই ভঙ্গুর। এটি যে শুধু অত্যন্ত শর্তসাপেক্ষ তা-ই নয়, এ থেকে পন্থানির্ধারণের লক্ষ প্রদানটি করতেও অনেক কাণ্ডজ্ঞানী লোকরা ইচ্ছুক হন না (ডিসেম্বর ১৯৮১-র 'ইকনমিক জার্নাল'-এ বিনস্টক-এর ফ্র্যাংক হান কৃত সমালোচনা দ্রষ্টব্য)।

অনেক শর্ত প্রয়োজন নীতিটি বলবৎ হওয়ার জন্য (১) পরিভোগকারীদের নিজের পছন্দগুলি একেবারে সঠিকভাবে জানতে হবে, হিসাবপত্র সঠিক করা চাই ব্যবসায়ীদের। শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে বলি, অতি সম্প্রতি ব্রাসেলস-এ এক ইউরোপীয় রেস্তোরাঁওয়ালা সগর্বে আমাকে জানাল, 'আমার খদ্দেরদের ৭০ ভাগ মার্কিনী, ২৫ ভাগ ইউরোপীয়, মাত্র ১০ ভাগ তৃতীয় বিশ্বের।' আমি প্রতিবাদ করতে যেতেই সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল আমি স্পষ্টতই রেস্তোরাঁ-ব্যবস্থার কিছু বুঝি না। (২) আমাদের সিদ্ধান্তগুলিতে কোনো externalities থাকা চলবে না। (৩) উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান পড়তার (increasing returns to scale) নিয়ম থেকে মুক্ত হতে হবে। (৪) সব চুক্তি বলবৎ হওয়া চাই। আরো নানা টেকনিকাল শর্ত রয়েছে।

এটা সত্য-যে এসব শর্তের অনেকগুলিই কিঞ্চিৎ শিথিল করা হলেও মূল তত্ত্বটা নাকচ হয়ে যায় না, তবু ঘটনা হল, বেশ কিছু পরিস্থিতিতে তা খাটে না। ফ্রিডম্যান নিজের অজান্তেই তার কিছু উদাহরণ দিয়েছেন, দেখিয়েছেন কিভাবে অবাঞ্ছনীয় আমলাতান্ত্রিকতা গজিয়ে উঠেছে মানব-হিতৈষণার বদলে লোকের স্বার্থন্বেষণ থেকে (পৃ ১৮৭ 'পাব্লিক স্কুল আন্দোলনের সপক্ষে শিক্ষক ও প্রশাসকদের সমর্থনের উৎস ছিল অনেকাংশেই সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, যদিও যুক্তিগুলো সবই সাজানো হত জনস্বার্থের মোড়কে।') অবাধ স্বার্থান্বেষণ কেমন অবাঞ্ছিত পরিণামের জন্ম দিতে পারে এটা তারই দৃষ্টান্ত।

আরেক দিক থেকেও মূল নীতিটিকে ভ্রান্তভাবে বোঝা ও প্রয়োগ করা হয়েছে। নব্য রক্ষণশীল লেখকরা এটা ব্যবহার করছেন স্বার্থপরতাকে প্রাপ্যের অধিক মূল্য দান করতে তাকে দেখানো হচ্ছে দক্ষতার উৎস রূপে। দরদ, সহমর্মিতা এ সবই অকর্মণ্যতার প্রতীক, ফেবিয়ানবাদের অবশেষে অ্যাডাম স্মিথ আর ঐ মূল নীতির নামে এ বিষ ফেরি করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে।

অথচ নীতিটির বক্তব্য এই মাত্র যে স্বার্থপরতাকে আমরা যতটা খারাপ ভাবি ততটা খারাপ তা নয়; অরাজকতারও জন্ম দেয় না তা। কিন্তু স্বার্থপরতা স্বার্থহীনতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এটা মোটেও নীতির দাবি নয়। খুব সহজ কারণেই অবশ্য সে দাবি নাকচ করা যায়—নিঃস্বার্থ ব্যক্তির পক্ষে স্বার্থপরের মতো আচরণ করার পথ তো খোলাই থাকে। সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাই যদি সবচেয়ে বাঞ্ছিত গুণ হয় তাহলে নিঃস্বার্থ ব্যক্তি তার চরিত্রের দাবিতেই স্বার্থপরের মতো আচরণ করবে এবং তার মানে নিঃস্বার্থ ব্যক্তি সর্বদাই স্বার্থপরের চেয়ে সমাজের বেশি উপকার করতে সক্ষম থাকবে।

এ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা যায় যে একটিমাত্র যুক্তিতে তা হল নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরা জানেই ন যে স্বার্থপরতাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় ব্যক্তিগত গুণ। অথচ মূল নীতিটি আবার দাঁড়িয়ে আছে এই অনুমিতিতে ভর করে যে মানুষ অজ্ঞ নয়। তার মানে ফ্রিডম্যান অজ্ঞতা ও বিজ্ঞতার দুটি যুক্তি ব্যবহার করছেন সুবিধা মতো। ফলে ভাবতেই হয় মিলটন ফ্রিডম্যান নিজে পছন্দের স্বাধীনতার অধিকারী তো?

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮২)

Milton ও Rose Friedman-এর 'Free to Choose' (Penguin, 1980) বইয়ের সমালোচনা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনৈতিক ভাগ্য গণনা

নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে macroeconomic ভবিষ্যৎ গণনা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এরই স্বীকৃতি রয়েছে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাট বৎসর বয়স্ক লরেন্স ক্লাইনকে এ বছরের নোবেল পুরস্কার দানের মধ্যে।

আজ অগ্রসর সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রত্যেক পত্রিকায় 'বিশেষজ্ঞ'দের উদ্ধৃতি থাকে, মূল্য ও উৎপাদনের মতো প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ভেদকের ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্বন্ধে। প্রায়শই এইসব 'বিশেষজ্ঞ' আর কিছুই নয়—প্রকাণ্ড কম্প্যুটারে গাদা গাদা পরিসংখ্যান সহ ভরে দেওয়া বিশাল বিশাল econometric মডেল বা macromodel মাত্র। ইতিমধ্যেই শত শত এ রকম মডেল গজিয়ে উঠেছে, প্রধানত শিল্পোন্নত দেশে, আর বেরিয়ে আসছে নিয়মিত অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ-কথন।

ভাবতে অবাক লাগে, macromodelling-এর শুরু পঞ্চাশ বছরের কম সময় আগে, তিরিশের দশকে Jan Tinbergen ও Ragnar Frisch নামক দুই অর্থনীতিবিদের প্রয়াস থেকে। অবশ্য হাল কেতার মডেলগুলোর শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ক্লাইনের কাজ থেকে। এই জন্যই স্যামুয়েলসন তাঁর ভবিষ্যৎ গণনা সংক্রান্ত এক বক্তৃতায় যুদ্ধোত্তর কালকে ক্লাইনের যুগ আখ্যা দিয়েছিলেন। সবল একটি econometric মডেল দিয়ে ক্লাইন অনুমিতি ও স্বভাবজ জ্ঞানের (intuition) আওতা থেকে অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গণনাকে বের করে আনার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

যুক্তি স্বরূপ বলা হয়েছিল যে, বাস্তব জগৎ এত জটিল যে তার সম্বন্ধে কোনো সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী নিছক সংজ্ঞা আশ্রয় ক'রে করা যায় না। তার জন্য যত অতীত তথ্য এবং যত পরস্পর সম্পৃক্ত প্রবণতা বুঝতে ও ব্যবহার করতে হয় তা মানবমনের আয়ত্তাতীত। তাই এল জটিল গাণিতিক প্রযুক্তি, কম্প্যুটার প্রবর্তনের পর তাদের তুলে দেওয়া হল কম্প্যুটারের মধ্যে।

এই সংক্ষিপ্ত জীবৎকালেও কিন্তু macromodelling নানা মহল থেকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এমনও বলা হয়েছে যে এই মডেলগুলো এতই জটিল যে এদের নির্মাতারাও এদের পুরোপুরি বোঝেন না। অবশ্য আরো অন্তর্ভেদী সমালোচনাও শোনা গোছে—কম্প্যুটার মস্তিষ্কের চেয়ে বেশি তথ্য জমা করতে পারে বটে, কিন্তু তা কেবল এক বিশেষ ধরনের অতি-সুবিন্যস্ত তথ্য। মানুষ কিন্তু অবিন্যস্ত জ্ঞান অনেক বেশি বহন করতে পারে, আর অর্থনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীর পক্ষে তা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আরেকটি মতও আছে—অতীত প্রবণতার সরল অভিক্ষেপ (extrapolation) থেকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব বহুমূল্য econometric দৈত্যেরই সমান সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করা যায়।

এক মার্কিন ও এক ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এই সমালোচনার সত্যতা যাচাই করে দেখেছেন। তাঁরা ব্রিটিশ কোষাগারের অত্যুন্নত macromodelটির ১৯৫১ থেকে কুড়ি বৎসর ব্যাপী ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সংগ্রহ করলেন। তারপর ঐ একই সময়ের জন্য অতীত প্রবণতার সরল অভিক্ষেপ দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী উপপাদন করলেন তাঁরা। পরিষ্কার ফয়সালা হয়ে গেল। Econometric modelগুলো নিখুঁত না হলেও তাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনেক শ্রেষ্ঠতর।

তাঁদের অনুসন্ধান থেকে আরো কিছু প্রণিধানযোগ্য বিষয় ধরা পড়ল। দেখা গেল মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট ব্যয়ের econometric ভবিষ্যদ্বাণী বেশ সঠিক হলেও সরকারি ব্যয় ও মজুত বৃদ্ধির (stockpiling of inventories) বেলায় তা একেবারেই অকেজো। দরের গতিবিধি নিয়ে চিন্তাভাবনা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ব্যাপার, তাই মুদ্রাস্ফীতি বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর সঠিকতার কোনো প্রামাণ্য যাচাই এখনও হয়নি। তবে উপর-উপর দেখে মনে হয় শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মোটামুটি ভালোই খাটছে তা।

Macromodelling-এর পদ্ধতি হল একগুচ্ছ সহসমীকরণ দিয়ে বাস্তবের প্রতিরূপ নির্মাণ। প্রত্যেক অর্থনীতিতেই প্রধান ভেদগুলি নিবিড়ভাবে পরস্পরসম্পর্কিত। যেমন, সুদের হার নির্ভর করে ঋণের লভ্যতা ও মুদ্রাস্ফীতির হারের উপর এবং এ সম্পর্কটি একটি সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটা তো স্পষ্ট যে ক্ষুদ্রতম একটি অর্থনীতি বর্ণনা করতেও একাধিক সমীকরণ লাগবে। উপরন্তু মনে রাখবেন, কিছু কিছু ভেদক কোনো সমীকরণে থাকবে ফলরূপে, কোনো সমীকরণে কারণরূপে। আগের দৃষ্টান্তে সুদের হার হল ফল। কিন্তু অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের মাত্রা নির্ভর করে সুদের হারের উপর, অতএব সঞ্চয়ের সমীকরণে সুদের হার হবে কারণ। কোনো কোনো ভেদক যখন এইভাবে ফল ও কারণ উভয় রূপেই আত্মপ্রকাশ করে (এবং যে কোনো বাস্তবসম্মত macromodel-এ তা হতে বাধ্য) তখন সমীকরণের গুচ্ছটিকে সহসমীকরণের গুচ্ছ বলা হয়।

ভবিষ্যৎ গণনার জন্য তো বটেই, কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যও এইসব econometric পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। যেমন সরকার এ সব সমীকরণে করের নানা মাত্রা বসিয়ে মূল্য উৎপাদন পরিমাণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ভেদকের উপর তার ফলাফল নির্ণয় করতে পারে।

প্রথম macromodelগুলির অন্যতম ছিল চল্লিশের দশকের শেষ দিকে ক্লাইন-উদ্ভাবিত ছয় সমীকরণের একটি গুচ্ছ। আর আজ মার্কিন দেশে হোয়ার্টন স্কুল কিংবা এস. এস. আর. সি-ব্রুকিংস-এর মতো মডেলে থাকে কয়েক হাজার সমীকরণ।

বলতে গেলে ইতিহাসে প্রত্যেক উদ্ভাবনেরই নিন্দুক জুটেছে এবং কেবলমাত্র পশ্চাৎদৃষ্টিতেই বোঝা যায় সেগুলো সঠিক ছিল না ভুল ছিল। যেসব বক্তব্যের জন্য কোপার্নিকাসকে গির্জার নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল সেগুলো শেষ পর্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হল। আবার অন্য দিকে আলকেমির বোলবোলাও চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে।

আধুনিক সমাজে macromodel-এর অপরিহার্যতার স্বীকৃতি ক্রমে ক্রমে পড়লেও এ নিয়ে ধুলো ওড়া এখনও বন্ধ হয়নি। তবে একটা কথা ঠিক—কঁকর্দ বিমান ও ক্যালকুলেটরের মতোই এরাও থেকেই যাবে, এদের মূল্য কেউ বুঝুক বা না বুঝুক।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরার্ড দেব্রু

অর্থনীতিতে এ বৎসরের নোবেল প্রাইজ বিজয়ী Gerard Debreu-র কাজের প্রভাব অর্থনৈতিক পেশার মধ্যে অপরিসীম হলেও বাইরের দুনিয়ার কাছে—এমন কি অর্থনীতি-বিষয়ক সাংবাদিক ও econocrats-দের কাছেও—তার তাৎপর্য প্রায় শূন্য পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পর পত্রপত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে সব লেখা বেরিয়েছে তা থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর কারণ, Debreu তাঁর গবেষণা নিবদ্ধ রেখেছেন অর্থনীতির কয়েকটি বিমূর্ততম ও দুরূহতম শাখায়। তাঁর ফলপ্রসূ পুস্তক 'The Theory of Valuc'-র ('মূল্যতত্ত্ব'-এর) পৃষ্ঠাসংখ্যা বড় জোর একশো, কিন্তু সবচেয়ে দুরধিগম্য একটি রচনা। অথচ তাতে নিগূঢ়তা, অস্পষ্টতা বা বুকনিবাজি বিন্দুমাত্র নেই, তার কাটছাঁট ভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছে বিষয়বস্তুরই—সাধারণ সুস্থিতি তত্ত্বের বিমূর্ত ও কঠোর বিশ্লেষণাত্মক চরিত্র।

সাধারণ সুস্থিতি তত্ত্বে বাজার ও দরগঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের একটি উপায় মেলে—এই বিচারে তত্ত্বটি অষ্টাদশ শতকে অ্যাডাম স্মিথের শুরু করা ও পরে Leon Walras ও Ysidro Edgeworth-এর দ্বারা সমৃদ্ধ গবেষণারই পরিণতি। অ্যাডাম স্মিথের যুক্তি ছিল, অবাধ বাজার ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি নিজ স্বার্থ অনুসরণ করার ফলে অর্থনীতি দক্ষ ও কাম্যভাবে চলতে পারে। কারো কোনো সচেতন প্রয়াস ছাড়াই দর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার 'অদৃশ্য হাত' এই সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করে। যা ছিল অ্যাডাম স্মিথের একটি প্রকল্প, শীঘ্রই তা হয়ে দাঁড়াল এক মতবাদ, পরে একটি প্রশ্নাতীত বিশ্বাস এবং অবশেষে, বর্তমানে একটি সাফাই দরিদ্র মার্কিনী ও বেকার ব্রিটিশরা দেখল, রেগান আর থ্যাচার বেকার ভাতা খারিজ আর ধনীর করহ্রাসের সপক্ষে দোহাই পাড়ছেন এই স্মিথীয় নীতিরই। কর্মপন্থা নির্ধারণের সঙ্গে এই যোগাযোগের কারণেই দর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার কাম্যতা সংক্রান্ত তত্ত্বটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

Debreu-র গবেষণার একটি শাখায় (এর অনেকটাই কেনেথ অ্যারোর সঙ্গে যৌথভাবে করা) ছিল যে-যে শর্তে স্মিথের প্রকল্পটি খাটতে পারে সেগুলো সুসংবদ্ধভাবে নিরূপণের প্রয়াস। এ কাজের তাৎপর্যকে ভুল বোঝা কিন্তু খুবই সহজ। যেমন 'দি ইকনমিস্ট' (২২-২৮ অক্টোবর ১৯৮৩) লিখেছে: 'Debreu-র বড় কীর্তি হল নিখুঁত বাজারের অস্তিত্বের শর্তাবলী নির্ণয়। ফ্যাঁকড়াটা এই যে, বাস্তবে ঐ শর্তগুলি পূরণ করা হয় না। বাস্তবসম্মত অন্য কোনো শর্তাবলী আজও পাওয়া যায়নি।'

কিন্তু 'ফ্যাঁকড়া' কেন ওটা? নব্য ক্লাসিকাল সাধারণ সুস্থিত তত্ত্বের তো বরং ওটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অবাধ বাজার দক্ষতার সঙ্গে চলে যে ধারণাটি চালু তা যে অবাস্তব কিছু অনুমিতির উপর দাঁড়-করানো কি ভঙ্গুর একটি মতবাদ তা এরইই ফলে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

সাধারণ সুস্থিতি তত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়েছে এই যে, সুস্থিতির যে ধারণাটি ইতিপূর্বের গবেষণাদিতে প্রচ্ছন্ন ছিল তা নির্দিষ্ট আকার লাভ করেছে এবং তাতে সুগম হয়েছে সুস্থিতি সম্পর্কিত নবতর ধারণা গঠনের পথ। অস্বচ্ছন্দ (sticky) দরের অর্থনীতি এবং উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি পীড়িত বাজারের বিশ্লেষণে সাম্প্রতিক অগ্রগতিগুলি সম্ভব হয়েছে অ্যারো ও Debreu-রই প্রথম দিকের কাজের ফলে।

Debreu-র তত্ত্বের মতো বিমূর্ত তত্ত্বগুলিই পন্থা নির্ধারণ ও প্রয়োগের ভিত্তি যোগায় (কখনও কখনও হয়তো অনেকটা সময় বাদে)। আবার কর্মপন্থা সংক্রান্ত বিতর্ক ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য থেকেই তাত্ত্বিক পান যাচাই করে দেখার মতো মতামত আর নির্মূল করার মতো নানা ভ্রান্তি। অর্থবিজ্ঞানের কোনো শাখাই অন্যটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—দুইয়েরই প্রয়োজন আছে।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোরিস আলে

ফরাসি অর্থনীতিবিদদের দুই দল, এক দল সমাজবিজ্ঞানের চর্চা করেন, অন্য দল গণিতের—এমন উক্তি সত্যিই কেউ করেছিলেন কিনা জানা না গেলেও এর মধ্যে একটি ফরাসি বৈপরীত্যের প্রতিফলন ঘটেছে ভালো ভাবেই। ঐতিহাসিকভাবে দু জাতের ফরাসিকে অর্থনীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা গেছে—এক জাতে পড়েন কর্মব্রতী ও সমাজ গবেষকরা, অন্যটিতে এঞ্জিনিয়র ও প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা। এ বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী Maurice Allais'র স্থান দ্বিতীয় শিবিরে।

তাঁর জন্ম পারি-তে, ৩১ মে ১৯১১ তারিখে ; ঐ মহানগরীতেই কেটেছে তাঁর বেশির ভাগ শিক্ষাজীবন, যার পরিণতিতে তিনি লাভ করেছিলেন এঞ্জিনিয়ারিং-এ পি.এইচ.ডি। পরবর্তী জীবনে তিনি 'ইকোল নাসিওনাল দে দৎ মিন'-এর অধ্যাপক এবং 'সঁএ নাসিওনাল দ্য ল্য রশের্শ সিয়ঁতিফিক'-এর গবেষণা-পরিচালক হয়েছিলেন।

Allais-এর এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা তাঁকে আরো বেশ কজন খ্যাতনামা ফরাসি অর্থনীতিবিদ-এঞ্জিনিয়রের দলভুক্ত করেছে। তাঁদের মধ্যে আছেন অগুস্ত্যঁ কুর্নো (১৮০১-৭৭)—লিয়োঁতে বলবিদ্যার অধ্যাপক এবং অনেক দিক থেকেই আধুনিক শিল্প সংগঠন তত্ত্বের জন্মদাতা। আর জ্যুল দ্যুপ্যুই (১৮০১-৬৬) সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং করতে করতে তাঁর মনে খেলে গিয়েছিল পরিভোগকারীর উদ্বৃত্তের (consumer's surplus) চিন্তা, যা আধুনিক ব্যয়-উপকার (cost-benefit) তত্ত্বের ভিত্তি।

ফ্রান্সের জন উপযোগগুলি (public utilities) বৃহদায়তন, এঞ্জিনিয়ারদের সেখানে শিল্পের কর্মপন্থা ও দরবিন্যাস নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এরই দরুন তাঁরা বাধ্য হন অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী বিশ্লেষণ করতে। আলের কাজে বিমূর্ত গাণিতিক পদ্ধতি ও ব্যবহারিক কর্মপন্থা বিচারের যে সংযোগ ঘটেছে তাতে রয়েছে এই ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন। প্রবণতাটি অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে আলে-র অবদানে।

অর্থনীতির কয়েকটি বিশিষ্ট শাখায়—যেমন সংস্থান-ব্যবহারের দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধিতে—আলে মৌলিক ধারণা যোগ করেছেন। তবে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ যদিও জানেন যে এসব ক্ষেত্রে আলের অবদান রয়েছে, সে অবদানগুলি যে ঠিক কি তা জানেন খুব অল্প কজনেই। তুলনায় সিদ্ধান্ত তত্ত্বের উপর তাঁর কাজ, বিশেষ করে 'আলে কূটাভাস', অনেক বেশি পরিচিত। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

অর্থনীতিবিদদের পেশার উপর তাঁর প্রভাব পরোক্ষ, কারণ তাঁর অধিকাংশ লেখাই ফরাসিতে। তাঁর প্রথম বই 'আ লা রশের্শ দ্যুন দিসিপ্লিন একোনোমিক' (১৯৪৩) অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ, এক অর্থে তা লোজান ঘরানার ধারণাবলীকে বিংশ শতাব্দীতে নিয়ে এসেছিল, নোবেল বিজয়ী Gerard Debreu তাকে স্বীকার করেছেন তাঁর নিজ গবেষণার প্রেরণাস্থল রূপে। এ-ও লক্ষণীয় যে দেব্রু, মাল্যাঁভো আর বোয়াতো তিনজনই ছিলেন আলে-র ছাত্র।

সিদ্ধান্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে আলে-র কাজের গুরুত্ব এই যে তা আক্রমণ করেছে প্রাধান্যভোগী মার্কিন চিন্তাধারাকে—যে চিন্তাধারার নায়কবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন বহুবিদ্যাবিশারদ জন ফন ন্যোমান। আলে-র সমালোচনা থেকেই গড়ে উঠেছে তথাকথিত 'ফরাসি চিন্তাধারা'। বিকল্প ধারা হিসেবে তাকে প্রথমটির তুল্য বলে আমার মনে হয় না, তবু আলে-র সমালোচনা ছিল নিঃসন্দেহে খুবই জোরালো।

আলে কূটাভাসের প্রেক্ষাপট বুঝতে গেলে আমাদের আড়াই শো বছর পেছিয়ে যেতে হবে। তখনকার এক উল্লেখযোগ্য পরিবার ছিলেন বের্নুলি-রা। জন বের্নুলি শুধু যে একজন অসামান্য গণিতবিদ ছিলেন তা নয়, সন্দেহ করা হয় যে তিনি সন-তারিখ নিয়ে কিছু করেছিলেন নিজের ছেলে দানিয়েল-কে অগ্রবর্তীর সম্মান থেকে বঞ্চিত করার জন্য ('পিতা পুত্রের সম্পর্কের ইতিহাসে সম্ভবত এ এক বিরল ঘটনা'—লিখেছিলেন পল স্যামুয়েলসন)। দানিয়েল ছিলেন পরিবারের সবচেয়ে প্রতিভাশালী সন্তান—গতিবিদ্যা, বায়ুগতিবিদ্যা ও বিমাগণনা-বিজ্ঞানে অবদান রেখেছিলেন এবং ঠিক আড়াই শো বছর আগে সমাধান করেছিলেন বিখ্যাত সেন্ট পিটার্সবুর্গ কূটাভাসের।

তাঁর সমাধান থেকে মনে হল, দুটি অনিশ্চিত বিকল্পের মধ্যে যুক্তিশীল ব্যক্তি বাছেন সেটিই যার প্রত্যাশিত উপযোগ বেশি, গড়ে যা বেশি উপযোগ প্রদান করে। ১৯৪৪ সালে যখন জন ফন ন্যোমান ও অস্কার মর্জেনস্টের্ন দেখালেন যে অনিশ্চিত বিকল্পের সম্মুখীন ব্যক্তি যুক্তিশীলতার কটি স্বতঃসিদ্ধপ্রায় শর্ত মানে বলে যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলেই তার পছন্দকে ব্যাখ্যা করা যায় কোনো-এক উপযোগ অপেক্ষক (utility function) সর্বোচ্চ মানে তোলার প্রয়াস রূপে—তখন বের্নুলির পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত হল বিধিবদ্ধ আকারে। অর্থনীতিতে স্বতঃসিদ্ধনির্ভর পদ্ধতির প্রয়োগের অন্যতম প্রথম দৃষ্টান্ত। এটা—Operations research এবং অনিশ্চয়তার অধীনে project evaluation-এর জন্য তাৎপর্যমণ্ডিত।

বেনুর্লির (আর তাই ন্যোমান-মগেনস্টের্ন-এর) বিচারপ্রণালী নিয়ে আলে-র বরাবরই অস্বস্তি ছিল। ১৯৫২ সালে তাঁর আপত্তিগুলিকে তিনি হাজির করলেন অধুনা-বিখ্যাত এক কূটাভাসে। নিজেও পরখ করে দেখতে পারেন এটা—এই বিকল্পগুলির কোনটা আপনি বাছবেন ? 'ক' বাছলে নিশ্চিত পাবেন ১০ কোটি টাকা, আর 'খ' বাছলে ৫০ কোটি টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ১০, ১০ কোটি পাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৮৯, আর কিছুই না পাওয়ার সম্ভাবনা ১।

এবার 'গ' ও 'ঘ' বিকল্পদুটি বিচার করুন। 'গ'-তে ১০ কোটির সম্ভাবনা শতকরা ১১, কিছুই না পাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৮৯ 'ঘ'-তে ৫০ কোটির সম্ভাবনা শতকরা ১০, কিছুই না পাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৯০। কোনটি বাছবেন ?

অধিকাংশ মানুষ 'খ'-এর বদলে 'ক' এবং 'গ'-এর বদলে 'ঘ' বাছেন, প্রথম যখন সমস্যাটা দেখি তখন আমি-ও তাই করেছিলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, কোনো উপযোগী অপেক্ষককেই সর্বোচ্চ মান দানের প্রয়াস রূপে এই বাছাই ব্যাখ্যা করা যায় না। 'ক'-এর প্রয়াস প্রত্যাশিত উপযোগ যদি 'খ'-এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে স্পষ্টতই 'গ'-এর প্রত্যাশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপযোগও 'ঘ'-এর চেয়ে বেশি হবে।

পরিসংখ্যানবিদ লিওনার্ড স্যাভেজ-কে যখন আলে-র সমস্যাটা দেওয়া হয় তিনিও অধিকাংশ মানুষের অনুরূপ বাছাই করেছিলেন। যখন বলা হল, তাঁর বাছাই তাঁর নিজেরই স্বতঃসিদ্ধগুলির বিরোধী, তিনি বললেন, উক্ত স্বতঃসিদ্ধে তাঁর বিশ্বাস এতই প্রবল যে তাঁর বাছাইয়ে শুধু প্রমাণিত হয় তিনি তার আগে ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করেননি।

আমার মত ফরাসি ধারার অনুসারীরা সঠিকভাবেই একটা বিষয় ধরেছেন। আলে-র কূটাভাসে প্রমাণিত হয়েছে, লোকের কাছে উপযোগের বিতরণের গুরুত্ব প্রত্যাশার গুরুত্বের সমান (অবশ্য Bruno de Finetti এ যুক্তি খণ্ডন করেছেন তাঁর চাঁছাছোলা শিরোনামযুক্ত নিবন্ধ 'A Short Confirmation of my Standpoint'-এ)। তবু একটি ইতিবাচক চিন্তাধারা হিসবে ন্যোমান-মর্গেনস্টের্ন-এর বিচার-প্রণালীর বিকল্প পাওয়া আজও কঠিন।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেইন্‌সের নানারূপ

John Maynard Keynes ছিলেন একজন অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, সাংবাদিক। নানা দ্বন্দ্বে দীর্ণ একটি মানুষ সমকামী হয়েও বিয়ে করেছিলেন বিখ্যাত ব্যালেরিনা লিডিয়া লোপোকোভা-কে, একাধারে বোহেমিয়ান ব্লুমসবেরি গোষ্ঠীর সদস্য, কূটনীতিবিদ এবং অতি সফল লগ্নিকারী। এরকম ক্ষেত্রে যা অবশ্যম্ভাবী তাই হয়েছে—নানা পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা পেয়েছে তাঁর জীবন। রক্ষণশীল জীবনীকারেরা তাঁর জীবনের কিছু কিছু দিক নিয়ে অপ্রস্তুত বোধ করেছেন এবং সেগুলি প্রায়ই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রয় হ্যারডের বই সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে খাটে। স্কিডেলস্কির সাম্প্রতিকতম জীবনীর লক্ষ্য জন মেনার্ডের জীবন সম্পর্কে যা-কিছু জানা যায় তুলে ধরা ; এ দিক থেকে জীবনীটি বিশিষ্ট।

Keynes অবশ্যই প্রথমত এবং প্রধানত একজন অর্থনীতিবিদ। এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম অর্থনীতিবিদ তিনি ছিলেন কিনা তা নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে কিন্তু সবচেয়ে প্রভাবশালী যে ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, আজ সব শিল্পোন্নত দেশের রাষ্ট্রনায়করাই নিজেদের কেইন্‌সপন্থী বা কেইন্‌সবিরোধী রূপে চিহ্নিত করে থাকেন—কথা দুটির অর্থ সম্বন্ধে তিলমাত্র ধারণা না থাকলেও। মহা মন্দার (Great Depression) পর থেকে পাশ্চাত্য সরকারগুলি কেইন্‌সীয় অর্থনৈতিক কর্মপন্থাই সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন। আর অন্য অনেক অর্থনীতিবিদের থেকে কেইন্‌সের তফাৎ হল, ১৯৪৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর মর্যাদা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে।

স্কিডেলস্কি তাঁর বই শুরু করেছেন ১৯৫১-তে প্রকাশিত রয় হ্যারডের জীবনীর সমালোচনা দিয়ে। তিনি অভিযোগ করেছেন Keynes-কে বাস্তবের চেয়ে বেশি রক্ষণশীল করে দেখিয়েছেন হ্যারড, কেইন্‌স যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরোধী ছিলেন এ কথা লুকোনোর চেষ্টা করেছেন। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কেইন্‌সের সম্পর্ক ছিল রীতিমতো দ্ব্যর্থক। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি থেকে তিনি ছিলেন কোষাগার বিভাগের (Treasury) আমলা, ১৯১৯-এর জুনে ইস্তফা দেওয়া অবধি। অথচ তিনি দেখতে পারতেন না প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ ও তাঁর সরকারকে। ডানকান গ্রান্টকে তিনি লিখেছিলেন 'আমার কর্ম আর অনুভব পরস্পরবিরোধী' এবং 'আমি এমন সরকারের কাজ করি যাকে দেখতে পারি না, এমন লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য যা আমার মতে গর্হিত।'

শেষ কথাটি ইতিমধ্যেই আপ্তবাক্যে উন্নীত হয়েছে। যে চিরাচরিত আমলাসুলভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উভয়সংকটে কেইন্‌সের প্রথম দিকের কর্মজীবন পীড়িত হয়েছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে এতে—যে সরকারকে সমর্থন করি না তার সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করব, নাকি তারই মধ্যে থেকে কর্মপন্থাকে সামান্য মাত্রায় সামান্য মাত্রায় হলেও সঠিক দিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করব। কেইন্‌স দ্বিতীয় পথ বেছে নিয়েছিলেন (যদিও তিনি ক্ষমতা-প্রতিপত্তিও ভালোবাসতেন বলে আমার মনে হয়)। এর ফলে লিটন স্ট্র্যাচি ও বার্ট্রান্ড রাসেল সহ ব্লুমসবেরি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে শীতলতা নেমে আসে।

স্ট্র্যাচি ও রাসেল দুজনেই কেইন্‌সকে ভণ্ডামি ও অসততার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। রাসেল কেইন্‌সের বর্ণনা দিয়েছিলেন 'কঠিন, বুদ্ধিসর্বস্ব, আন্তরিকতাহীন, বুদ্ধি দিয়ে আত্মার যন্ত্রণা গোপনে লিপ্ত' বলে। কেইন্‌স হিসেবমতো অমায়িক হতে পারতেন। মনে হয় 'চল্লিশ বছরের লোকদের মুগ্ধ করার মতো আলাপচারী'তে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। তাঁর মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণের পক্ষে অতি উপকারী গুণ, সন্দেহ নেই।

তবু ব্যক্তিগত জীবনে Keynes ছিলেন একেবারে নিশ্ছিদ্র সৎ, প্রায় আধ্যাত্মিক, কেমব্রিজ শিক্ষক মুর-এর মতো। তাই বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে তাঁর চিঠি ছিল সর্বদাই অকপট ও ভানমুক্ত। তথ্যের এই উৎসটি স্কিডেলস্কি অকৃপণভাবে ব্যবহার করেছেন। লিটন স্ট্র্যাচি ও ডানকান গ্রান্টের কাছে তাঁর চিঠিপত্রে কেইন্‌স অসংকোচে তাঁর সমকামিতা ও প্রেম বিষয়ে লিখেছেন (ডানকান নিজেই ছিলেন তাঁর 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেমিক)। যেমন সেই ভারতীয় ছাত্রের কথা, যার প্রতি দারুণ আকৃষ্ট হয়েও এগোনোর সাহস পাননি কারণ (ডানকানকে লিখছেন) 'ওর বেয়াড়া ভারতীয় মুণ্ডুর মধ্যে কি ভাব যে চলছে' তা বুঝে উঠতে পারেননি তিনি।

তথ্যের আরেকটি বড় উৎস তাঁর বাবা নেভিল কেইন্‌সের পুঙ্খানুপুঙ্খ ডায়েরি। স্কিডেলস্কির বিবরণ অনুযায়ী নেভিল কেইন্‌স ছিলেন বিবর্ণগোছের ভালোমানুষ, নিবেদিতপ্রাণ পিতা—ছেলেকে ক্লান্তিকর চিঠি লিখতেন, ডায়েরিতে তার চেয়েও ক্লান্তিকর বিবরণ লিখে রাখতেন ছেলের উন্নতির বিষয়ে। এসবের অনেকটা উদ্ধৃত করে স্কিডেলস্কি পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়েছেন।

অবশ্য এই রকম নির্বিচার উদ্ধৃতির একটা সুবিধা হল, পাঠক নিজের রুচিমাফিক যেগুলো খুশি পড়ে নিতে পারেন। যেমন জানা যায়, Keynes লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ভারতের প্রতি কোনো বিশেষ অনুরাগবশত নয় (যদিও অনেক ভারতীয়েরই তাই ধারণা), কাজটা সম্মানজনক বেশি ছিল বলে। আসলে ভারতের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল ব্রিটেনে প্রচলিত ধারণারই অনুসারী। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ শাসন ভারতের পক্ষে উপকারী, কারণ তা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯০৭ সালে মা-কে ইন্ডিয়া অফিস থেকে লিখেছিলেন 'দিনে গড়ে এক ঘন্টার কাজও করিনি আমি'—বহু ভারতীয় আমলা ও বিদ্যাজীবী নিশ্চয় এতে যারপরনাই আশ্বস্ত হবেন।

তাঁর চিঠিপত্র থেকে আরও জানা যায়, কিংস কলেজের ফেলোশিপ না পেয়ে নৈরাশ্যের চেয়ে তাঁর ক্রোধ হয়েছিল বেশি, হোয়াইটহেডকে অযোগ্য পরীক্ষক বলে গালাগাল দিয়েছিলেন। কখন কখন ক্ষুদ্রমনাও হতে দেখা যেত তাঁকে। ক্লাইভ বেল-এর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হয়েছিল তাঁর, কে তাঁদের ৪৬ নং গর্ডন স্কোয়ারের ফ্ল্যাটের ভালো বিছানাটা দখল করবেন তা-ই নিয়ে। লিডিয়া লোপোকোভাকে যে একদিন বিয়ে করবেন তা না জেনে অসংকোচে লিখেছেন ডানকান গ্রান্টকে: 'বাজে নাচিয়ে—কোমর দুলতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।' পরন্তু 'তারপর গেলাম লুপোকোভার (বানানটা তাঁরই) ওখানে। মহিলা যথারীতি অমায়িক—নিজের সহ্যশক্তি প্রমাণ করতে আমাদের দিয়ে তাঁর ঠ্যাঙে চিমটি কাটালেন, আমরাও লাজুক-লাজুকভাবে চিমটি কাটলাম ; ক্লাইভ সঙ্গে থাকলে ভালো হত।' আমরা আরও জানতে পাই, নিজের চেহারা নিয়ে জীবনভোর হীনমন্যতায় ভুগেছেন তিনি।

কেইনসের চরিত্রহীনতা নিয়ে, ব্লুমসবেরি গোষ্ঠীর বাউণ্ডুলে জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে রয় হ্যারডের অস্বস্তি ছিল চিরকাল। তাঁর জীবনীতে কেইনসের জীবনের এই দিকটা তিনি কমিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। স্কিডেলস্কি এ দিকটা উন্মোচিত করেছেন পাণ্ডিত্য সহকারে—যার দরুণ অবশ্য তাঁর বইটা জায়গায় জায়গায় বড় গুরুভার হয়ে উঠেছে। কেইনসের যৌনজীবন আর তাঁর চিঠিপত্র (অধিকাংশই কালানুক্রমে উদ্ধৃত) হাঁপিয়ে তোলে পাঠককে। তার চেয়ে বরং কেইনসের কর্মজীবনের বৃত্তান্ত অনেক বেশি মনোগ্রাহী।

এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পিতার বিপরীত। যোগ্যতায় কুলোবে না, এই ভয়ে নেভিল 'ইকনমিক জার্নাল' সম্পাদনার কাজের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ত্রিশ বছর বয়সে ঐ একই প্রস্তাব গ্রহণে মেনার্ডের কোনো দ্বিধা হয়নি। বই লেখা ছিল নেভিলের কাছে কষ্টকর, প্রকাশের পূর্বেকার মন্তব্যাদিতে মুষড়ে যেতেন তিনি মেনার্ড ছিলেন এ ক্ষেত্রেও অকুণ্ঠ ও অসংকোচ।

তাঁর 'The Economic Consequences of Peace' গ্রন্থে তিনি তাঁর সমসাময়িক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সম্পর্কেও বেপরোয়া মন্তব্য করতে পিছপা হননি। বইটা এতই বিস্ফোরক ধরনের ছিল যে কেইনস নিজেও তাঁর অংশবিশেষ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যেন লয়েড জর্জকে তিনি 'নব্যপ্রস্তর যুগের প্রতিভূ' আখ্যা না দেন এবং প্রেসিডেন্টকে 'মোহমুদ্গর' দান সংক্রান্ত অংশটা বাদ দেন। অধিকাংশ লেখক কোনো না-কোনো সময় যা করেছেন তিনিও তা-ই করলেন—একবার কথাগুলি কেটে দিয়ে জুড়ে দিলেন ফের।

তাঁর 'The Economic Consequences of Peace'-এ কেইনস তাঁর বহু বৎসরের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা ও অপরাধবোধের অর্গল মুক্ত করে দিয়েছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের খামখেয়াল আর ভণ্ডামির মুখোশ ছেঁড়ার মধ্য দিয়ে কেইনস ব্লুমসবেরি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বকে আবার বাঁচিয়ে তুললেন, যুদ্ধের সময় যে তাঁদের পরিত্যাগ করে সরকারের সেবা করেছিলেন তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন। এই বইটিই তাঁকে যশের চূড়ায় তুলে দিল, স্কিডেলস্কির কাহিনীও এখানেই ইতি।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪)

Robert Skidelsky-র 'John Maynard Keynes: Hopes Betrayed, 1883-1920' (ম্যাকমিলান, ১৯৮৩) বইয়ের সমালোচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্য-অসাম্য

অসাম্য নিয়ে চর্চা আজ একটা বিশারদের বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। অর্থনীতিবিদ অসাম্যের পরিমাপে পারদর্শী হয়েও জাতপাত আর অসাম্যের সম্পর্ক বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হতে পারেন। সমাজবিজ্ঞানীর বেলায় হয়তো বিপরীতটা সত্য। অথচ এমন কিন্তু চিরকাল ছিল না। Andre Beteille তাঁর ভূমিকায় বলেছেন এ বিষয়ের প্রথম চর্চাকারীরা জ্ঞানের নানা শাখায় বিচরণ করতেন স্বচ্ছন্দে 'ম্যাক্স ওয়েবারের ব্যুৎপত্তি ছিল অর্থনীতি, আইন ও সমাজবিজ্ঞানে পারেতো অর্থনৈতিক অসাম্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য বিশ্লেষণেরও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন।' আজকের দিনে এমন বহুমুখী সমাজবিজ্ঞানী মেলে না, তাই তা নিয়ে বৃথা বিলাপের বদলে বেতেই নির্ভর করেছেন অনেকের মিলিত অবদানের উপর। প্রত্যেক লেখক তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রের উপরেই লিখবেন, তবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রের দিকেও নজর রেখে, এবং এইভাবে সবগুলি প্রবন্ধ মিলে তৈরি হবে অসাম্যের এক সামগ্রিক, বহুমুখী বিশ্লেষণ।

বইটির প্রথমে রয়েছে সম্পাদকের ভূমিকা, তারপর পাঁচটি প্রবন্ধ, সেগুলোর লেখক যথাক্রমে বি শিবরামাইয়া, সুরেশ তেন্ডুলকর, আনন্দ চক্রবর্তী, মালবিকা কার্লেকর ও মনোরঞ্জন মহান্তি। প্রবন্ধগুলি আলাদা আলাদাভাবে পড়তে ভালো, মিলিতভাবে প্রমাণ করে যে interdisciplinary গবেষণা সত্যিই বড় কঠিন কর্ম!

অসাম্য প্রসঙ্গে ভারতীয় আইনের বিশ্লেষণ দিয়ে বইটির শুরু। তাঁর প্রতিপাদ্য হল, ভারতীয় সংবিধানে তিনটি সাম্যনীতির সমাবেশ ঘটেছে—সংখ্যাগত, উৎকর্ষগত (meritarian) এবং আনুপাতিক। এই পদগুলির যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়া নেই, ফলে যে প্রচুর আগ্রহজনক খবরাখবর দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে একটা সাধারণ তাত্ত্বিক কাঠামোয় আঁটানো কষ্টকর হয়ে পড়ে।

পরবর্তী প্রবন্ধ তেন্ডুলকরের, অর্থনৈতিক অসাম্যের পরিমাপ ও ভারতীয় অভিজ্ঞতা বিষয়ক। 'লম্বা-চওড়া সমাজতান্ত্রিক বুকনি সত্ত্বেও' দারিদ্র্য নিবারণে আমাদের সাফল্য যে কত সামান্য তা-ই তিনি তুলে ধরেছেন এতে। ভারতবর্ষে দারিদ্র্য ও অসাম্য সংক্রান্ত বিতর্কে তাঁর নিজের অবদান গুরুত্বপূর্ণ, তাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি বক্তব্য প্রতিপন্ন করতে পেরেছেন। তবে একটা ত্রুটির উদ্ভব ঘটেছে পারেতো অপটিম্যালিটির (Optimality) এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 'মর্মভাগ'কে গুলিয়ে ফেলার ফলে। পারেতো অপটিম্যালিটির তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন কোনো স্থিতাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আর এরই দরুণ তিনি অভিযোগ করেছেন যে, নব্য Welfare অর্থনীতি পরিবর্তনবিমুখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা করা উচিত অথচ এতারৎ উপেক্ষিত, তা-ই হল চক্রবর্তীর গ্রামীণ অসাম্য বিষয়ক নিবন্ধ ও কার্লেকরের শিক্ষাক্ষেত্রে অসাম্য বিষয়ক নিবন্ধের উপজীব্য। চক্রবর্তীর মতে গ্রামের পদদলিত মানুষের অবস্থা-উন্নয়নের প্রয়াস 'অত্যাচারীর সশস্ত্র শক্তির দ্বারা, এমন কি স্বয়ং রাষ্ট্রের দ্বারা' পরাস্ত হয়, তাই নিপীড়িত জনতার মুক্তির একমাত্র উপায় দেশব্যাপী সংগঠিত হওয়া। কিন্তু এ জাতীয় পরামর্শের মুশকিল হল এই যে এতে আরেকটি সমান বড় প্রশ্নের জবাব বাকি থেকে যায় নিপীড়িত জনতাকে দেশব্যাপী সংগঠিত হতে কিভাবে প্রবৃত্ত করা যাবে ? অনুরূপভাবে কার্লেকর যখন বলেন যে সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করার জন্য প্রয়োজন 'সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন' তখনও সমান (বা অধিকতর) কঠিন প্রশ্ন থেকে যায় সে পরিবর্তন আনা যাবে কি উপায়ে ?

শেষ নিবন্ধ মনোরঞ্জন মহান্তির, বৃহৎ পরিসরের কারণে মনোগ্রাহী। Aristotle থেকে Rawls পর্যন্ত তাঁর বিবরণ ক্ষেত্র, তাতে অন্তর্ভুক্ত Rousseau, Locke এবং Marx।

দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও বেশ কটি মূল ধারণা অপরিষ্কার থেকে যায়। 'সুযোগের সমতা' ধারণাটাই ধরুন। কয়েকজন এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন, ভূমিকায় বেতেই-ও। কিন্তু সুযোগের সমতার বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ কঠিন কারণ তার অনেক রকম অর্থ হতে পারে। দশ জন লোকের প্রত্যেককে দুশো টাকা দিয়ে যদি বলা হয় যার যেমন খুশি খরচা করতে, কেউ হয়তো তা দিয়ে কাপড় কিনবে, কেউ খাবার, কেউ হয়তো ব্যবসা শুরু করবে ; কিন্তু সবাই একই সুযোগের অধিকারী হবে। তার বদলে মোট টাকাটা (দু হাজার টাকা) একটা ব্যাগে ভরে যদি একশো মিটার দূরে রাখা হয় এবং ঐ দশজনকে বলা হয় তার জন্য রেস দৌড়োতে, তা হলেও সবার সুযোগ সমানই থাকছে। অথবা নৈতিকভাবে একটি ব্যবস্থা আমার কাছে বেশি গ্রহণীয় হতে পারে অন্যটির বদলে। ফলে আর কোনো কথা না বলে যদি শুধু 'সুযোগের সমতা'র গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাকে জিগ্যেস করা হয় আমার কোনো মতামত না-ও থাকতে পারে।

ছটা নিবন্ধের প্রত্যেকটাই আকর্ষণীয় কিন্তু মিলিতভাবে একটি বহুবিদ্যক ধারণা প্রদানে ব্যর্থ। সব লেখকই 'অসাম্য' সম্বন্ধে লিখেছেন, অথচ বিভিন্ন বিদ্যায় কথাটার অর্থ বিভিন্ন। এ থেকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তাতে 'ইয়ে জো হ্যায় জিন্দেগি' নামক টিভি সিরিয়ালটি মনে পড়ে যায়—একদল লোক 'বোম্বাই থেকে গোয়া' নামক ছবি পরিকল্পনা করার পর তাদের কেউ কেউ গিয়ে হাজির হয়েছিল রেল স্টেশনে—মালপত্রসহ !

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬)

আঁদ্রে বেতেই সম্পাদিত 'Equality and Inequality (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩) বইয়ের সমালোচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

স্বদেশ-চিন্তা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাম্পিং

'ডাম্পিং' যে আসলে কি সে সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশেরই ধারণা নেহাৎই আবছা, তবে ব্যাপারটা যে অতীব গর্হিত একটা-কিছু তা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। আর তাই বিদেশি প্রতিযোগিতার চাপে পড়ে ঠিক এই সেন্টিমেন্টই আজ চাগিয়ে তুলতে চাইছেন কিছু কিছু দেশোয়ালি উৎপাদক।

বছর তিনেক আগে, বিদেশি মুদ্রায় আমরা তখন বেশ সচ্ছল, সরকার ঠিক করলেন বাণিজ্যনীতি আরো উদার করা হবে এবং আমদানির ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হবে। এর ফলাফল প্রত্যাশিতই ছিল (১) আমদানি বাড়ল সোডা, পলিয়েস্টার-তন্তু ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর, এবং এমন কিছু কিছু দ্রব্যের যেগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমি এতাবৎ অজ্ঞ ছিলাম ; (২) এ সব জিনিসের দেশীয় দর পড়ে গেল নাটকীয়ভাবে ; (৩) বেরিয়ে পড়ল যে আমাদের তথাকথিত বিপ্লবীরাই শুধু উদার বাণিজ্যের বিরোধী নন, তাঁদের পেছনে দৃঢ়ভাবে (কথাটা বেশ লাগসই এ প্রসঙ্গে) আছেন আমাদের ব্যবসায়ীরাও।

সোডার দৃষ্টান্তটাই ধরা যাক। বছরের পর বছর দেশের মানুষ এই বস্তুটি অসম্ভব চড়া দামে কিনে এসেছেন। আজ বিধিনিষেধ কমানোর পর দেশি সোডা পাওয়া যাচ্ছে টন প্রতি ২৫০০ টাকায় আর বুলগেরীয় সোডা ১৭০০ টাকায়। স্বভাবতই স্বদেশি উৎপাদকদের মজুত স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে, প্রবল চাপ আসছে তাঁদের উপর দর নামানোর জন্য। এরই জবাবে তাঁরা বিভিন্ন আলোচনা মঞ্চে যুক্তি তুলেছেন কঠোরতর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে, আর অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন আমাদের জাতীয় bete noire ('জুজু')—তা হল ওই 'ডাম্পিং'। রাতারাতি এই অভিযোগ উঁচিয়ে উঠেছে সোডা, বিভিন্ন প্রকার তন্তু ও অন্যান্য আমদানির বিরুদ্ধে। আমাদের প্রতিক্রিয়াও একেবারে এক ছাঁচে ঢালা। ডাম্পিং চলবে না, চলবে না। তাই যেসব সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ উদারনীতির সুফলগুলি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তাঁরাও প্রাণপণে দেখাতে ব্যস্ত যে ডাম্পিং হচ্ছে না। সরকার এমন কি একটা কমিটিও নিয়োগ করেছেন ডাম্পিং-এর অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার জন্য। যে কথা কেউ বলছে না, অথচ যা হতে পারত সবচেয়ে মোক্ষম প্রত্যুত্তর, তা হল ডাম্পিং হলেই বা কি ?

ডাম্পিং-এর আদি অর্থ হল উৎপাদন-ব্যয় বা দেশীয় দরের চেয়ে কম দামে পণ্য রপ্তানি করা, তবে শব্দটির অপব্যবহার ব্যাপক। —মার্কিনিরা যখন অভিযোগ করে যে জাপানিরা তাদের বাজারে টেলিভিশন সেট ডাম্প করছে তখন আসলে তারা বলতে চায় জাপানিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের টিভি বিক্রি করছে আমেরিকান উৎপাদকদের চেয়ে কম দামে। আমার বিশ্বাস এ আমদানির বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদের কারণ হল, এর সুফল বর্তায় সারা দেশের ক্রেতাসাধারণের আর ক্ষতিটা সীমাবদ্ধ থাকে উৎপাদকদের মধ্যে ; অথচ কোনো প্রচার অভিযান চালানোর জন্য জোট বাধা সাধারণ দেশবাসীর চেয়ে বেশি সহজ একটা ছোট সুনির্দিষ্ট জোটের পক্ষে। এমন আমদানি অবশ্যই আছে যা ক্ষতিকর এবং বিধিনিষেধ আরোপ করার যোগ্য ; কিন্তু বাণিজ্যিক বিধিনিষেধের যুক্তিগুলিকে হতে হবে সচরাচরের চেয়ে অনেক বেশি পরিশীলিত।

কোনো বিশেষ আমদানি-দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমাদের ঠিক করতে হবে ন্যায্যতা (equity)। অনাভ্যন্তরিকতা (externalities) ইত্যাদির বিচারে বিধিনিষেধ আরোপের কোনো যথার্থ কারণ আছে কিনা এবং তার নিয়মিত যোগানের নিশ্চয়তা কতখানি। বিক্রয়কারী দেশটি তার আভ্যন্তরীণ দরের চেয়ে কম দামে দ্রব্যটি বিক্রি করছে কিনা, অর্থাৎ ডাম্পিং চালাচ্ছে কিনা, তাতে আমাদের কাছে উক্ত আমদানির আকর্ষণীয়তার কোনো হেরফের হয় না, আর তাই আমাদের সিদ্ধান্ত তাতে প্রভাবিত হওয়াও উচিত নয়।

'ডাম্পিং' শব্দের ব্যঞ্জনাকে সম্পূর্ণ আবেগমুক্ত করা উচিত। বুলগেরীয়রা তাদের সোডা এ্যাস (ash) উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে কম দামে বিক্রি করছে এ অভিযোগ যদি সত্য হয়েই থাকে সরকারকে আমি অত্যন্ত সহজ একটি পমামর্শ দেব—ধন্যবাদ দিন ওদের।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮২)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পয়সা সংকট

আমাদের বাড়িতে যে বাক্সটায় খুচরো পয়সা রাখা হত তা এখন হরেক রকমের লজেন্সে ভরে উঠেছে। এই সেদিন বোম্বাই বিমানবন্দরে টেলিফোন করার জন্য যখন টাকা ভাঙাতে গেলাম, স্ন্যাক বারের মালিক একটি আধুলির সঙ্গে ফেরৎ দিল অতিক্ষুদ্র একটা সিঙাড়া (পরে অবশ্য মনে হয়েছিল ভাগ্যিস সিঙাড়াটা ছোট ছিল)। দিল্লির সরকারিবাসের কন্ডাকটরদের মুখে এখন যেমন পরিতৃপ্তির ভাব তা এর আগে কদাচিৎ চোখে পড়েছে।

এ সবই আমাদের অব্যাহত পয়সা সংকটের প্রকাশ। অধিকাংশ ব্যক্তি মানুষের পক্ষে এটা নিছক একটা বিরক্তিকর ঝামেলা হলেও সামগ্রিক বিচারে তা যথেষ্ট হয়রানির কারণ হতে পারে, বিশেষত খুচরোর নিয়মিত লোকসান গরিবদের পক্ষে মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার নয়। দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা এর ফলে খুচরো ফেরৎ না দেওয়ার সহজ অজুহাত পেয়ে যায়। তবে মানবিক আচরণ ও অর্থের রহস্য যেটুকু এতে উদ্‌ঘাটিত হয় তাই হল এ সংকটের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল। তখন পয়সার বর্তমান অনটনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল যে কারণটা প্রভূত পরিমাণে অনির্দেশ্য। কয়েকটা বিষয় অবশ্য পরিষ্কার। সরকার বাজার থেকে জীর্ণ এক টাকার নোট যে হারে তুলে নিয়েছে তার বদলে নতুন নোট সেই হারে ছাড়তে পারেনি। ফলে পয়সায় পড়েছে বর্ধিত চাহিদার টান। দ্বিতীয়ত, নানা কারণে কয়েকটি টাঁকশাল পূর্ণ ক্ষমতানুযায়ী উৎপাদন না করায় আরো বেড়ে গিয়েছে চাহিদা-যোগানের ফারাক। ধাতুর লোভে পয়সা গালানো হচ্ছে, এটা বহুলাংশে গালগল্প বলেই মনে হয়।

উপরন্তু এটা মানাও কঠিন যে কিছু লোক বেশি দামে পয়সা বিক্রির উদ্দেশ্যে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করছে। একটা কার্যকর অভাব তৈরি করতে যে পরিমাণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রয়োজন তা কোনো বেসরকারি সংগঠনের আয়ত্তাধীন নয়।

যা আরো অনির্দেশ্য, অথচ অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল মনুষ্য-মনস্তত্ত্বের ভূমিকা। এক টাকার নোট ও পয়সার যোগানে একটা সামান্য প্রকৃত ঘাটতি আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে, যার ফলে প্রত্যেকেই পয়সা হাতছাড়া করতে দ্বিধা করতে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা একটা সামান্য ব্যাপার হলেও এর একটা বিশাল দ্রুতপুঞ্জিত ফল দেখা দেয়—আরো ঘাটতি ও খুচরো ছাড়তে আরো অনীহা পরস্পরকে তাড়া করতে থাকে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমবিস্তৃত ঘূর্ণিচক্রে।

সমস্যার কিছুটা লাঘব ঘটায় পয়সার নানা বদলি জিনিস—লজেন্স, ডাকটিকিট, সিঙাড়া, কিংবা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কফি হাউসের ছোট ছোট বাকি-পয়সার স্বীকৃতিপত্র। আরো সংগঠিত বদলি-ব্যবস্থাও আছে। বোম্বাইয়ে বাস কন্ডাকটররা খুচরো না থাকলে ছোট ছোট ছাপানো কুপন দেয়, ওগুলো দিয়ে বাসের টিকিট কেনা যায় এবং উদ্দেশ্য বহির্ভূত হলেও অনেক সময় দোকানে বা চা-স্টলেও ব্যবহার করা যায়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যা কিছু অন্যে গ্রহণ করবে করবে বলে লোকে বিশ্বাস করে তাই তো টাকা।

টাকার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বিচিত্র সব জিনিস বিনিময়ের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭শ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকার নানা অংশে তামাক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল টাকা হিসাবে, এমন কি কিছু কালের জন্য স্থানীয় সরকার ওটাকে বিহিত মুদ্রাও বানিয়েছিল। তার দরুন অবশ্য দেখা দিয়েছিল তামাকের অতি-উৎপাদনের সমস্যা, এবং তা এত প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে ভার্জিনিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ ১৯৬৬-তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এক বছরের জন্য তামাক ফলানো বন্ধ রাখার।

সাদামাটা অর্থবাদী (monetarist) তত্ত্ব টাকার যোগান দিয়েই মুদ্রাস্ফীতি ব্যাখ্যা করতে চায়, কিন্তু তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয় জাগিয়ে তোলে ভারতের বর্তমান পয়সা সংকটের মতো অভিজ্ঞতাগুলি। টাকার নানা বদলির উদ্ভব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে টাকা ও তার বদলির যোগানই বরং গভীরতর অর্থনৈতিক শক্তির ফলশ্রুতি। বিভিন্ন সরকার ঘন ঘন যত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বড়াই করুক না কেন, আজও বহুলাংশে একটা প্রহেলিকা।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটরগাড়ি শিল্পের সংরক্ষণ চাই ?

সব সূচকের বিচারেই—হয়তো কেবল দুর্ঘটনায় মৃত পথচারীর সংখ্যা ছাড়া, বার্ষিক যা ৩০ হাজারের মতো—ভারতের মোটরগাড়ি শিল্প ক্ষুদ্রায়তনই বটে। কয়েক বছর আগে তা ছিল সবচেয়ে সেকেলে শিল্পের একটি।

এ অবস্থা দ্রুত বদলাচ্ছে মনে হয় এবং তার প্রধান কৃতিত্ব স্পষ্টতই মারুতি উদ্যোগের। সম্প্রতি জানা গেল ভারত নাকি হাঙ্গেরিতে মারুতি গাড়ি রপ্তানি করবে—আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, দেখাই যাচ্ছে। ভারতের পুরোনো উৎপাদকরা মডেল উন্নত করছেন, অনেকে রয়েছেন এ শিল্পে প্রবেশের অপেক্ষায়। যেমন এসকর্টস চাইছে Citroen 2CV বানাতে।

গুরুতর একটা প্রশ্ন জাগে এ সময় এ শিল্পের আধুনিকীকরণে মারুতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার খাতিরে তাকে সংরক্ষিত করা উচিত ? সরকারি মহলে এমন মনোভাব একটা আছে। তারই প্রকাশ দেখা যায় মারুতি গাড়ির জন্য সুবিধাজনক অন্তঃশুল্ক ও বহিঃশুল্কে, অন্য সম্ভাব্য উৎপাদকদের অনুমতি দিতে টালবাহানায়।

সংরক্ষণের সবচেয়ে মেঠো যুক্তিটা এই। এ কথা সুবিদিত যে গাড়ি উৎপাদককে উৎপাদন-দক্ষতা (অর্থাৎ স্বল্প উৎপাদন-ব্যয়) সম্ভব করতে গেলে অনেক গাড়ি উৎপাদন করতে হয়। এ-ও জানা কথা যে ভারতে গাড়ির চাহিদা আপেক্ষিক বিচারে কম—উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৪-৮৫ তে মাত্র লাখখানেক গাড়ি ও জিপ বিক্রি হয়েছিল। এত ছোট বাজারে যদি খুব বেশি উৎপাদক ভিড় করে তাহলে তাদের প্রত্যেকে যথোচিত সংখ্যার চেয়ে কম (sub-optimal) গাড়ি তৈরি করবে। এখান থেকে আর ছোট্ট একটি ধাপ এগোলেই যুক্তি দেওয়া যায় যে অল্পসংখ্যক উৎপাদককেই গাড়ি বানাতে দেওয়া উচিত।

কিন্তু গোলমাল ঐ শেষ ধাপটাতেই। গাড়ি-শিল্পে বৃহৎ উৎপাদনের সুবিধার দরুন বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানটি তো এমনিতেই তার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় সুবিধা ভোগ করছে—কাজেই সংরক্ষণ ছাড়া নিজের শক্তিতেই তো তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারা তার উচিত।

এটা হয়তো সত্য যে আমাদের চাহিদার স্বল্পতার জন্য মাত্র একটা বা দুটো প্রধান উৎপাদক থাকবে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে প্রতিযোগিতা থাকবে না। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ঠিক হওয়া উচিত কারা হবেন সেই প্রধান উৎপাদক।

মোটরগাড়ি শিল্পের উৎপাদক ও ভোক্তার চরিত্রের কারণেই সমতার (equity-র) প্রশ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে বিরাট বড় হয়ে দেখা দেয় না। আমাদের মতো গরিব দেশে 'জনসাধারণের মোটরগাড়ি' কথাটাই তো স্ববিরোধী।

তা যদি হয়ে থাকে তাহলে উৎপাদন-দক্ষতাই প্রধান বিচার্য, আর তার জন্য প্রতিযোগিতার গুরুত্ব নির্ধারক। মারুতিকে প্রথম এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা দিয়ে ভালোই হয়েছে, কেননা তার মুনাফাটা আসে রাষ্ট্রের তহবিলে। কিন্তু এবার তাকে আত্মনির্ভর হতে দেওয়া উচিত—বিশেষত নতুন উৎপাদকের উৎপাদন করার অধিকার ঠেকিয়ে একে সংরক্ষণ করার নীতি বন্ধ হওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দুনিয়ার মোটরগাড়ি শিল্পে নিত্য নূতন উদ্ভাবন ঘটছে। আজ যা উন্নত দেখাচ্ছে, প্রকৌশলে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হলে কাল আর তা তেমন দেখাবে না। আর শিল্পটাকে মহা উৎসাহে সংরক্ষিত করে রাখলে সে ব্যর্থতা তো প্রায় অবশ্যম্ভাবী। ভারতের অ্যামবাসাডর গাড়ি নিয়ে যে ঠাট্টাটা চালু—'হর্ন ছোড়কর সব বাজতা'—তাতে রসিকতার ভাগ কম থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিযোগিতা বিলোপের নীতির বিরুদ্ধে এর ধিক্কারটা কম তীক্ষ্ণ নয়।

সংরক্ষণপন্থী চিন্তাকে সবাধিক সুবিধা দেওয়ার জন্যই এ পর্যন্ত আমি ধরে নিয়েছি ভারতীয় উৎপাদকরা কেবল ভারতীয় বাজারের জন্যই উৎপাদন করবেন। অথচ আসলে তা হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রকৌশলে যদি আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারি তাহলে আমাদের সস্তা শ্রমের দৌলতে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারেও ঢুকতে পারব। বস্তুত (গত সপ্তাহেই খবর বেরিয়েছে) মার্কিন আমদানিকারীরা ভারতকে খুদে-গাড়ির সম্ভাব্য রপ্তানিকারী হিসেবেই গণ্য করছে। একবার সেটা ঘটনা হয়ে উঠলে, একের বেশি ভারতীয় মোটরগাড়ি উৎপাদকের পক্ষে পড়তা পুষিয়ে উৎপাদন চালানো সম্ভব নয়—এ যুক্তির ভিত্তিটাই ধ্বসে পড়বে।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেধা ক্ষরণের ক্ষতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'মেধা ক্ষরণ' (Brain drain) বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, উপনিবেশের বিলোপ ও তৃতীয় বিশ্বের সচেতনতার উত্থানের সঙ্গে উন্নত দেশগুলি বেশি বেশি করে বর্ণ-নিরপেক্ষ দেশান্তরণ-নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে তৃতীয় বিশ্ব থেকে শুরু হয়েছে, মার্কিন সরকারি পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'পেশাজীবী, টেকনিকাল ও অনুরূপ কর্মী', তাদের বহির্মুখী প্রবাহ। ভারতের মতো যেসব দেশে একটা উৎকৃষ্ট উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা, সেসব দেশ প্রভূত পরিমাণে পুষ্ট করেছে এই দেশত্যাগের স্রোতকে।

এর ফলে অবশ্য যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছে এসব দেশের জনমত। পত্রপত্রিকায় প্রায়ই চোখে পড়ে দেশান্তরগামী পেশাজীবীদের সোচ্চার সমালোচনা। কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য হল, চলতি বাদবিতণ্ডায় এই মেধা ক্ষরণ যতটা দুশ্চিন্তাজনক বলে প্রতিভাত হয় আসলে তা ততটা নয়।

একটা দেশের জাতীয় আয় আমরা হিসেব করি সে দেশে বসবাসকারীদের আয় যোগ করে। অতএব কোনো এঞ্জিনিয়র যখন ভারত ছেড়ে চ'লে যান তখন নতুন দেশে তাঁর আয় ভারতের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাঁর দেশত্যাগের অনেক রকম ফলাফল দেখা দেয় এদেশে। তাঁর খদ্দেরদের অসুবিধা হয়। সুবিধা হয় অন্য এঞ্জিনিয়রদের, কোনো বাড়িওয়ালার ঘরে হয়তো আনন্দের ভোজ বসে যায়, ইত্যাদি।

এঁর দেশত্যাগের আগে ও পরে ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করলে তাতে এইসব ফলাফলের ছাপ থাকবে, কিন্তু এঞ্জিনিয়রটির নিজ আয়ের পরিবর্তনের কোনো প্রভাব পড়বে না। আর সাধারণত লোকে যেহেতু বেশি আয়ের টানেই দেশত্যাগ করে, তাই এঞ্জিনিয়রটির কুশলতা পরিবর্তন গণনার মধ্যে ধরলে দেখা যাবে যে, তার দেশত্যাগে জাতির কুশল আমরা সচরাচর যা হিসাব করে থাকি তার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জাতীয় আয়টা টেকনিকাল বিষয় হলেও জনমতের আওতায় এসে পড়েছে। এঞ্জিনিয়ররা চলে গেলে আমরা দেশের প্রকৌশল নিয়ে বিলাপ করি, ডাক্তাররা দেশত্যাগ করলে চিন্তিত হই দেশের লোকের স্বাস্থ্য নিয়ে। হিসাব থেকে বাদ দিই ঐ এঞ্জিনিয়র-ডাক্তারদের কুশলতাবৃদ্ধি। এটা ভুল। স্পষ্টতই ভারতের কুশল হল তার জনসংখ্যার কুশল, ভৌগোলিক পরিসরের নয়।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক নাগাদ উত্তর রাজস্থান থেকে দেশত্যাগের একটা ক্ষীণ ধারা শুরু হয়েছিল। কালক্রমে সে স্রোত প্রসারিত হল এবং তাঁরা যেখানে সুযোগ পেলেন সেখানেই ছোট ছোট ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। শেখাওয়াতি মারোয়াড়িদের বিরাট সাফল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সুবিদিত ঘটনা। মারোয়াড় নামক ভৌগোলিক সত্তাটির পক্ষে হিতকর হবে না—এই যুক্তিতে যদি তাঁদের বহির্গমন ঠেকিয়ে রাখা হত তাতে হয়তো মারোয়াড়ের সত্যিই লাভ হত, কিন্তু মারোয়াড়িদের নয়।

তর্ক উঠতে পারে কিন্তু ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা যে বিপুল ভর্তুকিপুষ্ট ? ডাক্তারের পক্ষে তাঁর অর্জিত বিদ্যা অন্যত্র ব্যবহার করা কি অন্যায় নয় ? হয়তো অন্যায়, কিন্তু তা কি সে বিদ্যা ভারতেই সর্বোচ্চ দামে বিক্রয়ের চেয়ে বেশি ? তাছাড়া এ যুক্তি বিজ্ঞানীদের বেলায় খাটবে না, আমাদের সমাজে তো তাঁদের ক্রমাগত অবান্তর করে দেওয়া হয়েছে। সমাজ নাকি তাঁদের কাজকে খুব দাম দেয়, যদিও তার প্রমাণ বড় দুর্নিরীক্ষ্য।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলাস-সামগ্রী নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে

গরিব দেশে বিলাসদ্রব্যের আমদানি ও পরিভোগ খর্ব করা উচিত, এ কথাটি ব্যাপকভাবে স্বতঃ প্রমাণিতের মতো মেনে নেওয়া হয়। ভারতবর্ষে এ মতের অনুমোদন মিলবে পার্টির ঘোষণাপত্রে, রাজনৈতিক বক্তৃতায় এবং, তার চেয়েও যা তাৎপর্যপূর্ণ, আমাদের পঞ্চবার্ষিক যোজনাগুলিতে। অথচ এ লক্ষ্যটার জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এক ধরনের সহজবোধ, কঠোর বিশ্লেষণ নয়। আমরা সবাই একমত—এবং খুব সঠিকভাবেই—যে, কোনো দরিদ্র পরিবার যদি শিক্ষা ও পুষ্টিকর খাদ্যের বদলে স্কচ হুইস্কি বা রেশমি রুমালের মতো বিলাসদ্রব্য কিনতে টাকা উড়িয়ে দেয় তাহলে সে নিজেই নিজের ক্ষতি করে। এ থেকেই অতি সঙ্গত মনে হয় এই যুক্তি যে, অনুরূপভাবে কোনো দরিদ্র জাতিরও বিলাসদ্রব্য ভোগ করা উচিত নয়। কিন্তু পরিবার থেকে জাতি পর্যন্ত এই যুক্তি টানাটা শুধু অসিদ্ধ নয়, এর প্রয়োগ হতে পারে রীতিমতো ক্ষতিকর।

এ নীতির আরেকটু পরিশীলিত প্রবক্তারা, যেমন যোজনা কমিশন, আরো সতর্ক যুক্তির শরণ নেবেন, সংস্থান বন্টনের (resource allocation) ভিত্তিতে পরিহারযোগ্য দ্রব্যের পরিভোগ নিষিদ্ধ করা হলে এগুলো উৎপাদনের সংস্থান চালিত হবে আবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদনে এবং তাতে উপকৃত হবে সমাজের দরিদ্র অংশ। এ যুক্তি অসম্পূর্ণ কারণ এতে চাহিদার দিকটি উপেক্ষিত। এদিক থেকে দেখলে বিলাস দ্রব্য নিষিদ্ধ করণের অর্থ, সম্পন্ন লোকদের হাতে তাদের ইচ্ছাতিরিক্ত নগদ টাকা থেকে যাওয়া। তা দিয়ে তারা দুটো কাজ করতে পারে। প্রথমত, তারা তা সঞ্চয় করতে পারে, কিন্তু তার মানে আগামী বছরগুলিতে তাদের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি জাতীয় সম্পদে তাদের বখরার বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, তারা তা দিয়ে আবশ্যক পণ্য কিনতে পারে—যার ফলে এগুলোর দাম বাড়বে আর যারা ইতিমধ্যেই গরিব তারা আরো গরিব হবে।

অবশ্য স্কচ হুইস্কি নিষিদ্ধ হলে তার দরুন যে সরাসরি গমের চাহিদা ও দাম বেড়ে যাবে তা নয়, তবে উপর্যুপরি দর-বাড়ার ঢেউ ছাড়িয়ে পড়বেই অত্যন্ত ধনীরা তাদের প্রিয় স্কচ না পেয়ে দেশি হুইস্কি চাইবে ও তার দাম বাড়িয়ে দেবে ; তাদের ঠিক তলার লোকরা এতদিন হয়তো কেবল দেশি হুইস্কিই কুলোতে পারছিল, এবার তারা মুখ ফেরাবে রাম্ ও রেশমি শার্টের দিকে তাদের তলার শ্রেণীটি আরো বুনিয়াদি দ্রব্যের দিকে ফিরবে—এইভাবে দর-বাড়ার ঢেউ সম্ভবত শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকবে অত্যাবশ্যক পণ্যে। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণত বিক্ষিপ্ত চরিত্রের। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াটি তাই চাক্ষুষ না হতে পারে, কিন্তু বিলাসদ্রব্য পরিভোগের সংকোচন অত্যাবশ্যক পণ্য উৎপাদনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্থানের স্থানান্তর ঘটাবে—এ যুক্তির চেয়ে তা কম যুক্তিগ্রাহ্য নয় অন্তত।

এটুকু পরিষ্কার যে চাহিদার শক্তিগুলি কাজ করে যোগানের শক্তিগুলির বিপরীত মুখে, ফলে এটা আগাম ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে বিলাসদ্রব্যের সংকোচনে গরিবরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। বস্তুত শ্রমনিবিড় বিলাস পণ্য (যেমন হাতে-ছাপা শাড়ি, মধুবনী চিত্র কিংবা গাত্রসংবাহন) ধনীরা বেশি বেশি ভোগ করলে তাতে গরিবদের সুবিধা সরাসরি।

আমাদের মতো গরিব দেশে যে লোকদেখানো পরিভোগ চলে তা রীতিমতো ইতরতা, এবং বিন্দুমাত্র সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন কোনো মানুষই তাতে খুশি হতে পারেন না। কিন্তু আমাদের ভোলা উচিত নয় যে এটা একটি গভীরতর অসুখের—আয়ের মর্মন্তুদ অসমবন্টনের—লক্ষণ মাত্র। বিলাসদ্রব্য নিষিদ্ধ করে তা সারানোর চেষ্টা যেন ছোট জামা পরিয়ে মোটা লোককে রোগা করতে চাওয়া।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮২)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্নীতির আভিজাত্য

গুনার মিরদাল তাঁর 'এশিয়ান ড্রামা'য় দুঃখ করে বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ বিজ্ঞানীরা দুর্নীতি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেন না। সত্যিই, এ বিষয়ে ভারতীয় রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, এমন কি খোদ সমাজবিজ্ঞানীদেরও কেউ কেউ যে হারে তথ্যের সম্ভার বাড়িয়েছেন গবেষণার কাজে ঐ তথ্যের তেমন সদ্ব্যবহার অবশ্য হয়নি। এ হেন অবহেলার মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে দুর্নীতি যখন চতুর্দিকে এতই প্রকট তখন তা নিয়ে লেখালেখির আর বিশেষ মানে হয় না। এটা কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, কারণ দুর্নীতিবিদ্যা বেশ জটিল হতে পারে, সমাজবিজ্ঞানীদের পক্ষে আগ্রহজনকও—আর দুর্যোগে পড়লে তা যে কাজে লেগে যেতে পারে তা তো বলাই বাহুল্য।

কোনো অপকর্মের প্রত্যক্ষ অবাঞ্ছনীয়তার দিকটা খুবই স্পষ্ট। আগ্রহজনক হল তার পরোক্ষ সামাজিক ফলাফল। দুর্নীতি একটা দেশকে যখন ছেয়ে ফেলে, তার প্রথম অশান্তিকর ফল দাঁড়ায় এই যে অনিচ্ছুক লোকও তখন দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে 'কাজের বদলে খাদ্য' কার্যক্রমের তহবিল তছরুপ এত বেশি হচ্ছিল যে তছরুপের যে কোনো অভিযোগ তৎক্ষণাৎ লোকে বিশ্বাস করতে ফলে, ১৯৭৯ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেল, সবচেয়ে সৎ কর্মচারীরাও দায়ে পড়ে অন্তত এক ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নিতেন—প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধাদের ঘুষ দিতেন যাতে তারা দুর্নীতির অভিযোগ না তুলে বসে

একের বিবেকহীনতা আরো একভাবে অন্যকে বিবেক বিসর্জনে বাধ্য করতে পারে দিল্লিতে টেলিফোন পাওয়ার কথাই ধরুন—বছর পাঁচেক লেগে যেতে পারে অনায়াসে আবার হাজার হাজার লোক যে লাইন ডিঙিয়ে যথাসময়ের আগে টেলিফোন পায়, এ-ও জানা কথা। কিন্তু এর ফলে অন্য সবারই আরও দেরি হয়। কেউ লাইন না ডিঙোলে সবাইকে অপেক্ষা করতে হত আরো কম—বছর তিনেক ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ লাইন যারা ডিঙোচ্ছে তারা যে শুধু যথাসময়ের আগে টেলিফোন পাচ্ছে তা-ই নয়, উপরন্তু আইন-মানা লোকদের প্রতীক্ষাকাল তারা বাড়িয়ে দিচ্ছে দু-বছর। ওটা আইন মানার খেসারৎ। এই যখন বিচার তখন ডাক-তার বিভাগের ওপরতলায় মামা খোঁজা তাগিদ তো বাড়বেই। আরো লোকে লাইন ডিঙোবে, বাড়তে থাকবে সততার দণ্ড—এ-ই হল ক্রমবর্ধিত দুর্নীতির প্রবণতা।

তবে এহ বাহ্য। অধুনা ভারতে যা ঘটছে তা আরো মর্মান্তিক—দুর্নীতির কৌলীন্যলাভ। লোকে আজ দুর্নীতি অবলম্বন করে শুধু লাভের আশায় নয়, জাতে ওঠার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যও।

ভারতে উচ্চতর শ্রেণীগুলি বড় দরের দুর্নীতির কারবারি হওয়ায় দুর্নীতি ক্রমেই আভিজাত্যের ভূষণ হয়ে উঠছে। কালো টাকায় আর দোষ নেই, তা কেউকেটার লক্ষণ। যথাসময় অপেক্ষা করার পর গ্যাস পেলে তা তো রীতিমতো লজ্জার বিষয়---কেষ্টবিষ্টুরা কেউ অতদিন অপেক্ষা করতেন না, এদেশের অধিকাংশ হেজিপেজির মতো আপনারও মামা নেই আসলে।

সম্প্রতি এই কৌলীন্যলাভের ব্যাপারটারই চমৎকার নিদর্শন দেখলাম এক বন্ধুর আচরণে। সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় একটা দারুণ জাঁকালো কাজ বাগিয়েও সে চারিদিকে ছড়িয়েছে যে ওটা সে পেয়েছে মামার জোরে। ওতে নাকি ইজ্জত বাড়ে সহকর্মীদের কাছে, বিশেষত অধস্তনদের কাছে।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথোচিত মাত্রার দুর্নীতি

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুন তৈরি করার সময় আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত দুর্নীতিকে একটা যথোচিত মাত্রায় (optimal level) ধরে রাখা—এটাই আমার মূল প্রতিপাদ্য। পুরো মূলোচ্ছেদের চেষ্টা সম্ভবত বিচক্ষণ রণনীতি নয়।

কথাটা প্রথমে উদ্ভট শোনালেও আমি দেখাতে চাই যে তা অর্থবিদ্যকের নিতান্ত মামুলি কটি নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কর্মকাণ্ড (project) মূল্যায়নে, পরিবেশ সংরক্ষণে, দূষণ নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের সঙ্গে নীতিগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং আমি দেখাব যে ওগুলো প্রয়োগ না করার ফলেই উদ্ভব ঘটেছে আমাদের বহু দুর্দশার, ভারতীয় অর্থনীতির শোচনীয় দুরবস্থার।

উপমা দিয়ে বিষয়টা সবচেয়ে সহজে বোঝানো যেতে পারে। অর্থনীতিবিদেরা প্রথম যখন যথোচিত মাত্রার দূষণের কথা বলতে শুরু করেছিলেন তা-ও উদ্ভট শুনিয়েছিল। অথচ আজ সব যুক্তিশীল মানুষই মেনে নিয়েছেন যে দূষণ ব্যাপারটা অবিমিশ্র হলেও ঘর থেকে শেষ ধূলিকণা বা শহর থেকে শিল্পধূমের শেষ লেশটি তাড়ানোর চেষ্টা অযৌক্তিক তো বটেই, অসম্ভবও।

অর্থাৎ দূষণ নিয়ন্ত্রণ যেহেতু ব্যয়সাপেক্ষ, তাই সম্পূর্ণরূপে দূষণ মোচনের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত না-ও হতে পারে। যথোচিত মাত্রাটা কি তা নিয়ে অর্থনীতিবিদ, পরিবেশ-বিশারদ ও সরকারি অমাত্যদের মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু নীতিটা খারিজ হয়ে যায় না তাতে।

দুর্নীতির ব্যাপারটাও একই রকম। কিন্তু তা সহজে চোখ এড়িয়ে যায় কারণ দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের খরচাটা স্বতন্ত্র জাতের ও বিক্ষিপ্ত। প্রায়শই আমরা দুর্নীতি রোধের চেষ্টা করি উপযুক্ত নিয়মনকানুন তৈরি করে, কিন্তু দুর্নীতি দমনের প্রতিটি কানুনে নানা বৈধ কর্মও দমিত হয়। আর তাই কানুন দিয়ে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের প্রধান খরচ হল সেই কানুনে বন্ধ হওয়া উৎপাদন-কর্মসমূহ।

উৎপাদনের এইসব লোকসানের হদিশ পাওয়া সত্যিই কঠিন হতে পারে, কিন্তু তাই বলে এগুলো অগ্রাহ্য করার কোনো যুক্তি নেই। উপরন্তু আছে দুর্নীতি সন্ধান ও দমনের জন্য আমলাতন্ত্র পোষার প্রত্যক্ষ ব্যয়। তবে আমার বিশ্বাস, ব্যাহত অর্থনৈতিক কর্মের প্রত্যক্ষ ও অদৃশ্য খরচের তুলনায় এই প্রত্যক্ষ খরচাটা সামান্যই।

এতক্ষণে এটুকু বোধহয় পরিষ্কার হয়েছে যে দুর্নীতি দমনের আইন প্রণয়ন করতে করতে যেই দেখা যাবে পরবর্তী আইনটির খরচা তার উপযোগিতাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে অমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেইখানেই আমাদের থেমে যাওয়া উচিত। এ আমাদের সেই বহু পরিচিত প্রান্তিক নীতি। ভারতের অর্থনীতিতে এ নীতির ক্রিয়ার নিদর্শন পেশ করার আগে আমি শুধু একটি বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই—আমার যুক্তির মূলে কিন্তু এমন কোনো বিশ্বাস নেই যে দুর্নীতি বাঞ্ছনীয়।

কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করেন, কোনো কোনো ধরনের দুর্নীতি অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিকতার প্রতিষেধক এবং উৎকোচ নাকি অর্থনীতিকে সচল রাখতে সাহায্য করে। আমার এতে সায় নেই। আমার বিশ্বাস অর্থনৈতিক ফলাফল বাদ দিলেও মানুষের নীতিবোধের (morale) উপর প্রভাবের বিচারেই দুর্নীতি একটি সর্বাত্মক অমঙ্গল বিশেষ।

প্রান্তিক নীতিতে অস্পষ্টতা নেই, এমন নয়। খরচার মোট পরিমাণ বের করা বেশ কঠিন কাজ, উপযোগিতার হিসাবও মূল্যবোধের উপর চরমভাবে নির্ভরশীল। তবু নীতিটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক আমলাকেই তা শেখানো উচিত, যাতে নিজের বুদ্ধি, বিচার ও পরিমাপ-প্রমাদের সীমার মধ্যে তিনি তা ব্যবহার করতে পারেন।

ভারতের বর্তমান সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে এ নীতির প্রয়োগ বিরল আর তার প্রতিফল সর্বত্রই প্রকট। বিদ্যায়তন ও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি।

গবেষণা চালানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাজীবীদের প্রায়ই অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন ঘটে। কম্প্যুটার ভাড়া করতে হয়, গবেষণার সহকারী নিয়োগ করতে হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের বেলায় কিনতে হয় উন্নত যন্ত্রপাতি। আজকের গবেষণামত্ত সময়ে গবেষণার অর্থ পাওয়া অবশ্য কঠিন নয়, কিন্তু অধিকাংশ ব্যয়বাহী সংগঠনই কোনো অধ্যাপকের গবেষণার জন্য উদ্দিষ্ট টাকাটা দেয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং বিশ্ববিদ্যালয় তারপর তা প্রয়োজন মতো ছাড়ে।

অন্য অর্থের মতোই গবেষণার অর্থও নিশ্চয় তছরুপ করা সম্ভব। এ-ও সন্দেহাতীত যে কোনো কোনো উদ্যমশীল বিদ্যাজীবী তা করেও থাকেন। হয়তো সহকারীদের আসল মাইনে যা দেওয়া হয় দেখানো হল তার চেয়ে বেশি বা কেনা হল ভুয়ো সব গবেষণার উপকরণ।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাই চিরাচরিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই রকম দুর্নীতি নিরোধের জন্য নানা নিয়মকানুন প্রণয়ন করেছে। বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বা আপনার ব্যয়বাহী সংগঠন যা-ই ভাবুন, টাইপিস্টের কিছুতেই সেই মহা মন্দার (Great Depression) যুগের চেয়ে বেশি মাইনে দেওয়া যাবে না, গবেষণার সহকারীদের মাইনে থাকবে কড়াকড়িভাবে দারিদ্র্যসীমার তলায়, পেন্সিল-রাবার সবকিছুর জন্যই বিল দাখিল করতে হবে, যেখানেই সম্ভব প্রত্যায়ন সহ।

খুবই কার্যকর হয়েছে নিয়মগুলো—সাহায্যপ্রাপ্ত গবেষণার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। একাগ্রচিত্ত নিয়ম প্রণেতারা ভুলেই গিয়েছিলেন যে দুর্নীতি দমনের প্রতিটি নিয়ম অন্তরায় স্থাপন করে সৎ গবেষকের পথেও। অন্তরায়গুলি স্তূপীকৃত হতে হতে আজ যে অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছে তাও তাঁদের খেয়াল নেই।

এবার ডক্টরেট উপাধির কথায় আসা যাক। নিরপেক্ষ ও যথাযথ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বিশ্ববিদ্যালয় বড়ই যত্নশীল। একটি পি.এইচ.ডি থিসিস তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তার সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে বেরিয়ে এসে গৎবাঁধা প্রশাসনিক খাতে নানা যাচাই ও পরখের মধ্য দিয়ে শম্বুকগতিতে চলে উপনীত হয় বাইরের পরীক্ষকদের কাছে। পরীক্ষা যখন নেওয়া হয় ততদিনে বছর খানেক সময় কেটে গেছে, যদিও অধিকাংশ পাশ্চাত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়েই এই পুরো প্রক্রিয়াটায় কয়েক সপ্তাহের বেশি সময় লাগে না। শেষ পর্যন্ত শুধু ছাত্রের গবেষণাই পরীক্ষিত হয় না, যাচাই হয় তার স্মৃতিশক্তিরও।

হাজার হাজার ছাত্রের এই বিলম্বের খরচা যদি আমরা বাস্তববুদ্ধি নিয়ে হিসাব করি, আর তদুপরি যোগ করি এর ফলে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অসংখ্য ছাত্র হাতছাড়া হওয়ার অদৃশ্য কিন্তু পর্বতপ্রমাণ লোকসান, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা ঝুঁকব আরো বিকেন্দ্রীকৃত পরীক্ষাব্যবস্থার দিকে—তাতে যদি দুর্নীতির সামান্য বৃদ্ধি ঘটে তবুও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পা বাড়ানো যাক। আমরা সবাই মানব যে আদালতের উচিত প্রত্যেকটি মামলা তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে বিচার করা। কিন্তু এখানেও জীবনের একটি কঠিন সত্যের হাত এড়ানো যায় না—খরচার কথা মনে রাখতে হয়। এটা হয়তো সত্য যে যত বেশি তথ্য সংগৃহীত হবে এবং তদন্ত যত দীর্ঘ হবে, ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা ততই বাড়বে। কিন্তু এর দরুন যদি আদালতগুলি বকেয়া মামলার ভারে অচল হয়ে পড়ে, মোকদ্দমার খরচ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, আর ভূপালের হতভাগ্য মানুষদের ক্ষতিপূরণের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয় অনন্তকাল, তাহলে আইনের কার্যকারিতা আর থাকে কি?

এহেন ব্যবস্থা নিরপেক্ষও হতে পারে না, তা ধনীর পক্ষে সুবিধাজনক হবেই—বিচার পক্ষপাতদুষ্ট বলে নয়, শুধু ধনীরা সেই বিচারের শরণ নিতে পারে বলে। তার চেয়ে বরং কিছু অবিচারের ঝুঁকি নিয়েও বিচার প্রণালী সংক্ষিপ্ত করা ভালো।

এ সবেরই সঙ্গে একটা সমতার প্রশ্নও জড়িত, সেটার উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রামীণ ঋণের ক্ষেত্র থেকে একটা দৃষ্টান্ত নিচ্ছি। ভারতের গ্রামাঞ্চলে সমবায় ঋণ দেওয়া হয় খাতকের পরিচয়, পরিশোধক্ষমতা ও বিত্তের পরিমাণ অতি সতর্কভাবে যাচাই করে, কিন্তু এই যাচাইয়ের ব্যাপারটি থেকেই নানা দুর্নীতির উদ্ভব ঘটেছে ব্যাংকের সাহেবদের উৎকোচ ও অন্য নানা পাল্টা সুবিধাদানের আকারে।

উপরন্তু বড় চাষীরা যেহেতু পাল্টা সুবিধা বেশি দিতে পারে তাই নিয়মকানুনগুলোর ব্যাখ্যাও হয় তাদেরই অনুকূলে। এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং উড়িষ্যার কয়েকটি গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে রীতিমতো মর্মস্পর্শী কিছু পরিসংখ্যান।

খাতকের বিত্ত যত বেশি লালফিতের দৈর্ঘ্য তত কম। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে সমবায় ও ব্যাংক ঋণের বিপুল বৃদ্ধি সত্ত্বেও দরিদ্রতম মানুষ যে আজও স্থানীয় মহাজনদের উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকবেন এতে আশ্চর্যের কি আছে। আর সরকারি ঋণ যেহেতু ভর্তুকিপুষ্ট তাই সরকারি ঋণদাননীতির সর্বমোট ফল দাঁড়িয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির অসাম্যকেই গভীরতর করা।

ভারতবর্ষ দুর্নীতির পঙ্কে ডুবেছে দ্রুত গতিতে। যেমন ধরুন, স্বাধীনতার সময় কালো টাকার পরিমাণ ছিল নগণ্য। হয়তো তা ছিল আমাদের কর-আইনেরই ফল, তবে ব্যক্তিগত সততার গান্ধিবাদী আদর্শের একটা ভূমিকাও সম্ভবত ছিল। কোনো কোনো হিসাব অনুযায়ী কালো আয় তো আজ ঘোষিত জাতীয় আয়ের আধাআধি।

আমাদের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের পুরো ব্যবস্থাটার পুনর্বিচার দরকার। তা যে যান্ত্রিকভাবে করা সম্ভব নয় এবং একটা কার্যকর ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে গেলে যে ধরনের নীতি অনুসরণ করা দরকার এসব সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়াই ছিল বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। ব্যাপারটা জরুরি। নচেৎ গান্ধিবাদী সততার যৎকিঞ্চিৎ অবশেষগুলিও মুছে যাবে, থাকবে শুধু গান্ধি টুপি।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলকাঠামোর প্রতিবন্ধ

একটি অনুন্নত অর্থনীতির 'টেক অফ' বা স্বতশ্চল প্রবৃদ্ধির সূচনার জন্য দুটি শর্ত প্রয়োজন উচ্চ সঞ্চয়-হার (ধরুন, শতকরা পনেরোর বেশি) এবং বিদেশি মুদ্রার পর্যাপ্ত যোগান। উচ্চ সঞ্চয়-হারের ফলে অধিকতর পুঁজি সঞ্চয় সম্ভব হয় এবং পর্যাপ্ত বিদেশি মুদ্রার দ্বারা প্রয়োজন হলে উন্নত উৎপাদনসামগ্রী (Capital goods) আমদানি করা যায়।

সত্তরের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত, অর্থাৎ স্বাধীনতার সিকি শতাব্দী পরেও, প্রবৃদ্ধির এই দুটি শর্ত পূরণের ধারেকাছে ভারত যেতে পারেনি। তার পরেই সহসা অবস্থা বদলাতে লাগল। ১৯৭৪-এ ভারতের বিদেশি মুদ্রার মজুত ছিল ৬১০ কোটি টাকা। এক বছরে তা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গেল। ১৯৭৬-এর মধ্যে তা ফের দ্বিগুণ হল এবং সবাই আশ্বস্ত হলেন যে ব্যাপারটা নেহাৎ ক্ষণস্থায়ী নয়। পরের বছর তা আবার প্রায় দ্বিগুণ বাড়ল এবং ১৯৭৮-এর মধ্যে আমরা ৫২২০ কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রার অধিকারী হলাম। সঞ্চয়-হারেও ঘটল সমান নাটকীয় পরিবর্তন। ষাটের দশক জুড়ে এবং সত্তরের প্রথম দিক পর্যন্ত শতকরা দশের আশেপাশে ঘোরাফেরা করার পর তা আচমকা রহস্যজনকভাবে চড়তে শুরু করল এবং ১৯৭৩-এর মধ্যে গিয়ে ঠেকল চমক লাগানো বিশে।

ফলত সত্তরের দশকের শেষ দিকে—দেশ থেকে কোকা কোলা বিতাড়িত করার সময়—মনে হল যেন ভারতবর্ষ এক অভূতপূর্ব আর্থিক বৃদ্ধি জন্য তৈরি।

কিন্তু সে বৃদ্ধি ঘটল না। ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সর্বদা উজ্জ্বল—কথাটা আগে ছিল নিছক ঠাট্টা, এবার নিষ্ঠুর সত্যের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হল। সত্তরের দশকের শেষ দিককার এই অসঙ্গতি বেশ পুনর্ভাবনার উদ্রেক করেছে এবং তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক কিছুকেই কারণরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ হল তৎকালীন মৌল কাঠামোর (infrastructural) বিভিন্ন প্রতিবন্ধ (bottlenecks)। দেশ জোড়া লোড শেডিং। পরিবহনক্ষমতা, বিশেষত ভারতীয় রেলওয়ের মাল বহন ক্ষমতা, হঠাৎ নেমে গেল ১৯৭৮-এ। দেখা দিল কয়লা, ইস্পাত আর সিমেন্টের বিপুল ঘাটতি। ১৯৮০-র মধ্যেই ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সংযোজিত হল একটি নতুন বিভাগ—'মৌলকাঠামোর সমস্যাবলী'!

উৎপাদন-প্রবাহের প্রতিবন্ধগুলি সামাল দেওয়া সহজ কাজ নয়—ইদানীং ইয়ানোস কোরনাইয়ের মতো হাঙ্গেরীয় অর্থনীতিবিদেরা বিষয়টির উপর যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। সমস্যাটা আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে কারণ এই প্রতিবন্ধগুলি প্রায়ই আসে জোট বেঁধে। যেমন ধরুন, ভারতে কয়লার ঘাটতিতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হল, ফলে খনি থেকে কয়লা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে পারল না প্রয়োজনের জায়গায় এবং তীব্রতর হল কয়লার ঘাটতি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এটা বোঝা যে ঘাটতি সামলানোর পথ দুটো। একটা তো অতি স্পষ্ট, উৎপাদন বাড়ানো; সরকার থেকে যখন বলা হয় যে 'অমুক অমুক' উৎপাদন-প্রতিবন্ধ অপসারণ লাগাতার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে' তখন তাতে বোঝায় যে সংশ্লিষ্ট উপাদানের (factor) উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আরেকটি পথও আছে। উপাদানটির দাম বাড়ানো, অথবা দামের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া—ঘাটতি থাকার দরুন দাম তার ফলে আপনিই বাড়বে। এতে চাহিদা কমে যোগানের সমান হয়। যাঁরা অর্থনীতিবিদ নন তাঁদের কাছে—এমন কি অনেক অর্থনীতিবিদের কাছেও—এটাকে একটা চালাকি বলেই মনে হয়। কিন্তু ভুল-বোঝাবুঝির কোনো অবকাশই এখানে নেই—দাম বাড়ানোটা সমাধান তো হতে পারেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা এমন কি কাম্যতর সমাধানও বটে।

অবশ্য অধিকাংশ সরকারের কাছেই সংকট মোচনের জন্য দাম বাড়ানোটা ব্যর্থতারই নামান্তর। এর মূলে রয়েছে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস যে উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ হলে তার দাম কম রাখা উচিত। অথচ কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ঘাটতি থাকলে আমরা নিশ্চয়ই চাইব তা যেন শুধু অত্যন্ত ফলপ্রসূ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় এবং সেটা সুনিশ্চিত করার একটি উপায় হল দামকে বাড়তে দেওয়া। দাম চড়া থাকলে কোনা উৎপাদকই অত্যন্ত ফলপ্রসূ উদ্দেশ্যে ছাড়া উপাদানটি ব্যবহার করবেন না এবং এইভাবে দামের দ্বারাই তার জন্য এক ধরনের রেশন-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে

এটা ঠিক যে অনাভ্যন্তরিকতা (externalities) এবং মৌলিক ভোগ্যবস্তুর ক্ষেত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ সমতামূলক যুক্তির চাপে আমাদের উপরোক্ত নীতি ছাড়তে হতে পারে। তবু যুক্তিটা সাধারণভাবে মনে রাখলে কাজ দেবে। বিশেষত প্রতিবন্ধের মোকাবিলা করতে গিয়ে একটা রেখে অন্যটা ফেলার দরকার হয় না, দুটো পথই অবলম্বন করা যায় পরস্পরের পরিপূরকরূপে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা ও রূপায়ণের সময়; ততদিন চুপচাপ বসে থাকার অর্থ আশু বিপর্যয় ডেকে আনা এবং প্রায়শ ঠিক তা-ই ঘটে থাকে। তার বদলে উচিত দাম-বাড়ানো পথটাকেও তাৎক্ষণিক প্রতিবিধানরূপে ব্যবহার করা। এঞ্জিনিয়াররা যতদিন উপাদানটির যোগান বাড়ানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত, ততদিন দুর্মূল্য উপাদানটির সুষ্ঠু বিতরণ সম্ভব হবে নমনীয় দামের সাহায্যে।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের ভূমিকা উৎপাদন বনাম নিয়ন্ত্রণ

ভারতের মিশ্র অর্থনীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ বেড়েই চলেছে। আমার বিদ্যাজীবী বন্ধুদের অনেকে বলছেন তাঁদের "bimodal preference"। কম পণ্ডিত লোকেরা তাঁদের চিন্তা অত ধূম্রজালে ঢাকতে জানেন না, তাঁরা শুধু বলেন মিশ্র অর্থনীতিতে তাঁরা ক্লান্ত, এবার ডান-বাঁয়ের হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া উচিত।

এ অসন্তোষের সঙ্গত কারণ রয়েছে। গত দু-দশক ধরে আমাদের মাথাপিছু আয়ের আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির গড় হার থেকেছে শতকরা ১·৫ এর তলায়। এর তুলনায় শুধু যে দক্ষিণ কোরিয়ার হার ৬·৯ ও চীনের হার ৫ তা-ই নয়, পাকিস্তানেরও হার ২·৮ ও শ্রীলঙ্কার ২·৫। দারিদ্র্য ভারতে পর্বতপ্রমাণ, বেকারি পরিমাপের অতীত।

এই ব্যাপক অসন্তোষের ফলেই সরকার এমন অনেক নীতি পরিবর্তন করতে পেরেছেন যা এ ছাড়া মোটেও গ্রহণীয় হত না। গত বছর সরকারি নীতিতে বিপুল রদবদল দেখা গেছে, আগামী বছরে নাকি আরো দেখা যাবে। প্রধান পরিবর্তনগুলি হল (১) বাণিজ্য আরো উদার করা, (২) কিছু কিছু শিল্প লাইসেন্সমুক্ত করা, (৩) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সংকুচিত করা এবং (৪) কর হার অনেকখানি নামিয়ে আনা। এ হেন সুদূরপ্রসারী নীতি পরিবর্তনের কয়েকটির মূল্যায়ন করা দরকার।

ভারতীয় অর্থনীতির কর্মধারা নিয়ে অসন্তোষটাকে সাধারণভাবে মিশ্র ব্যবস্থারই বিরুদ্ধে চালিত করার প্রচলিত প্রবণতা কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে। আমরা ভুলে যেতে পারি যে মিশ্র অর্থনীতিও নানা প্রকারের হতে পারে ; এবং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে যদি আমাদের আপাতত মিশ্র ব্যবস্থার মধ্যে থাকতেও হয় তবু আগের চেয়ে অনেক ভালোভাবে তা করা সম্ভব।

সরকার মোটামুটিভাবে দুটি উপায়ে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এক, নিজে উৎপাদনে না নেমে বেসরকারি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করে এ সরকারকে নিয়ন্ত্রক সরকার বলা চলে। দুই, সে নিজে উৎপাদনে নামতে পারে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ না করে তাকে দিতে পারে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা এ সরকারের নাম দেওয়া যায় উৎপাদক সরকার। বাস্তবে অবশ্য সরকারকে দু-রকম কাজই করতে হয়, তাই যে দিকে পাল্লা ভারি লেবেল হবে তদনুযায়ী।

এটা লক্ষণীয় যে ভারত সরকারের উৎপাদক ভূমিকা কিন্তু অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়—এমন কি সেগুলোর মধ্যে যেগুলো পুঁজিবাদী তাদের তুলনায়ও—আদৌ বেশি নয়। শিল্পোৎপাদনে সংযোজিত মূল্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির অংশের দিকে তাকালেই তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরা পড়ে সহজে। ভারতে সে অংশ শতকরা ১৬, মিশরে ৬০-এর বেশি, মেক্সিকোতে ৩০-এর কাছাকাছি, বাংলাদেশে ৪০-এর বেশি, আর দক্ষিণ কোরিয়ায় তা ১৬। ভারত যে মিশ্র অর্থনীতিরূপে পরিচিত আর দক্ষিণ কোরিয়া পুঁজিবাদী বলে, তা জাতীয়কৃত ক্ষেত্রের আয়তনের বিচারে স্পষ্টতই নয়। আসলে অর্থনীতিতে ভারত সরকারের ভূমিকা প্রধানত নিয়ন্ত্রণের। ভারত সরকার মোটের উপর নিয়ন্ত্রক সরকার, আর আমার প্রতিপাদ্য হল, সমস্যাটা সেখানেই।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানো যেতে পারে। প্রায় রোজই আমরা ফাটকাবাজ ও মজুতদারদের সমালোচনা শুনে থাকি, সাধারণত ভ্রান্তমুখী সেই সমালোচনা। ফাটকাবাজি হল দর কম থাকার সময় মাল কিনে চড়া দরের সময় তা বিক্রি করা। কিন্তু যেহেতু দর কমে প্রাচুর্যের সময় আর বাড়ে ঘাটতির সময়, তাই ফাটকাবাজির দ্বারাই পণ্যের সঞ্চালন ঘটে উদ্বৃত্ত থেকে ঘাটতির দিকে। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাটকাবাজি সাধু কাজ। ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রোশ হয় শুধু এইজন্য যে ওরা টাকা কামায় অন্যদের দুর্ভোগের সময়। অথচ একটু বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে বিচার করলেই দেখা যাবে যে ফাটকাবাজি নিষিদ্ধ করে দিলে অন্যদের দুর্ভোগ তাতে বাড়ত বই কমত না।

সবচেয়ে ভালো হত সরকার যদি নিজেই ফাটকাবাজিতে নামত, অর্থাৎ ঘাটতির সময় পণ্য কিনত এবং প্রাচুর্যের সময় বিক্রি করত? আমলারা, অন্তত আশা করা যাক, মুনাফাশিকারে মাতত না, ফলে ব্যবসায়ীরাও ফাটকাবাজির স্বাভাবিক মুনাফা থেকে বঞ্চিত হত প্রতিযোগিতার চাপে। ঐ শেষ দুটি কথা গুরুত্বপূর্ণ। সুযোগের অভাবে বেসরকারি ফাটকাবাজি বন্ধ হওয়া সমাজের পক্ষে যেমন হিতকর, আইন করে বন্ধ করা ঠিক তেমনি ক্ষতিকর। এটাই আমার মূল প্রতিপাদ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা উচিত কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন বেসরকারি ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণের জটিল ব্যবস্থার বিলোপ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উদারতর বাণিজ্যের দিকে পদক্ষেপ একটি বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন। ভারতে দুটি দলই উদারতা বাণিজ্যের বিরুদ্ধে—ব্যবসায়ীরা, কারণ তাঁরা ঠিক জানেন তাঁরা কি চান; আর বিপ্লবীরা যাঁরা তা জানেন না। নিয়ন্ত্রণের প্রধান ফল দাঁড়িয়েছে এই যে দেশি ব্যবসায়ীরা অস্বাভাবিক চড়া দামে রদ্দি মাল বেচে বিপুল মুনাফা করতে পেরেছেন। অবশ্য উদারতর বাণিজ্যের পদক্ষেপ যদিও সঠিক দিকেই তবু এ যাবৎ এ বিষয়ে অবলম্বিত নীতি যথেষ্ট উন্নতির দাবি রাখে।

কম্প্যুটার শিল্পের কথাই ধরুন। যন্ত্রাংশের উপর বহিঃশুল্ক (customs) ও অন্তঃশুল্ক (excise) কমানো হয়েছে কিন্তু কম্প্যুটার উপর প্রচণ্ড বিধিনিষেধ এখনও বলবৎ। টেলিভিশনের বেলাতেও সেই একই কথা। একই ধরনের রঙিন টিভি-র দাম যদি ভারতে ৮০০০ টাকা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে তা মোটে ৩০০ ডলার (প্রায় ৩৫০০ টাকা)। তৈরি মালের (এক্ষেত্রে কম্প্যুটার ও টিভির) আমদানি উদারতর হলে তা দেশি ব্যবসায়ীদের মুনাফা কমিয়ে দিত, শিল্পের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলত, প্রতিযোগিতামূলক দামের গুণে উপকৃত হত ক্রেতা সাধারণ। যাঁরা আশঙ্কা করেন যে নতুন প্রতিযোগিতার চাপে বিদ্যমান সংস্থাগুলি পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হত তাঁদের জন্য রয়েছে আমাদের মোটর গাড়ি শিল্পের পাল্টা উদাহরণ—তা থেকেই বোঝা যায় ভারতীয় শিল্পের স্থিতিস্থাপকতা ও খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা কতখানি।

বাণিজ্যের সুবিধাগুলি কিন্তু খুবই অসমভাবে বন্টিত হতে পারে, এ সম্বন্ধে সজাগ থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে এর। সম্প্রতি 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি'তে জন কুরিয়েন-এর লেখায় দেখা যায় যে ষাট ও সত্তরের দশকে কেরালা থেকে চিংড়ি রপ্তানি এমন চমকপ্রদ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সাবেক জেলেরা সমান দরিদ্র থেকে গেছে বা হয়তো হয়েছে খানিকটা দরিদ্রতর।

এটা অবশ্য উদারতর বাণিজ্যের বিপক্ষে কোনো অজুহাত নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট সুবিধা এত বেশি যে সব থেকে ভালো কৌশল হবে একদিকে বাণিজ্য উদারতর করা এবং অন্য দিকে তার পরিপূরক হিসেবে যথাযথ পুনর্বন্টনের উপযোগী রাজস্বনীতি অবলম্বন করা। এই শেষোক্ত ব্যাপারে আমাদের প্রয়াস দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তোষজনক নয়।

১৯৮৫-৮৬-র কেন্দ্রীয় বাজেটে যে নতুন রাজস্বনীতি ঘোষিত হয়েছে তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে, এ বিষয়ে আমি খুবই সংক্ষেপে কটি মন্তব্য করব। কর-হার প্রচুর নামানো হয়েছে এই বিশ্বাসে যে ফলে লোকে বেশি বেশি আইন মানবে এবং মোট সংগৃহীত করের পরিমাণ বাড়বে। এতে আমাদের ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ যুক্তিবিমুখ জীব বলে বলে তো ধরেই নেওয়া হয়েছে, উপরন্তু করকে দেখা হয়েছে কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে। অথচ অন্তত অংশত করকে দেখা উচিত দরিদ্রের অনুকূলে সম্পদ পুনর্বন্টনের হাতিয়ার হিসেবেও।

এ প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা দরকার যে মূল্যস্ফীতি প্রতিবিধানকল্পে আমরা যদি-বা নামিক (nominal) কর কমানোই ঠিক করি তবু তা করা উচিত tax brackets (করদায়ী পর্যায়গুলিকে) আরো উপরে উঠিয়ে, কর-হার কমিয়ে নয়, কেননা প্রথমটিতে অন্তত করপ্রণালীর (tax schedule) সমানুপাতী চরিত্র (progressive) অপরিবর্তিত থাকে। এ বছরের বাজেটে বিভিন্ন মৌল প্রয়োজন-পূরক কার্যক্রমের জন্য সংস্থানও অপ্রতুল। Integrated Rural Development Programme ও National Rural Employment Programme যদি সত্যিই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হয়ে থাকে তাহলে ঐ কার্যক্রমগুলোর উপর স্রেফ কাঁচি চালালেই চলবে না, আমাদের ভাবতে হবে দরিদ্র সাধারণের কাছে পৌঁছনোর ভিন্নতর উপায়। অধ্যাপক গলব্রেথ রেগানীয় অর্থনীতির যে ভ্রান্তি নির্দেশ করেছেন আমরা যে তার কবলে পড়ে বিশ্বাস করতে শুরু না করি যে 'ধনীদের বেশি খাটতে প্রবৃত্ত করবে বেশি আয়, আর গরিবদের কম আয়।'

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কিয়দংশ বেসরকারি উদ্যোগের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার অনুকূলে অভিমত সম্ভবত সরকারি মহলে জোরালো হয়ে উঠছে। সেটা কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকা বিষয়ে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে—তা চাহিদা চাগিয়ে তোলে, ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে তার ক্রমহ্রাসমান ভূমিকাই ছিল শিল্পমন্দার কারণ, শিল্পের অত্যাবশ্যক মৌলকাঠামো যোগায় এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র। এ সবেই কিছু কিছু সত্য আছে, তবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সপক্ষে প্রবলতম যুক্তিটি হল এই লোকের ট্যাঁক থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে টাকা টেনে এনে কিছুটা পরিমাণে অসাম্য সংশোধনের ক্ষমতা আছে এরই। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সংকুচিত না করে আমাদের বরং চেষ্টা করা উচিত ঐ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে।

বেসরকারি ক্ষেত্রেও কর্মচারীদের বিপুল অধিকাংশই কোনো মুনাফা অর্জন করেন না। সুতরাং মুনাফা-ধাক্কার অভাব দিয়ে স্পষ্টতই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অদক্ষতা ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাখ্যা রয়েছে পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে এবং তা নিশ্চয়ই সংশোধনের অতীত নয়। এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতির দুটি দেশ দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষতম বেশ কিছু সংস্থাই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে। আমাদের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাগুলির সংগঠন-ব্যবস্থা ও প্রণোদন-প্রণালীকে ঢেলে সাজানো।

সরকারকে আরো উৎপাদন প্রবৃত্ত করানোর যে কোনো যুক্তি অনেকের কাছে মনে হয় বেসরকারি ক্ষেত্রকে খর্ব ও লাইসেন্সবন্দী করার যুক্তি বলে। এই বিভ্রান্তি আমাদের বহু দুর্দশার জনক। আমাদের জটিল লাইসেন্স-ব্যবস্থা বিলোপের জন্য সম্প্রতি যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাই। ক্রেতা সাধারণকে রক্ষা করা ও একচেটিয়া প্রতিরোধের জন্য প্রথমে এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও আজ তা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিযোগিতা থেকে কায়েমি শিল্পগুলিকে রক্ষা করার কল বিশেষ। এটাকে হঠাতে পারলে দক্ষতা বাড়বে, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে ; তাছাড়া তা এ লেখার বৃহত্তর প্রতিপাদ্যের সঙ্গেও খাপ খায়। সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন দুই-ই করতে হয়, কিন্তু ভারত সরকার বড় বেশি নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছে, এবার সময় এসেছে একটা সামঞ্জস্য আনার।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজুরি ও বেতনের সূচকীকরণ

সামান্যতম মূল্যস্ফীতিও যে অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনকে এত বিপর্যস্ত করে দেয় তার একটা কারণ আমাদের অর্থনীতিতে সূচকীকরণ (indexation) নেই বললেই চলে। মুদ্রাস্ফীতিতে আমাদের সঞ্চয় ক্ষয় হয়ে যায়। বেতন অনবরত সংকুচিত হতে থাকে, বাড়ে আয়করের বোঝা।

সূচকীকরণ মানে চুক্তিতে দরবৃদ্ধির একটি প্রতিষেধক রাখা, যাতে নিছক মূল্যস্ফীতির দরুন কারো লাভ বা লোকসান না হয়। যেমন কারো ১৫০০ টাকার বেতন যদি সম্পূর্ণ সূচকীকৃত হয় তাহলে প্রতি বছর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাভাবিক বেতনবৃদ্ধি তো হবেই, উপরন্তু দরবৃদ্ধি পূরণের জন্যও একটা বৃদ্ধি ঘটবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে আর্থিক বেতন বাঁধা, সূচকীকরণ প্রকৃত বেতন বেঁধে দেবে।

আর্থিক অঙ্কে প্রকাশিত যে কোনো ভেদককে (যেমন মজুরি, খাজনা, সুদের হার ইত্যাদি) সূচকীকরণ করা যায়। দুনিয়াতে সূচকীকরণ ব্যবহৃত হয়েছে নানা মাত্রায়—ইজরায়েলে, ব্রেজিল ও অন্যান্য লাতিন আমেরিকান দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সারা ইউরোপে। এর সপক্ষে যুক্তি খুবই জোরালো, গুরুত্ব সহকারে ভারত সরকারের তা ভেবে দেখা উচিত। তিনটি জিনিস নিয়ে শুরু করা যেতে পারে (১) মজুরি ও বেতন, (২) সুদের হার (৩) আয়কর-দায়ী পর্যায়সমূহ (income tax brackets)।

সরকার অবশ্য বেসরকারি ক্ষেত্রকে মজুরি ও বেতন সূচকীকরণে বাধ্য করতে পারবে না কিন্তু নিজে তা না করার কোনো কারণ নেই। কোনো বিশেষ দর-সূচককে (price index) বেছে নিয়ে প্রতি বছর তার বৃদ্ধি অনুযায়ী সরকারি মজুরি বাড়িয়ে যেতে হবে।

বাস্তবে এখনি মাঝে মধ্যে বেতনকে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়। যেমন ১৯৭৩-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন সংশোধিত হল, সরকার আশ্বাস দিয়েছেন অদূর ভবিষ্যতে আবার সংশোধন করার। সরকার বস্তুত এ বিষয়ে খুবই সঙ্গতিনিষ্ঠ, গত পাঁচ বছর ধরেই এ আশ্বাস দিয়ে চলেছেন। এর সঙ্গে সূচকীকৃত মজুরির তফাৎ এইটুকুই যে তাতে মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিপূরণ ঘটবে আপনা থেকেই প্রতি বছরের প্রথমে।

প্রস্তাবটা যদি নাটকীয় শোনায় তবে তার একমাত্র কারণ হবে এই জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের অর্থনীতির শোচনীয় পশ্চাৎপদতা। মজুরি ও বেতনের সূচকীকরণ বেশি বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবী জুড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সুবিধাভোগী শ্রমিকদের অনুপাত ১৯৬৬ সালে শতকরা ২০ থেকে ১৯৭৬-এ গিয়ে দাঁড়াল শতকরা ৫৮ ভাগে। অনুরূপ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় সারা ইউরোপে। একমাত্র ব্যতিক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিনল্যান্ড—ওখানে চল্লিশের দশকে মজুরি সূচকীকরণ চালু হয়েছিল, তারপর ১৯৬৮-তে তার জায়গায় প্রবর্তিত হল এক মজুরি ও আয় নীতি (A wage and income policy)।

সরকার যদি মজুরি চুক্তিতে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিষেধক শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেন তবে আশা করা যায় তা সারা দেশে ছড়াবে। বেশির ভাগই দেশেই সূচকীকরণ কোনো এক মূল ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র ছড়িয়েছে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ইজরায়েলি সরকার শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মজুরি সংশোধনের জন্য একটি যুক্ত কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি মজুরি সূচকীকরণের সুপারিশ করল এবং তা Histradrut নামক বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন ও Manufacturers' Association গ্রহণ করল। শীঘ্রই তা দেশ জুড়ে রূপায়িত হতে লাগল।

ভারত সরকার যদি সূচকীকরণের নীতি গ্রহণ করে তবে দুটি কারণে বেসরকারি ক্ষেত্রে তার প্রবর্তন ত্বরান্বিত হবে। যেখানে যেখানে শক্তিশালী ইউনিয়ন রয়েছে সেখানে তারা সরকারের নজির দেখিয়ে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে এই রক্ষাকবচটি আদায় করে নেবে। আর অবশিষ্ট জায়গাগুলি উৎকৃষ্ট শ্রমিকরা কেবলই ছেড়ে যেতে চাইবে এবং তার ফলে নিছক বাজারের নিয়মের চাপেই সে সব জায়গাতেও চালু হবে সূচকীকরণ।

যদি মনে হয় ভারত সরকারের কাছ থেকে এক ধাক্কায় শতকরা একশো ভাগ মুদ্রাস্ফীতি পূরণের ব্যবস্থা আশা করা অবাস্তব, তবে দুটো আংশিক চরিত্রের বিকল্প বিবেচনা করা যেতে পারে। কোনো বছর মুদ্রাস্ফীতি কেবল একটা বিশেষ মাত্রা (ধরুন, শতকরা ৫ ভাগ) ছাড়িয়ে গেলেই সূচকীকরণের প্রয়োগ হবে, এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়। অথবা একটি বিশেষ নিম্নসীমার তলায় যাদের আয় শুধু তাদের জন্য সূচকীকরণ প্রবর্তিত করা যায়। দুটো পথই ইতিপূর্বে পরীক্ষিত হয়েছে—প্রথমটা ইংলণ্ডে, ১৯৭৩-এর পরে অল্প কিছু কালের জন্য আর দ্বিতীয়টা ইজরায়েলে ব্যাপকভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে, সমতাবিষয়ক (egalitarian) নীতি হিসেবে। অবশ্য ইজরায়েলে আয়ের নিম্নসীমাটিকে সূচকীকৃত করা হয়নি, ফলে মুদ্রাস্ফীতির একেকটি ধাক্কায় উত্তরোত্তর বেতন বেরিয়ে যেতে লাগল সূচকীকরণের আওতা থেকে।

সূচকীকরণের ফলে মূল্যস্ফীতির সময় লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো অবনতি ঘটে না, তা একই থাকে। মূল্যস্ফীতির সময় দেশের মোট আয় মোটামুটি একই থাকে, শুধু কারো লাভ হয় আর কারো হয় লোকসান। সূচকীকরণ এই ধরনের পুনর্বণ্টন রোধের একটি প্রয়াস মাত্র।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যস্ফীতি বনাম সঞ্চয়

Thomas Mann তাঁর 'The Witches' Sabbath' বইটায় একটি ব্যক্তিগত কাহিনী দিয়ে মূল্যস্ফীতির বিভীষিকা বর্ণনা করেছেন। একটি 'যুদ্ধের সময় আমি এক বন্ধুর বাগান বাড়িতে ১০,০০ মার্ক ঋটিয়েছিলাম। আমি সেখানে প্রায় বেড়াতে যেতাম। এক অর্থে বাড়িটার শরিক হয়ে গেলাম আমি। কার্যতঃ। কারণ ধারটা আমি দিয়েছিলাম বাড়িটার উপর আংশিক স্বত্ব বন্ধক রেখে। ১৯২৩-এর বসন্তে বন্ধু জানাল যে পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে সে বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছে, এবার আমার টাকা সে ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছে। মুচকি হেসে সে জুড়ে দিল—সেই ১০,০০০ মার্কই, আমারই দেওয়া নোটগুলি।' নোটগুলি তখন প্রায় মূল্যহীন, কারণ জার্মানি তখন পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রবলতম মূল্যস্ফীতির কবলে। ১৯২৩-এ সেখানে দর বেড়েছিল ২৫ কোটি গুণ, সে বছরের শেষে একটা খবরের কাগজের দাম দাঁড়িয়েছিল কুড়ি হাজার কোটি মার্ক, একটা ট্রামের টিকিটের দাম পনেরো হাজার কোটি মার্ক।

এমন সাংঘাতিক মূল্যস্ফীতি অবশ্য বিরল (যদিও এই শতাব্দীতেই অন্তত আরো দশটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত সহজেই মিলবে), তবে তিন অংকের মূল্যস্ফীতি দেখা গেছে বহু দেশেই, বহু দিন ধরে। মূল্যস্ফীতির কারণ এখনও ধন্ধময়। ফলে কেউই গ্যারান্টি দিতে পারে না যে ঐ রকম লাগামছাড়া মূল্যস্ফীতি এ দেশেও ঘটবে না। ঘটলে তার সবচেয়ে মর্মান্তিক মারটা পড়বে বৃদ্ধ ও অশক্তদের উপর। শূন্যে মিলিয়ে যাবে তাঁদের সঞ্চয়। যাঁরা শেয়ার, পণ্যসামগ্রী বা বহুকাল স্থায়ী দ্রব্যাদিতে সঞ্চয় রাখেন তাঁদের অবশ্য চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সঞ্চয়স্থল হল ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট। তাই অন্তত একটি সহজলভ্য বণ্ড বা আমানতকে সূচকীকৃত (indexed) করে দেওয়ার গুরুত্ব নিশ্চয়ই আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুদের হার সূচকীকৃত করার অর্থ তাকে প্রকৃত মূল্যে বেঁধে দেওয়া। অর্থাৎ আপনার যদি শতকরা ৫ ভাগ সুদ প্রাপ্য হয় এবং তা যদি সূচকীকৃত হয়, তাহলে শতকরা ১২ ভাগ মূল্যস্ফীতির সময় আপনি অঙ্কে সুদ পাবেন শতকরা ১৭ ভাগ। ফলে আপনার সঞ্চয়ের মূল্যহানি পূরণ হওয়ার পরেও আপনি পাবেন শতকরা ৫ ভাগ। আর তা যদি সূচকীকৃত না হত তাহলে ঐ মূল্যস্ফীতির ফলে আপনার আসলে লোকসান হত শতকরা ৭ ভাগ।

ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, ইজরায়েল ও ব্রেজিলে সূচকীকৃত বণ্ড পাওয়া যায়। অধিকাংশ ধরনের সঞ্চয়ই সূচকীকৃত করা দরকার, তবে আশু ব্যবস্থা হিসেবে অন্তত ভারত সরকার তেমন একটি পরিকল্পনার কথা ভাবতে পারে। এর মধ্যে দাতব্য ব্যাপার কিছু নেই। এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে লোকে অবশ্যই অধিকতর সঞ্চয়ে উৎসাহিত হবে এবং সরকারের হাতে আসবে আরো বেশি সংস্থান ও বিনিয়োগ বাড়ানোর সম্বল।

মজুরি ও সুদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় আছে, তা-ও সূচকীকৃত হওয়া উচিত—আয়করের পর্যায়-বিন্যাস (income tax brackets)। অধিকাংশ মানুষই বোঝেন না যে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিটি ধাক্কা আমাদের উচ্চ থেকে উচ্চতর কর পর্যায়ে তুলে দেয়, যদিও আমাদের প্রকৃত অবস্থার উন্নতি হয় না কোনো। কোনো বছরে ধরুন একেবারে এমন সুষমভাবে মূল্যস্ফীতি ঘটল, যাতে সব দাম এবং সব বেতনই দ্বিগুণ হল ; সব বেতনজীবীর প্রকৃত অবস্থা তখন একই থাকবে, অথচ আর্থিক অঙ্কে তাঁদের আয় দ্বিগুণ হওয়ার দরুন আয়করের বোঝা তাঁদের বেড়ে যাবে। মিলটন ফ্রিডম্যান বলেছেন, এই কারণেই অধিকাংশ সরকারের মূল্যস্ফীতিতে একটা কায়েমি স্বার্থ থাকে—হৈ-চৈ প্রতিবাদ ছাড়াই চুপচাপ তারা এর দ্বারা আত্মসাৎ করে বেশি রাজস্ব নিতে পারে। আয়করের পর্যায়ক্রমগুলি সূচকীকৃত হলে তা সম্ভব হত না, কারণ মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেগুলোও তখন উপরে উঠে যেত।

আয়করের সূচকীকরণ অপেক্ষাকৃত বিরল হলেও তার প্রয়োগ হয়েছে নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, ব্রেজিল এবং সীমিত পরিমাণে সুইজারল্যান্ডে। এটার রূপায়ণ বেশ সহজ, এ দেশে সেটা মজুরি সূচকীকরণের সঙ্গে একত্রে চালু করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

আপত্তি উঠতে পারে, মূল্যস্ফীতি ভারতে এত প্রবল নয় যে তার জন্য সূচকীকরণ প্রয়োজন। অথচ এ যুক্তি অচল, কেননা সূচকীকরণ এক আশ্চর্য দাওয়াই—মূল্যস্ফীতি না থাকলে তা নিষ্ক্রিয়, মূল্যস্ফীতি বাড়লে তার শক্তি বাড়তে থাকে। ফলে আমরা যদি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব বলে নিশ্চিত হই তাহলে সূচকীকরণে লোকসান নেই, পক্ষান্তরে যদি মনে হয় যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতখানি নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না তাহলে সূচকীকরণ অপরিহার্য।

ন্যূনতম কিছু সূচকীকরণ ন্যায্যতার খাতিরেই প্রয়োজন। দেশবাসী যত তাড়াতাড়ি একে নিজেদের অধিকার ব'লে চিনতে শিখবেন ততই মঙ্গল।

(প্রকাশ প্রকাশ ১৯৮৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইনে বনাম উপরি সুবিধা

আমাদের দেশে চাকরির উপরি সুবিধাগুলো এক বিরাট ভূমিকা পালন করে, বিশেষত আয়ের উঁচু তলার দিকে। কোম্পানির ডিরেক্টর বেতনের আকারে যা পান তার চেয়ে ঢের বেশি উপার্জন করেন উপরি সুবিধা। সরকারি উপরওয়ালার বেলাতেও ব্যাপারটা প্রায় একই রকম। অথচ ব্যবস্থাটি অতি অবাঞ্ছিত, অপচয় ও অদক্ষতার উৎস। যদি উপরি সুবিধাগুলোর বদলে সমপরিমাণ নগদ মাইনে দিয়ে দেওয়া হত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতি লাভবান হত তাতে।

বড় সরকারি চাকুরের কথাই ধরুন। তিনি থাকেন অভিজাত পল্লীতে তিন শয়নঘর বিশিষ্ট চমৎকার একটি বাড়িতে, খোলা বাজারে যার ভাড়া-ই হবে তাঁর পুরো মাইনের সমান। অথচ সরকার যদি তাঁকে বাড়িটি না দিয়ে ঐ ভাড়ার টাকাটা নগদ দিয়ে দিত, তাতে লাভবান হত সকলেই। আমলাটি হয়তো নিজের জীবনযাত্রা বদলে নিতেন একটু। হয়তো ভাড়া নিতেন আরো ছোটো একটি ফ্ল্যাট এবং বেঁচে যাওয়া টাকা খরচ করতেন অন্য কিছুতে। যা-ই করুন তাতে তাঁর অবস্থার অবনতি হত না, কারণ সরকার তাঁকে ইতিপূর্বে যে ফ্ল্যাটটি দিয়েছিল তেমন একটা বাসস্থান ভাড়া নেওয়ার পথ তাঁর খোলাই থাকত। সরকারেরও এতে লোকসান হত না, কারণ ফ্ল্যাটটির ভাড়া দিয়েই এখনকার বাড়তি মাইনে পুষিয়ে নেওয়া যেত। অর্থাৎ ব্যবস্থাটা বদলানোয় কারুরই ক্ষতি হবে না। কারো কারো লাভ হবে মাত্র—যে ধরনের পরিবর্তনকে অর্থনীতিবিদরা Pareto উন্নতি আখ্যা দেন (এঞ্জিনিয়ার থেকে অর্থনীতিবিদ হওয়া ইতালি দেশীয় ভিলফ্রেদো পারেতোর নামানুসারে)। সবচেয়ে ভালো হয় যদি ফ্ল্যাট বা সমপরিমাণ নগদ নেওয়ার সিদ্ধান্তটা সরকার কর্মচারীর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন। আমি শুধু এটুকুর উপর জোর দেব যে ঐ সমপরিমাণের হিসাবটা করতে হবে চলতি বাজারদরের ভিত্তিতে, মান্ধাতার আমলের কোনো অচল নিরিখের ভিত্তিতে নয়।

উপরি সুবিধাগুলিকে নগদ বেতনে রূপান্তরিত করার আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা ফল হবে অপচয় হ্রাস। একজন কোম্পানি আমলার কথা ধরুন, তাঁর পেট্রোল খরচা তাঁর কোম্পানি বহন করে। যখন-তখন তিনি তাঁর গাড়ি ব্যবহার করছেন, তাঁর স্ত্রী যত ঘন ঘন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি ঘুরছেন পেট্রোলের দাম নিজেরা গুনতে হলে তা সম্ভব হত না (বন্ধুবান্ধবরাও বোধ করি খুব অখুশি হতেন না তাতে), মহিলাটি হয়তো-বা সমাজসেবী বা এমন কি শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকই ব'নে গেছেন।

এখন কোম্পানি যদি আমলাটিকে নগদ টাকা দিয়ে দেয় পেট্রোল নিজে কিনে নেওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য, তাহলে অনেক এলোপাথাড়ি খরচের অবসান হয়। কোম্পানি লাভবান হয়, আমলাটির লোকসান হয় না কিছু। সবচেয়ে বড় কথা, পেট্রোল খরচ কমার ফলে সমাজের উপকার হয় প্রচুর। (ভদ্রমহিলা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা বা সমাজসেবা ছেড়ে দেওয়ার উপকারটা আমি আর ধরলাম না।)

সারা দেশ জুড়ে এইসব ছোট ছোট দৃষ্টান্ত যোগ করলেই পরিষ্কার হবে—বেতন বাড়িয়ে উপরি সুবিধা ছেঁটে দিলে জ্বালানি, বাসস্থান ও টেলিফোনের কতখানি অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব। অবশ্য এ সংস্কার প্রবর্তনের প্রাচীন অন্তরায় হল আমাদের কর ব্যবস্থা—অর্থ উপার্জনের জন্য মাশুল দিতে হয়, উপরি সুবিধার জন্য নয়। কর ব্যবস্থার এই বৈষম্য দূর করতে পারলেই বেসরকারি ক্ষেত্রে উপরি সুবিধা থেকে নগদে উত্তরণ ঘটবে আপনা-আপনি, সরকারি ক্ষেত্রে হয়তো কিঞ্চিৎ পরিকল্পনার সহায়তায়।

এতে ক্ষতি কারো নেই, লাভ অনেকের। একমাত্র প্রতিবন্ধক হল আমাদেরই রক্ষণশীলতা, যার প্রভাবে আমরা আমাদের চিরাচরিত একপেশে করব্যবস্থা সমর্থন করে চলি। ফেব্রুয়ারি হল আমাদের কর পুনর্বিন্যাসের মাস, এ সময় সমস্যাটা নিয়ে একটু চিন্তা করলে মন্দ কি।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি বাণিজ্য বিষয়ক ভুল ধারণা

'সরকারের অর্থনৈতিক পন্থাগুলি সম্পর্কে ভারতে কেউ আমাকে কিছু বলতে পারেনি। ...মন্ত্রিসভা কোনো ব্যাপারেই একমত হতে পারে না, কোনো নীতিও অবলম্বন করতে পারে না।' কথাগুলি লিখেছিলেন Peter Drucker ১৯৭৯ সালে 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এ। ভারতীয় অর্থনীতির বিষয়ে কোনো ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞের মতামত বা ওয়াল স্ট্রিটের মতামত নিয়ে আমাদের মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই, তবে ঘটনা হল, এই বিশেষ বর্ণনাটি হুবহু খাপ খেয়ে যায় ১৯৮৮-এর ভারতবর্ষের সঙ্গে।

আমরা যে কোথায় চলেছি, আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা কি, অথবা তেমন কোনো পরিকল্পনা আদৌ আছে কিনা—এ সব কিছুই পরিষ্কার নয়। ১৯৮৮-এর কেন্দ্রীয় বাজেট অদূরবর্তী, তাই এ-ই হল আমাদের অর্থনৈতিক পন্থাদি মূল্যায়নের সময়। আশা জাগে নতুন দিক্‌নির্দেশ ও পেরেস্ত্রেইকার সম্ভাবনার—চাই সত্যিকারের পরিবর্তন, অর্থনীতির মৌলিক পুনর্বসিনের মুখোশ পরিয়ে শুধু ধনীদের জন্য কর-রেহাই নয়।

আমাদের কাজ যে সম্ভাবনার কত পশ্চাদ্বর্তী তার দুটি দৃষ্টান্ত হল আমাদের বহির্বাণিজ্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রম। আমার বিশ্বাস, দুটোতেই অনেক বেশি উদ্যম ও গতিশীলতা দরকার। আমি আপাতত বাণিজ্যের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছি।

বাণিজ্যে আমরা চিরকালই নৈরাশ্যবাদী। আমাদের নীতিগুলি তাই ঘরমুখী, বহির্বাণিজ্যের যেসব সুবিধা পাওয়ার কথা তার ধারে কাছেও আমরা যেতে পারিনি। তার জন্য দায়ী আমাদের নীতিপ্রণেতা ও অর্থনীতিবিদ আমলাদের মনে বাসা-বেঁধে থাকা কুসংস্কার।

একটি জনপ্রিয় ধারণা হল, ভারতবর্ষ এতই বড় একটি দেশ যে তার যথোচিত রপ্তানি বৃদ্ধি ঘটলেই আন্তর্জাতিক দর পড়ে যাবে। ফলে বাণিজ্য থেকে দক্ষিণ কোরিয়া বা সিঙ্গাপুরের মতো ছোট দেশগুলি যে ফায়দা তুলেছে তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। লোকে বোঝে না যে এই সব ছোট দেশ যে পরিমাণ রপ্তানি করে সেটুকু করতে পারলেই আমাদের রপ্তানি ডবলের বেশি হয়ে যায়। ১৯৮৫-তে ভারতে মোট রপ্তানির মূল্য ছিল ১০২৬ কোটি ডলার, কোরিয়ার (জনসংখ্যা ৪·১ কোটি) ৩০২৮ কোটি ডলার, আর সিঙ্গাপুরের (জনসংখ্যা ২৬ লক্ষ) ২২৮১·২ কোটি ডলার। অর্থাৎ এই ছোট দেশগুলির সমান রপ্তানি করতে পারলেই বদলে যায় আমাদের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের (balance of trade) হাল। কোরিয়ার তুলনায় আমাদের দেশ যত বড় সেই অনুপাতে আমাদের রপ্তানি বাড়লে কি ঘটত—এই সবই হল অলস কচকচি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কেউ যুক্তি দেন যে আমাদের তথাকথিত বামঘেঁষা নীতির দরুন পুঁজিবাদী দুনিয়া নাকি আমাদের সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে থাকে, আর তাই আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা তত সুবিধা করতে পারছি না। দুটো তথ্যে এ মতের গলদ ফাঁস হয়ে যায়।

প্রথমত, চীনের অর্থনীতি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বামপন্থী, তবু তার রপ্তানি আমাদের বহুগুণ। ১৯৮৫-তে তা ছিল ২৭৩২·৭ কোটি ডলার।

দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশগুলির মনোভাব যদি তা হয়েও থাকে তবু আমরা তো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রপ্তানি বাড়িয়ে তা পুষিয়ে নিতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের সাফল্য কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রেজিলের অনেক পেছনে। ১৯৮৫-তে তৃতীয় বিশ্বে ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২০৫·২ কোটি ডলার, কোরিয়ার ৭৫৭ কোটি ডলার আর সিঙ্গাপুরের ১০৯৫ কোটি ডলার। আনুপাতিক বিচারে চিত্রটা আরো খারাপ—ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ২০ ভাগ যায় উন্নয়নশীল দেশে। কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের যথাক্রমে শতকরা ২৫ ও ৪৮ ভাগ।

পূর্ব এশিয়ার এই ওস্তাদ রপ্তানিকারীদের মতো অত ভালো করতে না পারার অনেক কারণ আমাদের রয়েছে এবং হামেশা সেগুলো নির্দেশিতও হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের যে একটা বিরাট সুবিধাও রয়েছে তা নিয়ে উচ্চবাচ্য হয় কদাচিৎ, নিশ্চয়ই মনে আছে, এই পূর্ব এশীয় রপ্তানিকারীরা আন্তর্জাতিক বাজারে ঢুকেছিল তাদের সস্তা শ্রমের জোরে, কিন্তু অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে (সিঙ্গাপুরের মাথাপিছু আয় আজ স্পেন, এমন কি নিউজিল্যান্ডের চেয়ে বেশি) সে সুবিধা অন্তর্হিত হয়েছে।

আমাদের এ সুবিধাটা শ্লাঘার বিষয় না হলেও তার অস্তিত্ব মানতেই হবে। অপর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত শ্রমের দৌলতে বহু মাঝারি আয়-বিশিষ্ট ওস্তাদ রপ্তানিকারী দেশকেই হঠিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে।

আরো রপ্তানি করতে গেলে আমাদের উন্নত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ আমদানি করতে হবে। কিন্তু উদারতর আমদানি নীতির ফলে আমাদের balance of payments-এ টান পড়বে বলে আপত্তি উঠেছে। আমাদের বাণিজ্যনীতিকে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখি বলেই এ আশঙ্কা জাগে। বাস্তবে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির পরিপূরকরূপে ব্যবহার করতে হবে, যাতে balance of payments-এর ঘাটতিকে সামলে রাখা যায়।

বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকগুলি খাড়া রাখার দিকে আমাদের এই প্রবণতার পেছনে রয়েছে প্রধানত এই বিশ্বাস যে আরো মুক্ত বাণিজ্যনীতি একটা প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাপার। এর তল পাওয়া আমার কাছে বড় কঠিন ঠেকে। কোটি কোটি মানুষের কাছে রদ্দি মাল বেচে বিপুল মুনাফা কামানো যাতে সম্ভব হয় সেজন্য ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষিত করার নীতি দেশোয়ালি ব্যবসায়ীদের কাছে তো আকর্ষণীয় হবে। এটা বোঝা সহজ। কিন্তু এ নীতির বিরোধিতা কেন প্রতিক্রিয়াশীল তা বোঝা সহজ নয় মোটেও।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

বাজেট ও রাজস্ব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যস্ফীতি আর করফাঁকি

২৯-এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, দূরদর্শনের খবরে দেখালো অনেক "সাধারণ মানুষের" সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তাঁরা সবাই একমত। এ বছরের বাজেট নাকি চমৎকার। আমার ধারণা এর থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দেশের "সাধারণ মানুষের" খুব বুদ্ধি। তাঁরা বেশ বুঝেছেন যে দূরদর্শনে আবির্ভাব এবং সত্যি কথা বলার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে এবং এর মধ্যে থেকে তাঁরা বেছে নিয়েছেন দূরদর্শনে আবির্ভাবের মজাটিকে।

যত দিন যাচ্ছে, রাজস্ব সংক্রান্ত বড় বড় বিষয়ে অগ্রিম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে আমাদের বাজেট যেন উত্তরোত্তর প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের চরিত্র অর্জন করছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে তা পেশ করা হচ্ছে, সাড়ম্বরে তা দূরদর্শনে প্রদর্শিত হচ্ছে, আর আমাদের অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তা তাৎপর্য হারাচ্ছে একটানা। বাজেটের ব্যাপারে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় হল মূল্যস্ফীতি। সেটা দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।

AMARBOI.COM

বাজেট ও মূল্যস্ফীতি

বাজেট আর মূল্যস্ফীতির দ্বিমুখী সম্পর্ক। অতীতের মূল্যস্ফীতি এ বছরের বাজেট প্রস্তাবগুলির তাৎপর্যকে প্রভাবিত করে আবার এ বছরের বাজেট প্রভাবিত করে ভবিষ্যতের মূল্যস্ফীতির হারকে। প্রথম সম্পর্কটা প্রথমে ধরা যাক।

তৃতীয় বিশ্বের মাপকাঠিতে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে মূল্যস্ফীতির গড় হার সত্যিই লক্ষণীয় রকম নিচু থেকেছে। সেটা প্রশংসার বিষয় হলেও তার একটা কুফল হয়েছে এই যে আমরা মূল্যস্ফীতির ঘাঁতঘোঁত কিছুই শিখিনি। এরই ফলে আমরা নতুন করকে বিচার করি নিছক আর্থিক অঙ্কে—সেদিক দিয়ে লাভবান হয়েছি মনে হলেই পরম আহ্লাদিত হই, যদিও প্রকৃত অর্থে হয়তো আমাদের লোকসানই হয়েছে। এ বছরের বাজেটে বহু-বিজ্ঞাপিত শতকরা ৫ ভাগ আয়কর হ্রাসের কথাই ধরুন। তিন রকম আয়ের উপর মোট দেয় করের হিসাবে এর যা মানে দাঁড়ায় তা নিচের সারণিতে দেওয়া হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার্ষিক আয়	বর্তমান হারে প্রদেয় আয়কর (অতিরিক্ত করসহ)	প্রস্তাবিত হারে প্রদেয় আয়কর (অতিরিক্ত করসহ)	কর রেহাই (টাকা)
১৮০০০	৮৪৪	৬৭৫	১৬৯
২০০০০	১৪০৬	১১২৫	২৮১
২২০০০	২০৮১	১৬৮৮	৩৯৩

এই কর রেহাইগুলির কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে, অথচ মূল্যস্ফীতির প্রভাব সংশোধন করলেই চিত্রটা বদলে যায় একেবারে। কর রেহাইয়ের পরিমাণ শুধু কমে না, ঋণাত্মক হয়ে যায়। ধরুন, গত বছর কারো আয় ছিল ২০,০০০ টাকা এবং মূল্যস্ফীতির সঙ্গে এক তালে সে আয় বৃদ্ধি পায়। গত বছর মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা দশের কিছু বেশি, কিন্তু হিসেবের সুবিধার খাতিরে দশই ধরা যাক। এ বছর তাহলে তাঁর আয় দাঁড়াবে ২২,০০০ টাকা। গত বছর তিনি কর দিয়েছেন ১৪০৬ টাকা, এ বছর দেবেন ১৬৮৮ টাকা। অথচ করের পরিমাণটাও যদি মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ত তাহলে এ বছর তিনি কর দিতেন ১৪০৬ + ১৪০·৬ = ১৫৪৬·৬ টাকা। সুতরাং আসলে তিনি বাড়তি কর দিচ্ছেন প্রায় (১৬৮৮ - ১৫৪৭) = ১৪১ টাকার মতো। অর্থাৎ ২৮১ টাকা কর রেহাইয়ের বদলে বরং তাঁকে বইতে হচ্ছে বাড়তি করের বোঝা।

অবশ্য তাঁর মাইনে যদি মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও ২০,০০০ টাকাতেই বাঁধা থাকে তাহলে তাঁর লোকসান হবে আরো বেশি। প্রকৃত অর্থে তাঁর আয় দাঁড়াবে ১৮০০০ টাকার মতো—যার উপর আগে তাঁকে কর দিতে হত ৮৪৪ টাকা, এখন দিতে হবে ১১২৫ টাকা। খুব সহজেই দেখানো যায় যে শতকরা ৫ ভাগ কর হ্রাসে লাভ হবে কেবল অতি ধনীদের। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি চলতে থাকলে এই ধরনের কর হ্রাসে কর কাঠামোর প্রগতিশীলতা (progressivity) কমে যায়। তাই কর কমানোর জন্য করের হার না নামিয়ে বরং করদায়ী পর্যায়গুলিকে (tax brackets) (করমুক্ত সীমাসহ) সরিয়ে দেওয়াই ঢের ভালো।

আরো এগোনোর আগে ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য আমার যুক্তিটা আরেক বার ঝালিয়ে নিই শতকরা ৫ ভাগ কর হ্রাস না ঘটলে করদাতাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে আরো খারাপ হত। কিন্তু তাতে এ সত্য বদলে যায় না যে এ বছর সব করদাতাকেই (অতি ধনীরা ছাড়া) গত বছরের চেয়ে বেশি কর গুনতে হচ্ছে।

এবার উল্টো প্রশ্নটি—এ বাজেটের কি প্রভাব পড়বে মূল্যস্ফীতির উপর? খুব স্পষ্ট জবাব কিন্তু মেলে না। মূল্যস্ফীতির উপর বাজেটের প্রভাব এখনও একটি বিতর্কিত বিষয়, তাই কিছু সতর্ক অনুমানের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

এ বছরের বাজেট মূল্যস্ফীতি-রোধক বলে যে ধারণাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার কারণ বোধ হয় এই যে ১৭৬২ কোটি টাকার পরিকল্পিত বাজেট-ঘাটতিটা খুব বড় নয়। কিন্তু যুক্তিটিতে অনেক ফাঁক। প্রথমত, নানা হাত-সাফাইয়ের দ্বারা বাজেটের ঘাটতি কম বা বেশি করে দেখানো যায়। নতুন deposit certificate schemeটির কথাই ধরুন—আশা করা হচ্ছে তার থেকে ৫০০ কোটি টাকা উঠবে, যা থেকে ২০০ কোটি টাকা সরকারি রাজস্বে যোগ করে দেখানো হয়েছে বাজেটে। কিন্তু সরকারি ঋণপত্র দ্বারা ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থায় প্রায় অনিবার্যভাবেই কিছু অচল অর্থ সচল হয়ে ওঠে এবং তার দরুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যস্ফীতি তীব্রতর হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

এই বাজেটে যেমন ঢালাওভাবে আবগারি শুল্কে রেহাই দেওয়া হয়েছে সেটাও চিন্তার কারণ। Khandsari চিনিকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া হয়েছে, আর শুল্ক কমানো হয়েছে কাগজ, কাগজের বোর্ড, কোনো কোনো বস্ত্র (প্রধানত পলিয়েস্টার ও সুতির মিশ্রণ ও সস্তা সুতি), এবং আরো কিছু দ্রব্যের উপর। আবগারি শুল্ক কমানোর দুই বিপরীত ফল হয় (১) যেসব দ্রব্য রেয়াত পায় সেগুলোর দর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়, এবং (২) বাজেটের ঘাটতি পূরণ কম হওয়ায় সাধারণভাবে দর চড়ার প্রবণতা বাড়ে। সাধারণ মানুষ (সংবাদমাধ্যমগুলিও) সচরাচর দ্বিতীয়টিকে উপেক্ষা করে বলেই প্রতিটি আবগারি শুল্ক হ্রাস অভিনন্দিত হয় মূল্যস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থারূপে। অথচ কিছু কিছু তথ্যে মনে হয় দ্বিতীয়টির প্রভাবই বেশি জোরালো।

এ সবের ফলেই আশঙ্কা হয়, বর্তমান বছরে আমাদের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির প্রবণতাগুলি শুধু বজায়ই থাকবে না, সম্ভবত আরো শক্তিশালী হবে।

কর ফাঁকি

গত বছরের মতো এবারের বাজেটেও কর ফাঁকি দমনের জন্য কিছু ইতিবাচক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে আমার সংশয় আছে। তাছাড়া কর ফাঁকি দমনের প্রধান উদ্যোগটা আসা উচিত সামগ্রিকভাবে সরকার ও কর-প্রশাসকদের তরফ থেকে—অর্থ মন্ত্রণালয় প্রশাসকদের কাজ সহজ করার জন্য নিয়ম বদলাতে পারে মাত্র, নিয়ম পালন বলবৎ করতে পারে না।

এ বাজেটে নতুন কর-রেহাইগুলির উপর বিরাট ভরসা রাখা হয়েছে। আশাটা হল, সেগুলো নিয়ম পালন উৎসাহিত করবে। যেমন, এ বছরের করদায়ী (assessed) আয়ের চিত্র ১৯৮৩-৮৪-র অনুরূপ থাকলে শতকরা ৫ ভাগ কর-হার হ্রাসের দরুণ ১৮০ কোটি টাকা লোকসান হওয়ার কথা, কিন্তু অর্থমন্ত্রী নিয়মপালনে উন্নতির ভরসায় লোকসান আশঙ্কা করছেন মোটে ৫৯ কোটি টাকার। আমারও বিশ্বাস লোকসানটা ১৮০ কোটি টাকার অনেক কম হবে—নিয়ম মানা বাড়বে বলে মনে হয়, মূল্যস্ফীতির গুঁতোয় লোকে উচ্চতর কর-পর্যায়ে উঠে যাবে বলে। কর কমালে নিয়মপালন বাড়ে এ বিশ্বাসের পেছনে অভিজ্ঞতার সমর্থন না থাকলেও সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে তা আমাদের বাজেট প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে আসছে।[১]

তবে নানা কারণে আয়করের চেয়ে পরোক্ষ ও যৌথ ব্যবসায়ী সংগঠনের করের উপর বেশি নির্ভর করার যৌক্তিকতা আছে বটে। উক্ত কারণগুলি প্রথাসিদ্ধ অর্থবিজ্ঞানের বহির্ভূত।

ব্যাপক কর ফাঁকির একটা কুফল এই যে তাতে সমাজে একটা অবিচারের বোধ দানা বাঁধতে থাকে। আমাদের কর-কাঠামোর তলার দিকে বেশির ভাগ বেতনজীবী মানুষ (সুকৌশলে কর ফাঁকি দিয়ে যাঁরা সেখানে পৌঁছেছেন তাঁরা বাদে) যখন দেখেন আমাদের পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের একটা বিরাট অংশকে কর দিতে হচ্ছে না তখন তাঁরা সরকার কর্তৃক প্রবঞ্চিত বোধ করেন সঙ্গত কারণেই। না-মানা আইনের চেয়ে অর্ধেক মানা আইন বেশি খারাপ—কথাটা অনেকাংশে সত্য। আয়করের আইন-কানুনগুলি সমানভাবে বলবৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। তা সম্ভব না হলে কর-ছাড়ের উচ্চসীমা অনেকখানি তুলে দিয়ে আয়কর-ব্যবস্থাটাই বহুলাংশে ছেঁটে দেওয়া উচিত।

আয়কর থেকে তুলনামূলকভাবে যে স্বল্প রাজস্ব ওঠে তার বেশির ভাগই পরোক্ষ ও corporate করের সাহায্যে তোলা যায়। পরোক্ষ কর-ব্যবস্থার পরিচালন সহজতর এবং এই মুহূর্তে তা তেমন প্রগতিশীল না হলেও উপযুক্ত সংস্কারের দ্বারা তাতে প্রগতিশীলতা নিয়ে আসা যায়। স্টার্ন সহ অনেক অর্থনীতিবিদই যুক্তি দেখিয়েছেন যে ধনীরা যেসব পণ্য উচ্চ হারে ভোগ করে সেগুলোতে কর বসিয়ে অধিকতর সমতা বিধান করা সম্ভব। নানা উপস্থিত প্রয়োজনে এই পথ পরীক্ষিত হয়েছে। যেমন বর্তমান বাজেটে অর্থমন্ত্রী গৌণ বহিঃশুল্কের 'প্রস্তাবিত বৃদ্ধি থেকে সার, কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য...ইত্যাদি অত্যাবশ্যক জিনিস' বাদ দিয়েছেন।

তবে এ-ও বোঝা দরকার যে 'যোগানের দিক' হিসাবের মধ্যে নিলে স্টার্নের এই বিশেষ যুক্তি অপ্রতুল হয়ে পড়তে পারে। ধনীদের ভোগ্য পণ্যের উৎপাদক গরিব হতে পারে, তাই তার উপর কর চাপানোটা একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রগতিশীল পদক্ষেপ না-ও হতে পারে। তবু সাধারণভাবে একথা সত্য যে বিভিন্ন পণ্যে কর বসানোর কি প্রভাব সমতার উপর পড়ছে তা হিসেব করে দেখে তদনুযায়ী আমরা সংস্কার করে নিতে পারি আমাদের পরোক্ষ করের কাঠামো।

১ দ্রষ্টব্য 'Elasticity of Non-Corporate Income Tax in India', A Bagchi ও M Govinda Rao, EPW, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ; A. Gupta এবং A. Bagchi ও Govinda Rao-এর উত্তর-প্রত্যুত্তর, EPW, ১৬ জুলাই ও ২৭ আগস্ট ১৯৮৩।

২ 'Tax Reform: Income Distribution, Government Revenue and Planning', N. Stern, Indian Economic Review ১৯৮৩, পৃ ২৭ ; এবং 'Distributional Equity, Government Revenue and Price and Tax Policies in Indi ', M. N. Murti, Institute of Economic Growth, mimeo ১৯৮৪।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সততার স্থিতিস্থাপকতা

কেন্দ্রীয় বাজেটের ব্যাপারে বেশির ভাগ লোকের মনোভাব স্থির হয়ে যায় তার বিষয়বস্তু জানার আগেই। কংগ্রেস (ই)-র এম-পি-রা ১৯৮৫-এর বাজেট সম্পর্কে বলেছেন তা 'জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে', 'প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে', ইত্যাদি। আমার ধারণা, বাজেটটা যদি একেবারেই ভিন্ন রকমের হত—যেমন যদি তা কর-হার বাড়াত, রেল ভাড়া কমাত আর উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করত—তা হলেও ঐ এম-পি-রাই বলতেন 'জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে', 'প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে', ইত্যাদি।

সমালোচকদের বেলাতেও তাই। ১৯৮৫-৮৬র কেন্দ্রীয় বাজেট স্পষ্টতই সুবিধা দানের বাজেট। নির্বাচনের আগে পেশ করা হলে সমালোচকরা তাকে আখ্যা দিতেন নির্ভেজাল প্রাক-নির্বাচন বাজেট বলে। এক্ষেত্রে বাজেট এসেছে নির্বাচনের পরে তাই সমালোচকরা পরম বিজ্ঞভাবে বলছেন এটা একটা নির্ভেজাল নির্বাচনোত্তর বাজেট।

এই ধরনের পূর্বকল্পিত ধারণার কারণেই নানা অলীক বিশ্বাস জন্ম নেয় ও টিকে থাকে। এ বছরের বাজেট থেকে আমি একটি দৃষ্টান্ত দেব। এ বাজেটের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত আয়করের সরলতা বিধান ও পরিমাণ হ্রাস। বাড়তি কর উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আটটি করদায়ী পর্যায়কে কমিয়ে চারে নামানো হয়েছে, করের বোঝা লাঘব করা হয়েছে যথেষ্ট। এ সব ব্যবস্থার কিছু শুভ ফলাফল দেখা যাওয়া উচিত (যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে কর-হার যেভাবে নামানো হয়েছে তাতে কর কাঠামোর প্রগতিশীলতা হ্রাস পাবে), কিন্তু কর হ্রাসকে এত ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত করা হচ্ছে প্রধানত এই বিশ্বাস থেকে যে তাতে কর দানের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে। অনেকে তো ধরেই নিচ্ছেন যে মোট সংগৃহীত আয়কর এমন কি বেড়েও যেতে পারে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বাজেটটির এই 'সততা-নির্ভর' দিকটাকে এমনভাবে ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে যে তা এখন প্রায় একটি স্বতঃসিদ্ধের মর্যাদা পেতে চলেছে। আমি দেখাতে চাই যে কর-হার কমালেই আইন-মানা বেড়ে যাবে এমন বিশ্বাস করার কোনো হেতু নেই। যেসব অনুমানের উপর বিশ্বাসটি দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো অতি দুর্বল।

প্রথমত, করের বোঝা কমলে করদাতারা কেন তাদের লুকোনো আয় বেশি বেশি করে কবুল করবে সেটা স্পষ্ট নয়। যারা কর ফাঁকি দিচ্ছে তারা তা করছে একটা অবিচারের বোধ বশতঃ এবং সরকার কর-হার নামিয়ে দিলেই তারা তা করা বন্ধ করবে, এটা বিশ্বাস করতে কর-চোরদের ন্যায়বোধে যতখানি আস্থা রাখতে হয় তা আমার নেই। ধরা পড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুঁকি এবং খেসারতের পরিমাণ দিয়েই বরং ঠিক হয় তারা কতটা আয় কবুল করবে। সুতরাং কর-চোর ধরার দক্ষতা এবং খেসারতের পরিমাণ বৃদ্ধিই কর ফাঁকি কমানোর পথ, করের বোঝা কমানো নয়।

কর দেওয়ার ইচ্ছা করের উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু, মোট করের উপর নয়, করের প্রান্তিক হারের উপর—ঘোষিত আয় বাড়ার সঙ্গে যে হারে দেয় কর বাড়ে তার উপর। এ বাজেটে যে নতুন কর কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে তা কিন্তু প্রান্তিক হারকে সর্বতোভাবে সঠিক দিকে নিয়ে যাচ্ছে না। যেমন কারো ঘোষিত আয় যদি ১৮০০০ টাকার বদলে ১৯০০০ টাকা হয় তাহলে পুরোনো হারে তার দেয় কর বাড়ত ২২৫ টাকা, অথচ নতুন হারে তা বাড়বে ২৫০ টাকা। এভাবে হিসেবে করলে দেখা যায়, নতুন হারে সততার মাশুল বেড়ে গেছে—অন্তত আয়ের এই সীমার মধ্যে।

তবু এগুলো না হয় ব্যতিক্রম ভেবে উপেক্ষা করা হল। ধরা যাক, কর-হার কমানোর ফলে লোকেরা সত্যিই তাদের ঘোষিত আয় বাড়িয়ে দিল। তাহলেও যে মোট সংগৃহীত কর বাড়বে এমন ভাবার কোনো হেতু নেই। প্রত্যেক দোকানদার জানে, দর কমালে তার জিনিসের চাহিদা বাড়বে, কিন্তু তাতে তার মোট আয় বাড়বে তখনই যখন এই চাহিদার বৃদ্ধিতে তার দর কমানোর লোকসান পুষিয়ে যাবে। অর্থনীতিবিদের ভাষায়, দর কমালে আয় বাড়ে কেবলমাত্র চাহিদা যদি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক হয়। অন্তত জন স্টুয়ার্ট মিল-এর সময় থেকেই এটা সুবিদিত। কর-হার ও সততার বেলাতেও ঠিক একই যুক্তি খাটে। উপরের শর্তগুলি অগ্রাহ্য করে যদি আমরা ধরেও নিই যে কর-হার কমলে সততা ও ঘোষিত আয় অনিবার্যভাবেই বাড়ে, তবু তার ফলে যে মোট সংগৃহীত কর বাড়বে এটা মানতে গেলে লাগে আরো একটি অনুমিতি—সততার স্থিতিস্থাপকতা যথেষ্ট রকম বড়।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের রাজস্বনীতি প্রভাবজোটের তোষণ

সমতা

১৯৮৫-৮৬-র কেন্দ্রীয় বাজেটে সবারই খুশি হওয়া উচিত। মোটা মাইনের এগজিকিউটিভ খুশি হবেন কারণ আয়কর ও বিত্তকর কমেছে, সম্পত্তি কর তো দিতেই হবে না। শিল্পপতি খুশি হবেন কারণ ব্যবসায়-সংস্থার কর শতকরা ৫ ভাগ কমেছে, আগামী বছরগুলিতে আরো কমবে ব'লে আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামীণ পুঁজিপতি খুশি হবেন কারণ তাঁর আয়কর মকুব চলতেই থাকবে, উপরন্তু এখন তিনি ফসলহানির জন্য বিমাও করতে পারবেন। এবং অবশেষে চারদিকে এত খুশির ছড়াছড়ি দেখেই গরিবের প্রাণ খুশিতে ভরে ওঠা উচিত ! এ বছরের বাজেটের মূল চিন্তাধারা মনে হয় তাই।

প্রথমে এর ভালো দিকগুলোর হিসেব নেওয়া যাক, তারপর খতিয়ে দেখা যাবে যত প্রশংসা তা পেয়েছে ততটা সত্যিই তার প্রাপ্য কিনা। এটা মানতেই হবে যে বছরের পর বছর মুখে সমাজতন্ত্র আর কাজে ধনতন্ত্র চালাতে চালাতে ভারত সরকারের রাজস্ব-কাঠামোটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভ্রান্তির একটা জটিল অরণ্য বিশেষ। অর্থনীতির বেশির ভাগটা রেখে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রে অথচ ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বেঁধে রাখা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ আর লাইসেন্সের শৃঙ্খলে। আপাতদৃষ্টিতে এই নিয়ন্ত্রণগুলিকে মনে হয় সমতা ও সুষম বন্টনের হাতিয়ার ব'লে। আসলে কিন্তু এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে একচেটিয়া অধিকার ও অদক্ষতা টিকিয়ে রাখার জন্য ; দেশি শিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচানোর জন্য, যাতে তা সৃষ্টিছাড়া দর হেঁকে যেতে পারে ; এবং ম্যানেজমেন্ট যাতে অধিগ্রহণের ভয়ে ভীত না হয়ে মুনাফার মোটা অংশ উপরি সুবিধার আকারে হাতিয়ে নিতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য।

শিল্পক্ষেত্রে দক্ষতা আনতে ও অসাড়তা কাটাতে এ বাজেট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিয়েছে : (১) ২৫টি শিল্পকে লাইসেন্সমুক্ত করা হবে। (২) কিছু কিছু যন্ত্র কাঁচামাল (Capital goods) ও শিল্পোৎপাদন-সামগ্রীর আমদানি উদারতর করা হচ্ছে (যেমন চর্মশিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক কমবে, কোনো কোনো কম্পুটার যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্ক শতকরা ৭৫ থেকে ২৫-এ নেমে আসবে)। (৩) কিছু কিছু দ্রব্যের রপ্তানি শুল্ক উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে (যেমন আকরিক লৌহ, আকরিক ম্যাঙ্গানিজ, কাঁচা তুলো, কোনো কোনো জাতের তৈলবীজ)। (৪) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি এখন বিক্রয়-বিজ্ঞাপনের খরচ বাড়াতে পারবে। এই খরচ যেহেতু নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্যই বেশি তাই এ ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ার অর্থ বিভিন্ন শিল্পে প্রবেশের পথ আরো সুগম করা। তাছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনায় সরকারি হস্তক্ষেপে উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশি।

কর-কাঠামো যুক্তিসঙ্গত করার যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে সেটাও বাঞ্ছনীয়। এখন থেকে শুধু চারটি আয়করদায়ী পর্যায় থাকবে। বেশ কটি ঝামেলা—যেমন রেডিও-টিভি-র লাইসেন্স, বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা (Compulsory Deposit Scheme) (যার তাৎপর্য যত না আর্থিক তদপেক্ষা হয়রানিমূলক)—চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর যুক্তিসঙ্গত করার মানেই অবশ্য কর কমানো নয়, তবু বছরের পর বছর মূল্যস্ফীতির চাপে করের বোঝা যেভাবে বেড়ে উঠেছে তাতে কর কমানোর যুক্তি একটা আছে বটে। সেদিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক (Corporate) ও ব্যক্তিগত আয়কর কমানো নিশ্চয়ই সমর্থনীয়। কিন্তু লাভকর যেভাবে কমানো হল সেটাই নৈরাশ্যজনক। উচ্চতর আয়করদায়ী পর্যায়গুলিতে যারা আছে সুবিধাটা হবে তাদেরই বেশি। অর্থাৎ আয়কর কমানোর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রগতিশীলতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে—সেটাই দুঃখজনক।

বিত্তকরের বিপুল হ্রাস (সর্বোচ্চ প্রান্তিক হার শতকরা ৫ থেকে ২-এ নেমেছে) এবং সম্পত্তি-করের সম্পূর্ণ বিলোপের দিকে তাকালে বাজেটের এই ওপর-ঘেঁষা চরিত্র আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। সম্পত্তি-কর বিলোপের একটি সরকারি কারণ দেখানো হয়েছে—তাতে অর্থ সংগ্রহ হয় খুবই সামান্য, ২০ কোটি টাকার মতো। কৈফিয়ৎটা প্রথম দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত ঠেকলেও শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না। ইচ্ছা করলে তো যে কোনো কর বা রাজস্বকেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে ভাগ করে দেখানো যায়—যেমন আবগারি শুল্কের কথা না বলে আমরা 'ক' দ্রব্যের আবগারি শুল্ক 'খ' দ্রব্যের আবগারি শুল্ক এইভাবে কথা বলতে পারি—সেক্ষেত্রে প্রতিটি খাতে আহরিত রাজস্ব কমে যাবে এবং উপরের যুক্তির গুণে তার ফলে শেষ পর্যন্ত তাবৎ করেরই অবলুপ্তি ঘটবে! তাছাড়া সম্পত্তি করের উদ্দেশ্য নিছক রাজস্ব সংগ্রহ নয়, সমতা বিধানও বটে—মানুষের জীবনের প্রারম্ভিক বৈষম্য কিছুটা লাঘব করা। বিত্ত করের বেলাতেও একই কথা। মূল্যস্ফীতির কারণে তা কমানো যদিও উচিতই হয়েছে, কমানোর পরিমাণটা সমর্থন করা কঠিন। মূলধন বৃদ্ধি করের (Capital gain tax) সঙ্গতিবিধান আবশ্যক ছিল—পর্যাপ্ত সামঞ্জস্যতা না থাকায় সত্যিকারের মূলধন বৃদ্ধি না ঘটলেও তা মূল্যস্ফীতির দরুন লোককে কর দিতে বাধ্য করে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, প্রত্যক্ষ কর দিতে হয় শুধু ধনীদের (ভারতের ৩৫ কোটি উপার্জনকারীর মধ্যে মোটে ৪০ লক্ষ কর দেয়), অতএব এই কর কমালে ধনীদের লাভ হলেও গরিবের ক্ষতি হয় না কিছু। অর্থাৎ কিনা অর্থমন্ত্রী বাস্তবে ধরে ফেলেছেন আমাদের পাঠ্যপুস্তকের সেই অধরা মাধুরীকে, যার নাম 'পারেতো উন্নতি'। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তার সম্ভাবনা কম। গরিবদের এইসব কর-রেহাইয়ের মাশুল নিশ্চয়ই শুনতে হবে জিনিসপত্রের চড়া দামের অঙ্কে।

দাম

মূল্যস্ফীতি আজও একটা বেশ প্রহেলিকাময় বিষয়, তাই এ সম্পর্কে খুব সুনিশ্চিত আকারে মন্তব্য করা কঠিন। তবু এ বছরের রাজস্ব নীতি থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যস্ফীতির উদ্ভব হবে বলেই মনে হয়। প্রত্যক্ষ মূল্যস্ফীতির কারণ হবে মাল ও যাত্রীর রেলভাড়া এবং পেট্রোলিয়ম ও পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্যাদির দামের বিপুল বৃদ্ধি। এর প্রভাব ঢেউয়ের আকারে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য, ফলে এমন অনেক পণ্যেরও দাম বাড়বে যেগুলোর উৎপাদনে পরিবহন বা পেট্রোলিয়মের কোনো ভূমিকা নেই। সাধারণ লোকে প্রত্যক্ষ মূল্যবৃদ্ধি নিয়েই বেশি চিন্তিত হলেও অনেক বেশি বিপজ্জনক হল পরোক্ষ মূল্যস্ফীতি—যার উৎস হবে বাজেটে ৩৩৪৯ কোটি টাকার বিশাল ঘাটতি। তার সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ৫১০০ টাকার পরিকল্পিত সরকারি ঋণগ্রহণ যোগ করলে মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা খুবই প্রবল হয়ে ওঠে।

অনেকেই বলেছেন যে বাজেটে বড় রকমের ঘাটতি সবসময় মূল্যস্ফীতির জন্ম দেয় না। সেটা অবশ্য সত্য। এমন বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেখানো যায় যাতে বড় ঘাটতি সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি দেখা যায়নি। কিন্তু ঘাটতি মূল্যস্ফীতির পর্যাপ্ত কারণ নয় মানে এই নয় যে তা কোনো কারণই নয়। অর্থনীতিতে—যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে—পর্যাপ্ত কারণ খুব কমই আছে। একই ডোবার জল ব্যবহার করে কারো কলেরা হয়েছে, কারো হয়নি, এমন উদাহরণ প্রচুর। তা থেকে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে কলেরা ওভাবে ছড়ায় না তা নিশ্চয় ভুল হবে। গ্রামবাসীরা প্রায়ই এমন ভুল সিদ্ধান্তের চরম খেসারৎ দিয়ে থাকেন।

বাজেটে বড় ঘাটতি থাকলেই তাতে মূল্যস্ফীতি হয় না, আরো নানা কারণের সহযোগিতা লাগে। এই কারণ সমবায় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সুনিশ্চিত নয়, তবু কিছু কিছু বিষয় আমরা জানি বটে। যেমন পর পর কয়েক বছর নগদ ভাণ্ডার গড়ে ওঠার (liquidity) মাত্রা বেশি থাকলে তাতে একটা মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা গড়ে ওঠে—তখন ফসল হানি বা অনুরূপ যে কোনো কারণেই এক-দমকা দর-বাড়ার পরিবর্তে শুরু হয়ে যায় ব্যাপক মূল্যস্ফীতি। দ্বিতীয়ত এ-ও বোধ হয় সত্য যে গড়পড়তা বিচারে পণ্য করের চেয়ে ঘাটতিই বেশি মূল্যস্ফীতিকর। এর অর্থ এই যে, সরকারের সামনে ধরুন দুটো পথ খোলা আছে—(ক) একশো টাকার ঘাটতি রাখা, কিংবা (খ) পণ্য করের দ্বারা ঐ একশো টাকার ঘাটতি পূরণ করে ফেলা। (খ) পথে তৎক্ষণাৎ দাম বাড়বে, (ক) পথে দাম পূর্ববর্ণিত উপায়ে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হবে। কিছু কিছু econometric অর্থনৈতিক আয়ের গবেষণা থেকে মনে হয়—এবং তার চেয়েও বড় কথা, এটাই যুক্তিগ্রাহ্য যে—দামের দীর্ঘকালীন দরবৃদ্ধি (ক) পথেই বেশি হবে। সুতরাং মনে হয় বাজেটের রেকর্ড ঘাটতি, উল্লেখযোগ্য সরকারি ঋণ এবং পেট্রোলিয়ম ও মালবহন ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধির মিলিত ফল হবে ব্যাপক ও বেশ মোটা রকমের মূল্যবৃদ্ধি।

পরিকল্পনা

মূল্যস্ফীতির চাপ গরিবদের উপরই বিশেষভাবে পড়বে কারণ বাজেটে দারিদ্র্য লাঘব কর্মসূচীর জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে খুবই কম। যেমন, জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচীতে (National Rural Employment Programme) ব্যয় হবে গত বছরেরই সমপরিমাণ ২৩০ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য লাঘব ও গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচীগুলিতে মোট ব্যয় ১৯৮৪-৮৫-র চেয়ে কিছু কমই হবে। কোনো কোনো ধরনের ব্যয় অন্তর্নিহিত কতগুলো কারণে দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে, কিন্তু দারিদ্র্য-নিবারণী কর্মসূচীর ব্যয় সে রকম নয়। ফলে মূল্যস্ফীতির প্রতিটি ধাক্কায় এই শেষোক্ত ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ কমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। অর্থাৎ নীতির বিচারে যে ব্যয় আরো অনেক বাড়া উচিত তা-ই কমবে। এর সঙ্গে শহুরে ধনীদের জন্য বিপুল সুবিধাদি যুক্ত হয়ে বাজেটটিকে করে তুলেছে অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক।

এই কর্মসূচীগুলি ছাড়াও আরো নানা দিক থেকেই এ বাজেট 'সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিশার' (Approach to the Seventh Five Year Plan) সরাসরি পরিপন্থী। ব্যাপারটা আরো বিভ্রান্তিকর কারণ উক্ত পরিকল্পনাকালের জন্য এটাই প্রথম বাজেট। প্রথমত, এ বাজেটে পরিকল্পিত ব্যয় কম; ১৯৮৪-৮৫-র থেকে মাত্র শতকরা ৬·৫ ভাগ বেশি, এবং তার অর্থ নিতান্ত গতানুগতিক মূল্যস্ফীতিতেই এ ব্যয় প্রকৃত বিচারে গত বারের নিচে নেমে যাবে।

তারপর দেখুন নিয়োগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিবারণের জন্য সংস্থান কত কম। এর স্বপক্ষে একটি যুক্তি এই হতে পারে যে এ বছরের বাজেট প্রবৃদ্ধির সহায়তা করবে (সে কথা আমিও বিশ্বাস করি) এবং তার কিছু সুফলদায়ী প্রভাব (যাকে বলা হয় trickle-down effect) দেখা দেবে। এ তত্ত্বের যাথার্থ্য সন্দেহজনক, তবু হতে পারে যে বাজেটের প্রণেতারা তা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেন। তবে কৌতূহলের বিষয় এটাই যে তা 'ভূমিকা'য় ঘোষিত লক্ষ্যের বিরোধী 'নিয়োগ এবং দারিদ্র্য লাঘব তীক্ষ্ণতর অভিনিবেশ দাবি করে...। নিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর জন্য সাধারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে...নিয়োগকে সরাসরি নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে দেখতে হবে।' (পৃ ১)

দারিদ্র্য নিবারণ ও নিয়োগবৃদ্ধি কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দের পরিমাণ সম্পর্কে সপ্তম পরিকল্পনার 'ভূমিকা'য় বলা আছে : 'ষষ্ঠ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১৯৯৪-৯৫-এর মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিম্নবর্তী জনসংখ্যাকে শতকরা দশের তলায় নামিয়ে আনা...। এ লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে দরিদ্র মানুষের স্বনিয়োগ ও মজুরি-নিয়োগ সম্প্রসারণের কর্মসূচীগুলিতে লগ্নির পরিমাণ বাড়াতে হবে।' (পৃ ৫)

যেহেতু আগামী কয়েক বছরে আমাদের ঋণ পরিশোধের (বিশেষত IMFএর ঋণ পরিশোধের) ভার বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে, আমাদের বাণিজ্য নীতি আরো উদার হবে এবং যেহেতু আমাদের বিনিময় হার কার্যত বাঁধা, তাই আগামী কয়েক বছরে আমাদের বৈদেশিক অর্থের প্রয়োজনও বাড়বে। অধিকন্তু এ বছরের বাজেটে এতাবৎ কালের সর্বোচ্চ ঘাটতি ধরা হয়েছে। এ সবের দ্বারা বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 'ভূমিকা'র উপদেশ '[রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে] ব্যয়নির্বাহের প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলি (resources) এমনভাবে সংগ্রহ করতে হবে যাতে বাহ্যিক উৎসগুলির উপর এবং মূল্যস্ফীতিজনক ঘাটতি বাজেটের উপর নির্ভরতা সর্বনিম্ন মাত্রায় নেমে আসতে পারে।' (পৃ ৩) ইত্যাকার অসংগতিগুলির একটা ব্যাখ্যা বোধহয় এই যে আমাদের অর্থনীতি মিশ্র—পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক, বাজেটে ধনতান্ত্রিক।

প্রভাবজোট (Lobbies)

বাজেট প্রণয়ন বহুলাংশে শক্তিশালী প্রভাবজোট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদারতর বাণিজ্যনীতির এটাই প্রধান অন্তরায়। মনে করুন, কোনো পরিভোগ্য দ্রব্যের আমদানি উদারতর করলে প্রত্যেক পরিভোক্তা কিঞ্চিৎ লাভবান হলেও কয়েকজন উৎপাদক দাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমাতে বাধ্য হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। পরিভোক্তারা অসংগঠিত, জোটবদ্ধ নন ; উৎপাদকরা সংখ্যায় অল্প, বেশি সংগঠিত। তাই শেষোক্তরা জোট বেঁধে এই উদারনীতির বিরুদ্ধে নামবেন। অতএব উদারতর আমদানি নীতি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশীয় উৎপাদকের ব্যবহার্য মূলধনী দ্রব্যে প্রযুক্ত হয়েছে এতে আশ্চর্যের কি আছে। জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচীকে প্রকৃত অঙ্কে সংকুচিত করার সপক্ষে একটি কারণ এই দেখানো হচ্ছে যে কর্মসূচীটা ঠিকমতো চলছে না এবং তাতে তহবিল তছরুপ হচ্ছে। অতএব সেই সব সমস্যার প্রতিকার করার বদলে বরাদ্দ কমিয়ে বাজেট তছরুপকারী শক্তিগুলির কাছেই নতিস্বীকার করল। তাছাড়া কোনো বিশেষ কর্মসূচী নিয়ে অসুবিধা দেখা দিলে আমাদের উচিত গরিবদের ভর্তুকি দান ও কর্মসংস্থানের বিকল্প পথ অন্বেষণ করা—এইসব অসুবিধার ওজর তুলে টাকাপয়সা ধনীদের দিকে পাচার করে দেওয়া নয়।

এটা আরো দুঃখজনক কারণ, অতীতের সরকারগুলির তুলনায় সরকারকে এ দুর্নীতি দমনে আন্তরিক বলেই মনে হয়, ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রথম ক-মাসে কিছু প্রশংসনীয় ব্যবস্থাও এ সরকার নিয়েছে। অথচ তার প্রথম বাজেটের রাজস্বনীতি ভীরু, শক্তিশালী শহুরে প্রভাবজোটগুলির তোষণকারী। উচ্চবর্গীয় চাপের কাছে নতিস্বীকারের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল বিত্ত কর ও সম্পত্তি-শুল্কের বিরাট অবনতি। আয়কর নাকি কমানো হয়েছে কালো টাকার দাপট কমানোর জন্য। নিচু কর-হারের ফলে কর প্রদান বাড়ে, এমন ধারণার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। নিছক সংজ্ঞাগত অর্থে ছাড়া। অর্থাৎ কিনা, কারো অঘোষিত আয় একই থাকলেও দেয় করের পরিমাণ কমলে সেই সুবাদেই তার কালো টাকাও খানিকটা কমে।

আইন মানাকে উৎসাহিত করার পথ দুটো (১) পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করা, এবং (২) আইনের রদবদল করে যা চলছে তা-ই মেনে নেওয়া। কোনো কোনো অবস্থায় দ্বিতীয় পথটি কাজে লাগে বটে কিন্তু ওটার উপর এই বাজেটের মতো বেশি নির্ভর করতে গেলে অবস্থাটা দাঁড়ায় Saint-Exupery-র Little Prince-এ রাজার হুকুমের (দশম অধ্যায়) মতো

'বসতে পারি ?'—ভীরু জিজ্ঞাসা খুদে রাজপুত্রের।

'আমি হুকুম করছি বসতে', জবাব দিলেন রাজা...

খুদে রাজপুত্র বলল, 'মহারাজ অভয় দিলে একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করতে চাই...

রাজা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করতে হুকুম করছি।'

খুদে রাজপুত্র যখন বলল তিনি হুকুম করে সূর্যাস্ত ঘটিয়ে তার ক্ষমতা দেখান, তখন রাজা জবাব দিলেন তা তিনি দেখাবেন, তবে সব কিছুরই একটা উপযুক্ত সময় আছে। একটা মোটাসোটা পঞ্জিকা ঘেঁটে তিনি বললেন, 'সেটা হবে এই—এই ধর—আজ সন্ধ্যায়, আটটা বাজতে-কুড়ি নাগাদ। তখন দেখবে কেমন তামিল হয় আমার হুকুম !'

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অর্থনীতি ও বাজেট

আরো একটা বাজেট পেশ করা হয়েছে, আরো একবার 'সাধারণ মানুষ লাভবান হয়েছে'—যেমন গত চল্লিশ বছর যাবৎ প্রত্যেক বারই এমন সময় হয়ে আসছে। 'গণমুখী' বাজেটের এমন বাৎসরিক আবির্ভাব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ যে কিভাবে সাধারণ থাকতে পারছে সেটাই একটা ধাঁধা।

আরো একবার দূরদর্শনে দেখানো হল কেন্দ্রীয় বাজেটের বিষয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দীপ্ত প্রতিক্রিয়া।

সরকারের এই বাজেট-কসরতের ব্যাপারে বেশির ভাগ লোকের বেলাতেই যেটা সত্য তা হল একটা ঔদাসীন্যের ভাব। তা একেবারে অযৌক্তিকও নয়, কারণ বাজেট উত্তরোত্তর সত্যিই একটা নিছক প্রচারমাধ্যমের বিষয় হয়ে উঠেছে, অর্থনীতির উপর তার সত্যকার প্রভাব দেখানো হচ্ছে বড় বেশি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। সেটা আরো এইজন্য যে, অপেক্ষাকৃত অপ্রীতিকর রাজস্বনীতিগুলি ইদানীং চালু হচ্ছে বাজেট অধিবেশনের অনেক আগেই, বাজেট অধিবেশনে কেবল ঘোষিত হয় লোক-ভোলানো ব্যবস্থাগুলি।

কয়লার দাম শতকরা ১৫ ভাগ বাড়ানো হল ২৩ ডিসেম্বর, ইস্পাতের দাম শতকরা ১৫·৬ ভাগ বাড়ানো হল ২৪ ডিসেম্বর, ৯ জানুয়ারি পেট্রলের দাম বাড়ানো হল প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ, এছাড়াও ছিল হরেক রকমের মূল্য বৃদ্ধি। ফলে ২৯ ফেব্রুয়ারি ক্যামেরার ঝলকের মধ্যে অর্থমন্ত্রী যা পেশ করলেন তা যে নানা রেয়াতের একটি মনোরম ফিরিস্তি হবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে।

সুতরাং বাজেটের দুয়েক বছর আগে থেকে অর্থনীতিতে কি চলছিল সেটা দেখা-ই বোধ হয় বেশি লাভজনক হবে। ১৯৮৭-৮৮র 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা' (Econ. Survey) প্রকাশের দৌলতে আমরা এখন আরো সুব্যবস্থিতভাবে আমাদের কাজকর্ম বিচার করতে পারি, অনুমান করতে পারি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করার আগে বলে রাখি, আমার মতে বার্ষিক 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা' শুধু আমাদের সরকারের নয়, যে কোনো সরকারেরই শ্রেষ্ঠ দলিলগুলির অন্যতম। বোধ করি জন-মনোযোগ তুলনামূলকভাবে কম পায় বলেই তা বেশ অনুচ্চ কণ্ঠ, সুলিখিত এবং সস্তা কাগজে ছাপা। তিনটিই সরকারি দলিলের বড় গুণ।

'সমীক্ষা'র মূল তথ্যগুলির সহজেই সারসংক্ষেপ করা যায়। ১৯৮৭-৮৮-তে আমাদের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১ থেকে ২-এর মধ্যে, কৃষির ফলন কমেছে শতকরা প্রায় ৮·৫ ভাগ, শিল্পোৎপাদন বেড়েছে শতকরা ১০-এর বেশি। সত্তরের দশকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ দিকে যখন মনে হচ্ছিল আমরা 'টেক-অফ'-এর জন্য তৈরি তখন মৌলকাঠামোই আমাদের অর্থনীতিকে পেছন টেনে রেখেছিল। এখন কিন্তু মৌলকাঠামোর উন্নতি ভালোই চলছে। এমন কি বিদ্যুতের বেলাতেও কথাটা সত্য—খরার দরুন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পড়ে গেলেও তা পুষিয়ে গেছে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট বৃদ্ধিতে। দর বেড়েছে শতকরা ৯·৮ ভাগ, টাকার যোগান (M3) শতকরা ১৪·৫ ভাগ।

তবে এই সংখ্যাগুলি একটু সতর্কতার সঙ্গে ব্যাখা করা প্রয়োজন। প্রথমত, 'সমীক্ষা'য় পরিষ্কার বলা আছে যে দর ও টাকার যোগানের সংখ্যা দুটি হল ১৯৮৭-৮৮-র প্রথম দশ মাসের। অতএব বার্ষিক হারে রূপান্তরিত করলে মুদ্রাস্ফীতির ১১·৮ এবং M3-র বৃদ্ধি শতকরা ১৭·৪।

আমার মতে, মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান যদি বৎসরের একাংশের জন্য পাওয়া যায় তবু সরকারি দলিলে তা বার্ষিক হারের আকারেই দেওয়া উচিত। নচেৎ যে বিভ্রান্তি হতে পারে তার দৃষ্টান্ত ২৯ ফেব্রুয়ারিতে দূরদর্শন বিভিন্ন মন্তব্যে দেখা গিয়েছিল—লোকে ধরে নিয়েছে আমাদের মুদ্রাস্ফীতির হার শতকরা ৯·৮, শতকরা ১১·৮ নয়। অথচ গত ছ মাসের দামের প্রবণতার বিচারে মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়ায় আরো বেশি, শতকরা ১৩·২ ভাগ।

এর সঙ্গে যুক্ত হবে ১৯৮৮-৮৯-র জন্য অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত বিশাল ঘাটতির ধাক্কা। আসল ঘাটতি শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিত ঘাটতিকে সাধারণত অনেকখানি ছাড়িয়ে যায় (গত বছরটা ছিল ব্যতিক্রম)। অতএব ১৯৮৮-৮৯-র ঘাটতি সম্ভবত হয়ে দাঁড়াবে সর্বোচ্চ ঘাটতিগুলির অন্যতম।

দ্বিতীয়ত, অনেক সরকারি সূত্রেরই এ নিয়ে আহ্লাদের সীমা নেই যে খরার বছরেও আমাদের প্রবৃদ্ধি-হার ইতিবাচক থেকেছে ('সমীক্ষা'য় অবশ্য এ দোষ নেই)। ইতিবাচকতার এমন কি তাৎপর্য বোঝা কঠিন। আর তাৎপর্য যদি খুঁজতেই হয় তাহলে মোট আয়ের বদলে বরং মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করাটাই (যেমন করা হয়েছে বিশ্বব্যাঙ্কের World Development Report-এ) বেশি যুক্তিযুক্ত। 'সমীক্ষা'র পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় যে মাথাপিছু বৃদ্ধি নেতিবাচক ছিল— -১·০-র কাছাকাছি।

এ নিয়ে লুকোছাপার কোনো কারণই নেই। বছরটা ছিল নিদারুণ খরার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রবৃদ্ধি খুব একটা খারাপও হয়নি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও রয়েছে সাফল্যের প্রমাণ।

১৯৮৭-র এপ্রিল-ডিসেম্বর সময়কালকে ১৯৮৬-র এপ্রিল-ডিসেম্বরের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় আমাদের রপ্তানি শুধু আমদানির থেকে দ্রুত হারে বেড়েছে তা-ই নয়, তা বেড়েছে শতকরা ২৪·৭ হারে। এটা নিছক বিনিময় হারের পরিবর্তনের প্রতিফলনই নয়, সব পরিসংখ্যান ডলারে রূপান্তরিত করে নিলেও বৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ২২। তা-ও রীতিমতো উল্লেখযোগ্য।

অর্থনীতির কাঠামোও বেশ পোক্ত (অংশত আমাদের প্রথম দিককার পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের দৌলতে), সামনে রয়েছে বেশ ভালো প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা—যদিও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তা ভেস্তে যেতে পারে।

ভারতের ব্যর্থতা সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য-উচ্ছেদক ও মৌল প্রয়োজনপূরক কর্মসূচীগুলিতে। এবং তা সংশোধনেরও বিশেষ চেষ্টা নেই। অনপক্ষে বিচারে পরিসংখ্যানগুলি হয়তো নেহাৎ খারাপ দেখায় না, তাই বাজেট বক্তৃতায় সেগুলো সাড়ম্বরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞাপিতও হয়েছে অনেক অর্থনীতিবিদও বলে থাকেন, **একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে** নাকি প্রত্যক্ষ প্রয়াস এর চেয়ে বেশি নেওয়া সম্ভবপর নয়।

অন্যান্য দেশের দিকে তাকালেই কিন্তু এ যুক্তি ধ্বসে পড়ে। ১৯৮৫ সালে ভারতে মোট সরকারি ব্যয়ের শতকরা ৪·৫ ভাগ গিয়েছিল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে, শ্রীলংকায় গিয়েছিল শতকরা ১০ ভাগ আর কোস্তা রিকা-য় (আরেকটি দেশ যেখানে জীবনযাপনের মান ভালোই রেড়েছে) বিস্ময়কর ৪১·৯ ভাগ। ওজর উঠতে পারে এই দুই দেশের কোনোটারই ভারতের মতো বিশাল সামরিক ব্যয় নেই—যা একটা দেশের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপার, অর্থনীতির সীমা-বহির্ভূত। তাহলে দক্ষিণ কোরিয়ার দৃষ্টান্ত নিন—মোট সরকারি ব্যয়ের ১৯·৮ ভাগ সে ঢালে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে এবং ৩০ ভাগ সামরিক খাতে, যেখানে ভারতের সামরিক ব্যয় শতকরা ১৯ ভাগ।

মৌল প্রয়োজন পূরক (basic needs) কর্মসূচী ও জন-বন্টন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সুফল প্রভূত। এ বিশ্বাস ব্যাপক যে অন্যান্য বারের চেয়ে এবার আমরা খরার মোকাবেলা ভালোভাবে করতে পেরেছি বৃহত্তর খাদ্য মজুতের কারণে। আমার কিন্তু সেটা পুরো কারণ বলে মনে হয় না। খাদ্য তো আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কিনেও নেওয়া যায়, আগের খরাগুলিতে তা আমরা করেছিও। এবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন গ্রামীণ নিয়োগ বর্ধক ও আনুষঙ্গিক কর্মসূচী-সমূহের শাখাজাল, যা সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকেই গড়ে উঠছে। এরই ফলে মজুত খাদ্য সরকার যেখানে প্রয়োজন পৌঁছে দিতে পেরেছে। বিলিব্যবস্থার গুরুত্ব এক্ষেত্রে অপরিসীম।

উপসংহারে বলা যায়, গত বছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ভালো না হলেও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা আশাপ্রদ। কিন্তু সমতা বিধান ও দারিদ্র্য উচ্ছেদের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা শোচনীয়, সত্তরের দশকের পর থেকে কিছু মৌলকাঠামোগত উন্নতি সত্ত্বেও তেমন কোনো উজ্জ্বল সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। মূল্যস্ফীতি মনে হয় তীব্রতর হবে, চলবেও কিছু কাল। ঘাটতি এবং মূল্যস্ফীতির উপর তার প্রভাবে মধ্যে খানিকটা কাল ব্যবধান থাকতে পারে, কিন্তু প্রভাব একটা পড়বে বলেই নিশ্চয় ধরে নেওয়া যায়। যেহেতু সরকার জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি খোয়ায় মূল্যস্ফীতির কারণে, এবং এ বছরের বাজেটে যদি সরকারের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরিকল্পনার ইঙ্গিত থেকে থাকে তাহলে সরকারকে আমার পরামর্শ হবে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন ওটা।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্লান ভোল্টেজের শহর

নদীর ওপারে কালিঝুলিমাখা কারখানাগুলি নীরবে কালো ধোঁয়া উগরে চলেছে। বোটানিকাল গার্ডেনের দিককার পাড়ে হুগলি নদীর কদমাক্ত জলের ছলাৎ-ছলাৎ ছাড়া শব্দ নেই, এখান থেকে শহরটাকে মনে হয় এক রহস্যময় শিল্প-পুরীর চিত্র বলে। অথচ খিদিরপুর ডকের ক্রেন-মাস্তুলের কিউবিজমের ওপারে কলকাতা কর্মচঞ্চল। গর্তভরা রাস্তায় গাড়ির হট্টগোল। শহরের যা প্রধান আশা সেই মেট্রোর কাজ চলছে, বহু বৎসর যাবৎ যেমন চলে আসছে। চৌরঙ্গির মোড়ে ঘর্মাক্ত কনস্টেবল ক্লান্তভাবে হাত নাড়ছে আর নড়ে উঠছে গাড়ির চারটি স্রোত একই সঙ্গে।

সন্ধ্যা নামে। ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বসে, দোকানদাররা সন্ধ্যায় ভিড় সামলানোর জন্য তৈরি হয়। ঠিক তক্ষুনি নিভে যায় আলো। লোডশেডিং শুরু হল, ম্লান ভোল্টেজের বিদ্যুৎ ফিরতে চার থেকে আট ঘন্টা। CESC-র নতুন টিটাগড় ইউনিটেও কোনো বিশেষ হেরফের হল না। কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো দিন লোডশেডিং-এর মেয়াদ গিয়ে ঠেকে বারো ঘন্টায়। কেউ নালিশ করে না জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে এসব। বস্তিতে মোম জ্বলে ওঠে, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে হ্যারিকেন, ফ্যাশনদুরস্ত দক্ষিণ কলকাতায় গুঞ্জনরত জেনারেটর আর ইনভার্টার ধনীদের জুগিয়ে চলে বিদ্যুৎ।

এমন উষ্ণ ও প্রাণবন্ত একটা শহরের বিদ্যুৎ সংকটে এমন মুহ্যমান অবস্থা বড় মর্মান্তিক। ফ্যান নেই, গুমোট অসহ্য—এ বছর (১৯৮৩) বর্ষা আবার এল দেরি করে। (কলকাতায় যে তিন সপ্তাহ ছিলাম সেই সারাটা সময় জুড়েই আবহাওয়া অফিস অবিচল রইল তার পূর্বাভাসে—বর্ষা আসতে আর মোটে এক সপ্তাহ।) খবরের কাগজে উৎপাদন-হানি আর পুঁজি-পলায়ন নিয়ে লেখালেখি চলে। ব্যাপারটা সত্যি দুশ্চিন্তাকর। অতি সম্প্রতি দুটি কোম্পানি—অ্যাব্রেসিভস অ্যান্ড কাস্টিংস লিমিটেড এবং কনোরিয়া ওভারসিজ লিমিটেড—পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুজরাটে ঠাঁই বদল করতে চেয়েছে এবং বিদ্যুতের ঘাটতিকেই বিশেষভাবে দর্শিয়েছে কারণ হিসাবে।

এ সবই সত্য। তবুও কিন্তু আমার মনে হয়, এই একটানা বিদ্যুৎ-অনটন কলকাতার শিক্ষা সংস্কৃতির জীবনকে যেভাবে ক্ষয় করে দিচ্ছে সেটা আরো বেশি দুশ্চিন্তাকর। আমাদের শোনানো হয়, প্রকৃত উৎকর্ষ নাকি সব বাধা ভেদ করেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা অবশ্য নেই। কেউ কেউ অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় ভেঙে পড়ে না ঠিকই। কিন্তু বিপুল অধিকাংশের ক্ষতি হতে থাকে অল্প অল্প করে—প্রতি দিন একটু কম কাজ, প্রতি রাত্রে একটু কম ঘুম। বন্যা বা দুর্ভিক্ষের মতো আকস্মিক দুর্বিপাক নয় বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ তা লক্ষ্য করে না, কিন্তু ক্ষতি শেষ পর্যন্ত দৃশ্যমান হতে বাধ্য। আগামী নুয়েক দশকে ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতিতে কলকাতার অবদান কমবেই।

বিদ্যুৎ সংকটের আরেকটা দুঃখজনক দিক হল, তা শহরের আয়ের অসম বন্টনকে আরো দুঃসহ করে তুলেছে। ধনীরা তাদের বিশেষ বিদ্যুতের জোগান আর ঝি-চাকরের দলবলের জোরে বেশি সহজে এই সব বিপত্তির মোকাবেলা করতে পারে। তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় তেমন ক্ষতি হয় না, এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মে ধনী-দরিদ্রের ফারাক বাড়বে, অবনতি হবে সমাজজীবনের।

নিরাময় কিসে তা আমি জানি না (যদিও স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে কেন বিদ্যুৎ-রেশন চালু করা হল না, বুঝি না), জানলেও তা এত ছোট প্রবন্ধে বলা যেত না। তবে একটা কথা জানি—গড়পড়তা রাজনীতিবিদ বা কলকাতাবাসী যা ভাবেন সমস্যা তদপেক্ষা অনেক গুরুতর। লাভ-লোকসানের খাতায় সামাজিক ক্ষতির হিসাব থাকে না, তাই তা সহজে আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এই একটানা অর্থনৈতিক সংকট কি নিদারুণ ক্ষতি করছে কলকাতার। আশু সমস্যা মিটে যাওয়ার বহুকাল পরেও ক্ষতচিহ্ন মিলাবে না।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার মেট্রো

কথা ছিল, কলকাতার চির নির্মীয়মাণ মেট্রো তথা প্রথম ভূগর্ভস্থ পরিবহন-ব্যবস্থা প্রথম ট্রেন চালানো শুরু করবে একটি চার-কিলোমিটার পথে ১ জুলাই থেকে ৫ আর ৬ জুন নামল তুমুল একটানা বৃষ্টি—আবহাওয়া আপিস তার দুয়েক দিন আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, বর্ষা আসবে ৮ জুন, কাজেই ওটা ছিল 'প্রাক-বর্ষা' বৃষ্টি। শহরের পয়ঃপ্রণালী ঘায়েল হয়ে শহর ভেসে গেল প্রবল বন্যায়। অবশ্য মেট্রোই অবস্থা সামাল দিতে কিছুটা সাহায্য করল। এসপ্ল্যানেডে একটা পলকা দেয়াল তোলা হয়েছিল মেট্রোর সুড়ঙ্গে জল ঢোকা ঠেকাতে, সে দেয়াল ধ্বসে পড়ল ভবানীপুরে বাড়ি বাড়ি জল ঢোকা বন্ধ করতে অনুরূপ একটি দেয়াল উদ্যমী পুরুষেরা নিজেরাই ধ্বসিয়ে দিলেন তাছাড়া নানা জায়গায় দেখা দিল প্রচুর ফাটাফুটো। পরিণামে লক্ষ লক্ষ লিটার জল ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। অত্যধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মেট্রোর—বহু জায়গায় লাইন আবার নতুন করে পাততে হবে, উদ্বোধন পিছিয়ে গেল এক-দুই বছর।

ফলে আবার উঠেছে এই মেট্রোর সম্ভবপরতার প্রশ্ন। অনেক সমালোচক বলছেন, ইতিমধ্যে যা ব্যয় হয়েছে তা হিসাব থেকে বাদ দিলেও এর খরচ হবে এর উপকারের বেশি—অর্থাৎ কিনা এতদূর এগোনোর পরেও কর্মসূচীটা ত্যাগ করাই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ অভিমতের পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক করা এখানে আমার লক্ষ্য নয় ; আমি শুধু এটুকুই বলব যে মেট্রোর মতো বৃহৎ নির্মাণকাণ্ডের বেলায় জনমত সাধারণত অহেতুক রক্ষণশীল হয়ে থাকে। কারণটা স্পষ্ট। মেট্রোর উপকার-অপকার সবই মিলবে শত শত বছর ধরে (যদি না পারমাণবিক শক্তিগুলির দয়ায় হিসাবটা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়), অথচ গোড়ার দিকে অসুবিধাটাই বেশি, সুবিধা আসে পরে। খরচটা তাই উপকারের তুলনায় অতিরঞ্জিত হয়েই দেখা যায়।

লণ্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে তার নাগরিকদের যে সুবিধা হয়েছে তা ১৮৫০ সালে যখন পরিকল্পনাটা প্রণীত হয়েছিল তখনকার পরিকল্পনাকারীদেরও কল্পনার বাইরে। লন্ডন শহরের সার্ভেয়র চার্লস পিয়ার্সন যখন লন্ডনের জন্য পৃথিবীর প্রথম ভূগর্ভস্থ পরিবহন ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলেন তখন বিরোধিতা হয়েছিল অপরিসীম। কত রকমের আশঙ্কাই যে ব্যক্ত হয়েছিল। ডিউক অব ওয়েলিংটনের তো ভয় ছিল ফরাসিরা হঠাৎ একদিন তলা দিয়ে আক্রমণ করে বসবে। ১৮৬৩ সালে উদ্বোধনের পর কয়েক বৎসর লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ডের প্রচলিত নাম ছিল 'নর্দমা'।

এটা সত্য যে মেট্রোর দরুন কলকাতার ওপর চেপেছে বিপুল ব্যয়ের বোঝা, অথচ এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকটাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দক্ষ রূপায়ণের দ্বারা এড়ানো যেতে পারত। তবু মেট্রোর মধ্যেই রয়েছে কলকাতাকে বাঁচতে সাহায্য করার শক্তি। বুঝি-বা এটাই এ শহরের অপরিহার্য বাইপাস সার্জারি। এর লাভ যে আজ আমারা যা ভাবছি তার চেয়ে অনেক বেশি হবে তাতে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য তাতেই সাফল্য সুনিশ্চিত হয় না। যেমন গা-ছাড়া ভাবে নির্মাণকর্ম চলছে তাতে সংশয় হয় কোনোদিনই ওটা শেষ হবে কিনা। বাইপাস সার্জারিও ব্যর্থ হতে পারে।'

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি গ্রামের আলাপ-আলোচনা

আরবেলিয়া বৈশিষ্ট্যহীন পুরোনো একটি গ্রাম। পাকা বাড়ি কয়েকটা আছে, জীর্ণ শ্যাওলাধরা। হাইস্কুল আছে, কলেজ নেই। হাসপাতাল নেই, কোনো শিল্প নেই। বাসিন্দারা গরিব, জীবিকা কৃষি—প্রধানত ধান আর পাটের। চব্বিশ পরগনা তথা পশ্চিম বাংলার শত শত ক্ষুদ্র গ্রামের একটি আরবেলিয়া।

গ্রামটিতে বেড়াতে গিয়ে ঠিক করলাম একটা দিন স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে একটু আলাপ-আলোচনা করা যাক। সঙ্গে উৎসাহী গাইড, ভোরবেলা বটগাছ থেকে 'চোখ গেল' 'পিউ কাঁহা' ইত্যাদি পাখির ডাক ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাত্রা শুরু কলাঝাড় আর কচুরিপানায় ভরা পুকুরের পাশ দিয়ে। কত রকম লোকের সঙ্গে পরিচয় হল—শেকসপিয়র আলোচনায় আগ্রহী বৃদ্ধ স্কুলমাস্টার, হিন্দু-মুসলমান চাষি, কংগ্রেস (ই) দলভুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান, এক মুরগি-চাষি তথা ডাক্তার যাঁর মনোযোগ মানুষের চেয়ে বেশি মুরগির দিকে, এক ছাত্র। প্রত্যেক বাড়িতে চাটাইয়ে বসতে দেওয়া হল, কোথাও চা মিলল, কথাবার্তা চলল একদল বাচ্চার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে।

প্রিয় বিষয় দুর্নীতি। প্রাপ্যটা পেতেও ঘুষ দিতে হয়। দেয়ও তারা, বাঁচতে তো হবে। তবু সর্বব্যাপী দুর্নীতির জালে বীতশ্রদ্ধ তারা।

এক মুসলমান বাড়িতে এক গাদা কাঁচা কলা। পাকলে অবশ্য দাম বেশি মিলত, কিন্তু আগেই তো চোরে নিয়ে যাবে গাছ থেকে পেড়ে। চোর ঠেকাতে তাই আগে ভাগেই পেড়ে রাখতে হয়। কিন্তু চোরও করতে পারে তা। ফলে মালিককে পাড়তে হয় আরো আগে। এই চলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত মালিক যখন এমনই কাঁচা অবস্থায় পাড়ে যে চোরের পক্ষে তা চুরির ঝুঁকি নেওয়া অলাভজনক হয়ে পড়ে, তখন আসে ভারসাম্য। অর্থনীতির তত্ত্ববিদদের পক্ষ ব্যাপারটা আগ্রহজনক। চোররা শেষ পর্যন্ত সম্ভবত পায় না কিছুই, কিন্তু সেটুকু সুনিশ্চিত করতে গিয়ে মালিককে ছাড়তে হয় তার লাভের এক বৃহৎ অংশ। ফলাফল সবার পক্ষেই কাম্যের কম, যদিও সবারই আচরণ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। 'অদৃশ্য হস্ত' একেবারেই অদৃশ্য এখানে!

নিদারুণ দারিদ্র্য আর বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই আরবেলিয়ার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষকদের আবহমানকালের স্মৃতির সাক্ষ্যও তাই। কেউ কেউ চাষের জন্য ট্র্যাক্টর ভাড়া করে, কারো আছে কুয়ো থেকে জল তোলার বৈদ্যুতিক পাম্প। অধিক ফলনশীল ফসল কেবল অতিবৃহৎ চাষিরাই ফলায় কারণ ওগুলোতে নাকি 'ঝুঁকি বেশি'। একটি মাত্র নূতনত্ব সর্বব্যাপী—তা হল রাসায়নিক সার, সব চাষিই তা ব্যবহার করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশির ভাগ তরুণের জীবন হবে তাদের বাপ-ঠাকুর্দারই মতো। অন্তত আরবেলিয়াকে নিয়ে Toffler-কে দুর্ভাবনায় পড়তে হবে না।

গত কয়েক দশকের মধ্যে একমাত্র যে নতুন কাজ এলাকায় ঢুকেছে তা হল মাদুর বোনা, এক ধরনের ঘাস থেকে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বাস্তুহারারা এই কুটির শিল্পটি চালু করেছিলেন। আজও তা তাঁদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। আরবেলিয়ায় বহিরাগত জনসমষ্টিই সবচেয়ে প্রগতিশীল।

তাঁদেরই একজনের সঙ্গে আমার দেখা হল তাঁর পাকা বাড়িতে। লোকটি আধা-ডাক্তার, তবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর ছাদের ৩০০ মুরগি সম্বলিত পোলট্রি ফার্ম। কথোপকথন শুরু করার মতলবে আমি মুরগিতে আগ্রহী সেজেছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে এতই সফল হলাম তাতে যে ভদ্রলোক পোলট্রি ব্যবসার অন্ধিসন্ধি বোঝাতে লেগে গেলেন। শেষে জিগ্যেস করলেন তাঁর কাছে আসার হেতু এবং আমার সব কৈফিয়ৎ উড়িয়ে দিয়ে বললেন তিনি প্রথম থেকেই জানতেন আমার আসল ধান্ধা পোলট্রি ব্যবসায় নামা। উক্ত কর্মে সাফল্য সম্পর্কে যেসব সদুপদেশ তিনি আমায় দান করলেন পাঠকের তাতে আগ্রহ থাকার কথা নয়।

আস্তানায় যখন ফিরছি হতদরিদ্র কিছু ছেলে আসছিল পিছন পিছন। জিগ্যেস করলাম এশিয়াড ব্যাপারটা শুনেছে কিনা। বলল, না। আমিও আর উচ্চবাচ্য না করে পা চালালাম। কি হবে ওদের শান্তি নষ্ট করে!

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে

আমাদের বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন যে পক্ষপাতদুষ্ট ও অন্যায্য, আমাদের এ ধারণাটি সঠিক কিন্তু সেই অন্যায্যতার প্রকৃতি ও প্রতিবিধান নিয়ে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। যেমন একটা বহুলপ্রচলিত বিশ্বাস হল; আইন বাড়িওলার বিপক্ষে। তাৎক্ষণিক অর্থে তা সত্য বটে, কিন্তু চাহিদা-যোগানের টানাপোড়েন মেটার পরে দেখা যায় লোকসান হয় বাড়িওয়ালা ভাড়াটে উভয়েরই। এক্ষুনি ব্যাপারটা পরিষ্কার করব।

দিল্লিতে ইদানিং যথেষ্ট চাপাচাপি হয়েছে 'দিল্লি বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৮' সংশোধনের জন্য। কয়েক মাস আগে দিল্লির বাড়িওয়ালা সমিতি যে আবেদনপত্র পেশ করেছে তার একমাত্র সুফল হবে রাজধানীতে সমাজতন্ত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি। Economic Administration Reforms Commission-এর প্রস্তাবেও ন্যায্য ভাড়া ধার্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হয়েছে। একটি মাত্র বাড়ির মালিককে ভাড়াটে উচ্ছেদের অধিকতর স্বাধীনতা দান থেকে বার্ষিক শতকরা দশ ভাগ ভাড়া বৃদ্ধি পর্যন্ত নানা ধরনের সুপারিশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যদিও এগুলির ফলে এক ধরনের পক্ষপাত ও অনড়তার বদলে আসবে আরেক ধরনের পক্ষপাত ও অনড়তা।

সমস্যাটার মর্মগ্রহণ করতে গেলে বাজারের শক্তিগুলির ভূমিকা বুঝতে হবে। এটা সত্য যে প্রচলিত আইনে বাড়িওয়ালার পক্ষে ভাড়াটে তোলা খুবই কঠিন, যত চুক্তিই করা হোক দুটাকার স্ট্যাম্প পেপারে। কিন্তু সব বাড়িওয়ালাই তো তা জানে আর তাই 'দক্ষিণ ভারতীয় ভাড়াটে'র জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। তবে দক্ষিণ ভারতীয়দের যোগান তো পুরোপুরি স্থিতিস্থাপক নয়, তাই পাছে কোনো ভাড়াটে প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দীর্ঘকালের জন্য জেঁকে বসে সেই ঝুঁকি পোষানোর জন্য বাড়িওয়ালা ভাড়া চড়ায়। অর্থাৎ কিনা যে ভাড়া আমরা দেখছি তার মধ্যে এই বাড়তিটা ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু রয়েছে সমস্যাটার উত্তরোত্তর ঘোরালো হয়ে ওঠার প্রবণতা। একজন গড়পড়তা ভাড়াটে ধরুন দশ বছর থাকে—এটাও ভাড়া চড়িয়ে দেয় এর ফলে কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন বাসিন্দারাই নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া দেয়, তাতে ভাড়া আরো চড়ে। George Akerlof-এর চমৎকার গবেষণায় এরই নাম 'lemons principle'।

অতএব যার শুধু দু বছরের জন্য ফ্ল্যাট দরকার সে মার খেয়ে যায়। সে যে সত্যিই দু-বছরী ভাড়াটে এ বিষয়ে বাড়িওয়ালাকে নিশ্চিন্ত করার কোনো উপায় থাকলে বাড়িওয়ালা হয়তো সানন্দে ৬০০ টাকা নিতে রাজি হত কিন্তু তেমন উপায় না থাকায় তাকে ১২০০ টাকাই দিতে হয়। এখানেই ব্যবস্থাটার আসল অন্যায়। ঠকছে বাড়িওয়ালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা ভাড়াটে নয়, ঠকছে যারা প্রতিশ্রুতি রাখতে চায় তারা—বদলির চাকুরিরত ভাড়াটে এবং সেইসব হতভাগ্য বাড়িওয়ালা যাদের বাড়িতে ভাড়াটে ঢুকছে মুখে মিষ্টি প্রতিশ্রুতি আর মনে ওখানেই নাতি মানুষ করার মতলব নিয়ে।

এই কারণেই এ মন্তব্য বিভ্রান্তিকর যে 'মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে আয় বাড়লেও বাড়িভাড়া অনড় থাকছে'। পুরোনো আর নতুন ভাড়াটেদের ভাড়ার মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। প্রথমোক্তগুলি সত্যি অনড় থেকে গেছে এবং তজ্জনিত ভীতির ফলে নতুন ভাড়াও বেড়েছে উদ্দাম গতিতে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তকে ফেলেছে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে।

সমস্যার সুরাহা কিসে ? আমাদের মতো অবাধ বাজারের (laissez-faire system) পক্ষে বোধ হয় সর্বোত্তম পন্থা হবে 'চুক্তি ব্যবস্থা' বলবৎ করা। ভাড়াটে উচ্ছেদ তাতে সহজ বা দুরূহ কোনোটাই হবে না, কেবলমাত্র বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে যে চুক্তিই করুক তা মানতে বাধ্য থাকবে। বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাজ তখন হবে Economic Administration Reforms Commission যা চাইছেন তা থেকে ভিন্ন—'ন্যায্য' ভাড়া ও শর্তাবলী বেঁধে দেওয়া নয়, চুক্তি বলবৎ করা।

এর ফলে আনুষঙ্গিক শর্তাবলী অনুযায়ী নানা ধরনের ভাড়া দেখা দেবে। একই ফ্ল্যাট দু বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া হচ্ছে, নাকি কুড়ি বছরের জন্য ; তার উপর নির্ভর করবে তার ভাড়া ৬০০ টাকা হবে নাকি ১২০০ টাকা। চুক্তিতে মূল্যস্ফীতি-পরিপোষক কোনো শর্ত রাখা হবে কিনা সে কথা কোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলে দেবে না বাড়িওয়ালাকে, তা হবে পুরোপুরি চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের ইচ্ছাধীন। কেউ চাইবে মোটা অঙ্কের বাঁধা ভাড়া, কেউ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে বাড়তে-থাকা কম ভাড়া।

অনেক অর্থনীতিবিদ ভাবেন সরকার যদি কেবল অর্থনীতিবিদদের কথা শুনত তাহলেই সব ঠিক হয়ে যেত। আমি সে দলে নই। তবু আমার বিশ্বাস, বাড়িভাড়ার ব্যাপারে অর্থনীতির প্রাথমিক তত্ত্ব থেকেও অনেক কিছু পাওয়ার আছে, তা অগ্রাহ্য করা বিরাট ভুল।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

সীমানা পেরিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগান-পন্থী অর্থনীতি

তরুণ মার্কিন অর্থনীতিবিদ Arthur Laffer যখন আরো তরুণ ছিলেন তখন একদিন ওয়াশিংটনের এক রেস্তোরাঁয় হাত-মুখ মোছার তোয়ালেতে ঘন্টাকৃতি এক রেখা এঁকে জন্ম দিয়েছিলেন 'ল্যাফার লেখ'র (Laffer Curve)—যাতে কর-হারের সঙ্গে মোট সংগৃহীত করের সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে। রেগানের অর্থনীতির, বা 'রেগানমিক্স'-এর, মূল চিন্তাধারা হল 'যোগান-পন্থী অর্থনীতি', যার মূলে রয়েছে ল্যাফার লেখ।

এর মোদ্দা কথাটা কিন্তু অত্যন্ত সরল, এ কথা শুনে এর প্রবক্তারা যতই খেপে ওঠেন না কেন। করহার বাড়লে কাজের প্রণোদনা, এবং ফলত জাতীয় আয়, কমে যেতে পারে। এই মত অনুযায়ী একটা পর্যায়ের পরে তা এত বেশি কমে যে মোট সংগৃহীত করও তার ফলে কমে যায়। মার্কিন 'যোগানপন্থী'রা দাবি করেন যে মার্কিন দেশ ও আরো অনেক দেশে করের হার ঐ ক্রান্তি বিন্দু (critical point) পেরিয়ে গেছে। সুতরাং করের হার কমালে জাতীয় আয় বাড়বে এবং —অদ্ভুত ঠেকলেও—বাড়বে মোট সংগৃহীত কর।

মার্কিন বিদ্যাঙ্গনে যোগান-পন্থী অর্থনীতির তেমন প্রভাব না পড়লেও রিপাব্লিকান কংগ্রেস সদস্যদের তা মনে ধরে গেল ধনীদের সুবিধাদানের একটি চমৎকার অজুহাতরূপে। রেগান সরকারের সবচেয়ে মেধাবী এক টেকনোক্র্যাট David Stockman তো একবার ফসকে তাঁর এক বন্ধুকে বলেই ফেললে যে গভীর অর্থনৈতিক দর্শনের ওসব গালগল্প আসলে ধনীদের মদত দেওয়ার 'ট্রোজান ঘোড়া'। বন্ধুটি ছিলেন 'দি অ্যাটলান্টিক মান্থলি'র সম্পাদক, ফস করে পুরো কথোপকথনটি তিনি ছেপে দিলেন। তুলকালাম লেগে গেল ওয়াশিংটনে, তবে রাজস্ব বিষয়ে অতুলনীয় দখল থাকার ফলে টিকে গেলেন স্টকম্যান। অনেকেই তাঁকে সমালোচনা করেছিলেন নতিস্বীকার করে রেগানের অধীনে থেকে যাওয়ার জন্য। তবে আমার মনে হয়, প্রত্যেক সৎ আমলাকেই পড়তে হয় স্টকম্যানের উভয়সংকটে—সব দায়িত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে সরে দাঁড়াবে, নাকি যে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে পুরো একমত নেই তাদের প্রভাবিত করার আশা নিয়ে থেকে যাব।

যাকগে—বিপুল বাজেট-ঘাটতি, চড়া সুদের হার ও বেকারি এবং যুদ্ধপরবর্তী অন্যতম তীব্র ও ব্যাপক মন্দার কারণে রেগানমিক্স্ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। অনেক অর্থনীতিবিদই আজ একমত যে হাতমুখ মোছার তোয়ালেটাকে তার স্বাভাবিক কাজে লাগালেই সবার ভালো হত।

পাশ্চাত্যে ব্যাপক মোহভঙ্গ সত্ত্বেও ভারতে যোগান-পন্থী অর্থনীতির পসার বাড়ছে মনে হয়, যদিও বেনামে। একটা সরকারি মনোভাব গড়ে উঠছে যে 'লড়কে লেঙ্গে'রাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতির সৈনিক, অতএব আমাদের অনগ্রসরতা কাটাতে গেলে ওদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। মুশকিল হল, যে দেশে লড়ে নেবার মতো বেশি কিছু নেই সে দেশে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ অন্যদের সম্বল খোয়াতে সাহায্য করা এবং একটা কাড়াকাড়ির অন্যায় সমাজ কায়েম করা।

এমনিতেই আমাদের করব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষ অত্যন্ত বৈষম্যবর্ধক। একজন উচ্চপদাসীন সরকারি চাকুরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যে তাঁর চেয়ে বহুগুণ বেশি উপার্জনকারী ব্যবসায়, উকিল বা ডাক্তারের চেয়ে নিজ আয়ের অনেক বৃহত্তর অংশ কররূপে দিয়ে থাকেন। এ তো সবারই জানা। তদুপরি ভারতের কালো অর্থনীতি বিষয়ে কিছু সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে মনে হয় কর ব্যবস্থা ক্রমেই আরো অধোগতিশীল (regressive) হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় কর্মপ্রণোদনার উপর আমাদের ঘোষিত করের হার ও নিয়মকানুনের প্রভাব নিয়ে কথাবার্তা একটা দুর্জ্ঞেয় ও নিষ্ফল আলোচনা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ bearer bond এবং কর ফাঁকির হাজার সুযোগ সংবলিত বর্তমান ব্যবস্থা ধনী দরিদ্র কাউকেই প্রণোদনা যোগায় না, প্রণোদিত করে কেবল ঠগদের। প্রগতির সর্বোত্তম পন্থা এটা নয় নিশ্চয়।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮২)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নব্য সমষ্টিগত অর্থনীতি ও স্ট্যাগফ্লেশন

শিল্পোন্নত দেশগুলি কি এক গভীর ধ্বসের (slump) কিনারায় ? গত কয়েক মাসে বারে বারে প্রশ্নটা উঠেছে, এখন কিছুটা নিশ্চয়তার সঙ্গে তার জবাব দেওয়া সম্ভব। সমবেত প্রচেষ্টায় তীব্রতা কমানো গেলেও সংকোচন (recession) পুরোপুরি এড়ানো যাবে না আশির দশকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার পূর্বলক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। বেকারি হু হু করে বাড়ছে, মে মাসেই তা মোট শ্রমিক-সংখ্যার শতকরা ৭·৫-এর বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসা শ্লথ, মজুত বর্ধমান।

শুরুটা হয়েছিল দাম দিয়ে। অব্যাহতভাবে দাম বাড়তে বাড়তে মার্চের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি গিয়ে ঠেকল বার্ষিক শতকরা কুড়ির তলায়। ওয়াশিংটনে আতঙ্ক। রেগান ঠেলা মারছেন পেছন থেকে, অতএব প্রেসিডেন্ট কার্টারকে এমন কিছু ব্যবস্থা নিতেই হলো যা বছর ঘোরার আগেই ফলপ্রদ হবে। ব্রেক কষলেন তিনি, ঋণের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপল, ছাঁটাই হল বাজেট। সে সবেরই ফল এখন ফলছে, আর সারা পৃথিবী আজ যেহেতু বাণিজ্যের জালে বাঁধা তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকরী চাহিদা হ্রাসের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য অন্যান্য দেশে।

অবশ্য দোষটা কেবল প্রেসিডেন্ট কার্টার ও তাঁর উপদেষ্টাদের নয়। মার্কিন অর্থনীতির বহির্ভূত নানা কারণও বর্তমান, তন্মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রধান হল তেলের দামের বিপুল বৃদ্ধি।

সত্তর ও আশির দশকের আর্থিক জড়তা (Stagnation) বিগত কালের থেকে ভিন্ন, তা সহাবস্থান করে চড়া মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে—এর নাম দেওয়া হয়েছে Stagflation। এর অদ্ভুত মতিগতি প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে ফলে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে সমষ্টিগত অর্থনীতির (macroceconomics) তত্ত্বে। ষাটের দশকের শেষভাগে প্রচার করা Clower ও Leijonhufvud এর কাজের ভিত্তিতে বিশিষ্ট ফরাসি তাত্ত্বিক Edmond Malinvaud এক নীতির সমষ্টিগত অর্থনীতির মূল তত্ত্ব দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর যুক্তি হল, কোনো অর্থনীতি একটি নির্দিষ্ট সময়ে তিনটি অবস্থার যে কোনো একটিতে থাকতে পারে। কেইন্‌সীয় (Keynesian) সে তিনের মোটে একটি—যদিও সনাতন সমষ্টিগত অর্থনীতিতে সেটাই, বলতে গেলে একমাত্র। অ-কেইন্‌সীয় অর্থনীতিতে কেইন্‌সীয় পন্থা খাটাতে গেলে উল্টো ফল ফলতে পারে।

এই নতুন সমষ্টিগত অর্থনীতিতে ঢোকার আগে বেকারি ও জড়তা দূরীকরণের কেইন্‌সীয় পন্থাগুলো সংক্ষেপে ঝালিয়ে নেওয়া যাক। কেইন্‌সবাদীদের মতে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনীতিতে বড় ধরনের অনভিপ্রেত বেকারির মূল কারণ একটাই—পণ্যের মোট চাহিদার ঘাটতি। প্রতিবিধানও পরিষ্কার—চাহিদা বাড়ানো, যার বাঁধা উপায় ঘাটতি বাজেট (deficit financing)।

কেইন্‌স তাঁর তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন ত্রিশের দশকের গোড়ায় মহা মন্দার সময়। বেশ কয়েক দশক তাঁর চিকিৎসায় ভলোই চলল, গোলমাল দেখা দিল সত্তরের দশকে এসে। ঘাটতি বাজেটে বেকারি তো কমলই না, বাড়তে লাগল মুদ্রাস্ফীতি। অর্থনীতিবিদদের আত্মবিশ্বাস গুরুতরভাবে ঘায়েল হল, চলল জোর গবেষণা, মাল্যাঁভো-র (Malinvaud) কাজ হল তারই এক গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি।

নতুন সমষ্টিগত অর্থনীতির মূল কথা হল, বেকারির প্রতিকার নির্ভর করে তার কারণের উপর, আর কারণটা সর্বদা কার্যকরী চাহিদার অভাব নয়। মাল্যাঁভো-র মডেলে দাম পুরোপুরি নমনীয় নয়—অন্ততপক্ষে উদ্বৃত্ত চাহিদা থাকলেই তা যান্ত্রিকভাবে চড়ে না বা উদ্বৃত্ত যোগান থাকলেই নামে না। নয়া-ধ্রুপদী বা নিও-ক্লাসিক্যাল (neoclassical) অর্থনীতি অনুযায়ী উদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত যোগান সম্পন্ন বাজার পাওয়াই তো কঠিন—কেননা দামের ওঠানামায় চটপট মুছে যাবে সেসব উদ্বৃত্ত। কিন্তু মাল্যাভো-র বিশ্লেষণ (এইখানে কেইন্‌সের সঙ্গে তাঁর তফাৎ নেই) চাহিদা-যোগান সর্বদা মেলে না। এর প্রচুর প্রমাণ ছড়ানো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে—দোকানের বাইরে লম্বা লাইন, টেলিফোন পাওয়ার জন্য অন্তহীন প্রতীক্ষা, কারখানায় বর্ধমান মালের মজুত।

বেকারি থাকতে গেলে শ্রমের উদ্বৃত্ত যোগান থাকতে হবে, তবে তার সঙ্গে থাকতে পারে পণ্যের উদ্বৃত্ত চাহিদা ও উদ্বৃত্ত যোগান (এ দুইয়ের কোনোটাই না থাকার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, তাই উপেক্ষণীয়)। মাল্যাঁভো প্রথমটিকে বলছেন ধ্রুপদী পরিস্থিতি, দ্বিতীয়টিকে কেইনসীয় পরিস্থিতি।

ধ্রুপদী পরিস্থিতিতে বেকারি কমানোর সনাতন পন্থার ফল দেখুন। সরকার যতই কেন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করুক, উৎপাদনের উপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না, কারণ চাহিদার অভাবটা তো সমস্যাই নয় মোটে। ফলে বেকারির উপরেও কোনো প্রভাব পড়ে না, নতুন চাহিদা ইতিপূর্বে বিদ্যমান চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপই বাড়িয়ে দেয় শুধু। ধ্রুপদী পরিস্থিতিতে কেইনসীয় পন্থার এই পরিণাম বেশ মিলে যায় শিল্পোন্নত দেশগুলির সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

কেইনসীয় পরিস্থিতিতে বেকারি কমানোর সনাতন পন্থা প্রত্যাশিত ফল প্রদান করে। এক্ষেত্রে উৎপাদকরা অধিকতর পণ্য যোগান দিতে ইচ্ছুক, দেয় না কেবল ক্রেতা নেই বলে। এ অবস্থায় চাহিদা বাড়াতে পারলে তাতে উৎপাদন বাড়বে, ফলে বাড়বে নিয়োগ।

আগেই বলা হয়েছে, তৃতীয় এক ধরনের পরিস্থিতিতেও সম্ভব—'অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির অর্থনীতি'। এটা পূর্ণ নিয়োগ সম্পন্ন অর্থনীতি, যা এতই বিরল যে এখানে উপেক্ষাযোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

অতএব বেকারি কমানোর গতানুগতিক পন্থাগুলি যে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কাজে লাগছে না তার একটা সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো হয়তো ইতিমধ্যে কেইনসীয় থেকে ধ্রুপদী হয়ে গেছে। তাই ব্যর্থ হচ্ছে পুরোনো পন্থা, দেখা দিচ্ছে এমন সব ঘটনা যাদের মর্মগ্রহণ কেইনসীয় চিন্তার চৌহদ্দির মধ্যে অসম্ভব।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েতে অর্থনৈতিক পেরেস্ত্রইকা

লেনিনগ্রাদে বৃষ্টি হয়েছে। সার্কাসে ঢোকার জন্য বাস থেকে নেমেই লক্ষ্য করলাম নড়বড়ে তাঁবু, কাদা আর জলভরা গর্ত, অস্থায়ী খাবারের দোকান আর প্রস্রাবাগারের সামনে লম্বা লম্বা লাইন।

যেন তৃতীয় বিশ্বেরই যে কোনো জায়গায় রয়েছি আমরা ; অথচ তাঁবুর ভেতরের কাহিনী একেবারে ভিন্ন। তিন ঘন্টা মুগ্ধমুগ্ধ হয়ে বসে বসে দেখলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর একটি অনুষ্ঠান।

এই হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রহেলিকা। কোনো বিশেষ গুরুত্ব বা আগ্রহের বিষয়ে তার সাফল্য অসাধারণ—যেমন বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ-প্রযুক্তি, খেলাধুলো, নৃত্য-পরিকল্পনা। অথচ প্রাত্যহিক জীবন ও সংগঠনের বিচারে সোভিয়েত অর্থনীতি পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে। শ্লথ অর্থনীতি, দীর্ঘসূত্রী আমলাতন্ত্র। তার সাফল্যগুলির পাশাপাশি এগুলো যেন ব্যাখ্যার অতীত, ঠিক যেমন তাঁবুর ভেতরের নিখুঁত অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাইরের বিশৃঙ্খলার কোনো যোগসূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় না।

রুশরা নিজেরাই এ অসংগতি নিয়ে বিড়ম্বিত। ইদানীং মিখাইল গর্বাচেভের উদ্যোগে অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা চলছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের গোলমালটা হল, তার অর্থনীতি 'ঘাটতি অর্থনীতি'। সারা দুনিয়ায় যখন মূল্যস্ফীতি চলছে তখন তার সরকার নিয়ন্ত্রিত দামগুলিকে রাখা হয়েছে নিচু করে।

নিচু দাম জিনিসপত্রের চাহিদাকে কৃত্রিমভাবে ফাঁপিয়ে রাখে, ফলে ভোগ্যবস্তুগুলো নিম্নমানের, ক্রেতাদের নিয়ত মোকাবিলা করতে হয় ঘাটতির, দাঁড়াতে হয় লম্বা লম্বা লাইনে।

এরই আলোকে, দেখা উচিত গর্বাচেভের পেরেস্ত্রইকা আহ্বান। রুশ ভাষায় 'পেরেস্ত্রইকা'র অর্থ কাঠামো বদল। কিন্তু অর্থনীতির যে কোনো বড় মাপের কাঠামো বদল করতে গেলে নানা স্বার্থে ঘা দিতে হবে। গর্বাচেভ কি তা পারবেন ?

বৃহৎ পরিবর্তনে সচেষ্ট রাজনীতিবিদেরই অবলম্বনরূপে প্রয়োজন হয় কোনো পণ্ডিত বা চিন্তাবিদকে। রাশিয়ার নয়া গুরু হলেন অর্থনীতিবিদ নিকোলাই শ্মেলিয়ভ। সোভিয়েত পত্রিকা 'নোভি মির'-র জুন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধ থেকে গর্বাচেভ উদ্ধৃতি দিতেই একজন স্বল্প-পরিচিত লেখক থেকে রাতারাতি খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন শ্মেলিয়ভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধটি এখন ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। শমেলিয়ভ তাতে দাম চড়ানোর (ক্রেতারা বর্তমানে ভর্তুকি পায় ৫০ বিলিয়ন রুবলেরও বেশি), স্টক কোম্পানি স্থাপনের, এমন কি খানিকটা স্বাভাবিক বেকারি মেনে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।

প্রণোদনার (incentive) গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটি ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হচ্ছে: 'অর্থনীতির নিয়মগুলো অমান্য করার ফল চেনোবিলের পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের নিয়ম অমান্য করার মতোই ভয়ংকর।'

শমেলিয়ভের প্রবন্ধটি কড়া, গভীর নয়। পশ্চিমা সংবাদপত্রগুলি তা নিয়ে যেমন গদগদ হয়ে উঠেছে তা আমার মতে ভুল। এর খ্যাতির কারণগুলি ক্ষণস্থায়ী—স্পষ্ট ভাষণ এবং তেতো ওষুধ গেলাতে গর্বাচভকে সহায়তা দান

আমার বিশ্বাস, গর্বাচভের পদপেক্ষপ সঠিক দিকেই এবং লেনিনগ্রাদের রাস্তায় রুশ জনগণের যে ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি তা থেকে মনে হয়েছে পেরেস্ত্রইকা নিয়ে উৎসাহ ব্যাপক।

তবে কায়েমি স্বার্থের একটা কাঠামোকে ভাঙা অত্যন্ত কঠিন কাজ। চেনোবিল এবং অর্থনীতির মতোই আমলাতন্ত্রেরও নিয়ম আছে। নিজের মনোগ্রাহী কথাগুলো কাজে লাগানোর সময় আমলাতন্ত্রের এই নিয়মগুলির তিনি কিভাবে মোকাবিলা করেন সেটাই দেখার বিষয়।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় বিশ্বের ঋণ

তৃতীয় বিশ্বের ঋণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে তা এক দশক আগেও চিন্তা করা যেত না। এখনও খুব কম লোকই অনুন্নত দেশগুলির ঋণের বিশাল বৃদ্ধি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। ১৯৭২ সালে অনুন্নত দেশগুলির কাছে আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের মোট পাওনা ছিল ৩৬·৭ বিলিয়ন ডলার। ১৯৮১ সালে তা ২৭৩ বিলিয়ন ডলার পেরিয়ে গিয়েছে। এ ঋণ বাড়ছেই। ১৯৮০ সালে অনুন্নত দেশগুলির ঋণ ছিল তাদের রপ্তানি মূল্যের শতকরা ৭৬, ১৯৮২ সালে তা হয়েছে ১০৪। মেক্সিকো কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সংকটটা সাময়িকভাবে ঠেকানো গেছে। এখন ব্রেজিল রয়েছে বিপর্যয়ের মুখে, তার দেনা প্রায় এক বিলিয়ন ডলার।

কোনো বড় দেশ তার আন্তর্জাতিক পাওনা মেটাতে ব্যর্থ হলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলির উপর (এবং তাদের মারফৎ বিশ্ব অর্থনীতির উপর) তার প্রতিক্রিয়া বিপর্যয়কর হতে পারে। তাই প্রত্যেক বারই যেই কোনো দেশের ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয় (যেমন হালে হল মেক্সিকো আর ব্রেজিলের) তৎক্ষণাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো দেনাপাওনা পুনর্বিন্যাস করে অনুন্নত দেশগুলিকে টেনে তোলার প্রাণপণ প্রয়াস চালায়। ফলে একটা মিথ্যা ধারণা জনমনে ছড়িয়ে পড়েছে যে বর্তমান ঋণসংকটে খাতক দেশগুলির চেয়ে ব্যাংকগুলির ক্ষতি হয়েছে বেশি। এর চেয়ে বড় অসত্য আর কিছু হতে পারে না। কোনো দেশ পাওনা সত্যি সত্যি না মেটালে ব্যাংকগুলির অসুবিধা হয় ঠিকই (কোনো কোনোটা ফেলও মারবে নিঃসন্দেহে), কিন্তু ওটা না ঘটা পর্যন্ত ব্যাংকগুলির লোকসানের বদলে বরং লাভই হয়। ঋণ পুনর্বিন্যাস অতি লাভজনক কর্ম হতে পারে। আন্তর্জাতিক ব্যাংক ব্যবসার বর্তমান তেজীভাবে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। নতুন নতুন পাওনা ধার্য করে, পুনর্বিন্যস্ত ঋণের উপর চড়া সুদ চাপিয়ে অনেক ব্যাংক তাদের মুনাফা বাড়িয়ে নিয়েছে বিপুলভাবে।

কোনো দেশ ঋণের ফাঁদে আটকে পড়লে খুশি হয় সবচেয়ে ঋণদাতা। ঋনের ফাঁদ মানে, ঋণ পরিশোধের জন্য আবার ঋণ করতে বাধ্য হওয়া। একবার এই নাগপাশে পড়লে দেশটিকে প্রত্যেক বছর ঋণের পাওনা মেটানোর পর অর্থনীতি চালু রাখার জন্য আবার ঋণ করতে হয়। ঋণ নিয়ে সে বছর পার করার পর পরের বছর আবার সেই এক অবস্থা। তাকে ক্রমাগত পোয়াতে হয় সুদ গোনার লোকসান—সেটাই ব্যাংকগুলোর লাভ। ঠিক যেমন ভূমিদান দীর্ঘকাল বাঁধা থাকলে জমিদার তার মূলধনের বহুগুণ উশুল করে নিতে পারে, তেমনিভাবে ব্যাংকগুলোও মুনাফা কমিয়ে যেতে পারে তাদের মূলধন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবারও না তুলে।

আন্তর্জাতিক ঋণ অবশ্য বর্তমান বিশ্বে অপরিহার্য। কোনোদিন ঋণ নেব না—এটা একটা বালখিল্যসুলভ স্বাবলম্বিতার মোহ। শুধু যেন ঋণের ফাঁদে না পড়ি সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে—যদিও বারে বারেই তা ঘটেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অদৃষ্টে।

মুশকিল হচ্ছে, পরিহাসচ্ছলে যাই লেখা হোক না কেন কোনো কোনো দেশই পাওনা না মিটিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলির বয়কট ডেকে আনতে চায় না। তাই দেখা যায়, নিকারাগুয়ায় সান্দিনিস্তাদের বিরুদ্ধে নৃশংস যুদ্ধ চালানোর জন্য সোমোজা যে অঢেল ঋণ নিয়েছিল তা-ও সান্দিনিস্তারা পরিশোধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ সোমোজা ক্ষমতাসীন থাকার সময় সান্দিনিস্তারা আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলিকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, সোমোজার নেওয়া ঋণ ওরা শুধবে না।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধি

'আপনার বয়স কত ?'—এ প্রশ্ন অনেকে অপছন্দ করেন, কিন্তু বোঝে সবাই। কিন্তু 'আপনার দেশের জনসংখ্যার বয়স কত ?'—এ প্রশ্নের সামনে হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হতে পারে। তবু এ প্রশ্নই উত্তরোত্তর তাৎপর্য অর্জন করে চলেছে আজকের দুনিয়ায়—কারণ জনসংখ্যার বয়স ক্রমেই বাড়ছে।

জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধি নানাভাবে মাপা যায়। ৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক লোকদের শতকরা অনুপাত দিয়ে ; অথবা মধ্যবর্তী (median) বয়স দিয়ে—অর্থাৎ যে বয়স জনসংখ্যাকে ঠিক সমান দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে, অর্ধেকের বয়স তার তলায়, অর্ধেকের তার উপরে। কোনো দেশে যদি জন্মের হার কমে যায় এবং কমই থাকে, তাহলে তার জনসংখ্যার বয়স বাড়তে থাকবে, কারণ যত লোক ৬৫ বছরের উপরে উঠে আসবে তত শিশু জন্মাবে না।

পশ্চিম ইউরোপ কিছুকাল যাবৎ এ সমস্যারই কবলে পড়েছে। জন্ম ও মৃত্যু হারের হ্রাসের ফলে সমাজগুলি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সব উন্নত দেশের মোট জনসংখ্যায় ৬৫ বৎসরোর্ধ্ব মানুষের অনুপাত ১৯৭০ সালে ছিল শতকরা ৯·৬, ১৯৮০ সালে তা দাঁড়িয়েছিল ১১·১। পক্ষান্তরে অনুন্নত দেশগুলিতে পুরো সত্তরের দশক জুড়ে উক্ত অনুপাত ছিল ৩·৮-এর কাছাকাছি।

সমস্যাটা ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য সরকারগুলিকে দারুণ মুশকিলে ফেলেছে। উপরন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট যে আগামী দশকগুলিতে এটা আরো তীব্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। টোকিওর Population Research Institute-এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী উন্নত দেশগুলিতে ৬৫ বৎসরোর্ধ্ব নারীর শতকরা অনুপাত এ শতাব্দীর শেষে দাঁড়াবে ১৫·৩ এবং ২০২৫ সালে অবিশ্বাস্য ১৯। পুরুষদের যথাক্রম সংখ্যাগুলি হল ১০·৭ আর ১৪·৫ (ফলে অনেক পুরুষই নিঃসন্দেহে বার্ধক্য-অভিলাষী হয়ে উঠবে !) এর অর্থ আরো বেশি পেনশন, আরো বেশি চিকিৎসা-খরচ। এবং তার অর্থ মূল্যস্ফীতির বর্ধিত চাপ।

উক্ত সমীক্ষা থেকে আরো দেখা যায় যে অনুন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা যদিও এখন পর্যন্ত বিশেষ বুড়োয় নি, তবু ভবিষ্যতে চিত্রটির সম্ভবত পরিবর্তন ঘটবে, ২০২৫ সালে ৬৫ বৎসরোর্ধ্বের শতকরা অনুপাত গিয়ে ঠেকবে ৭·৮-এ। এমন আচমকা বৃদ্ধির সামাল দেওয়া কঠিন হবে—প্রথমত, তৃতীয় বিশ্বে সামাজিক সেবাসংগঠনগুলির হাল এখনই শোচনীয় ; দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনটার পাশাপাশি সম্ভবত আরো নানা কাঠামোগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(institutional) পরিবর্তন ঘটবে—যেমন পরিবার-ব্যবস্থার ক্ষয়—এবং বৃদ্ধরা তার ফলে আরো বেশি করে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন।

ভারতের জনসংখ্যার বয়স অবশ্য চীন বা ক্যারিবিয়ান দেশগুলির মতো অত দ্রুত বাড়বে না। কিন্তু তার কারণ আমাদের উচ্চ জন্ম হার। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ দিয়ে জনসংখ্যার বার্ধক্য ঠেকিয়ে রাখার চিন্তাটি খুব উল্লাসজনক নয়।

প্রলয় আসন্ন ভাবার কারণ না থাকলেও বয়োবৃদ্ধির সমস্যাটা স্বীকার করা প্রয়োজন। তৃতীয় বিশ্বে এ যাবৎ এ বিষয়ে খুব সামান্যই গবেষণা হয়েছে। জাপানে যতটা হয়েছে তা থেকে পরবর্তী তিন-চার দশকে চিকিৎসাব্যয়ের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটবে এমন পূর্বাভাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ আরো বেশি সমাজ-কল্যাণের পরিকল্পনা করা দরকার আমাদের।

তাছাড়া অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া নিয়েও ভাবনাচিন্তা করার সময় এসে গেছে। স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ লোকই আজ উক্ত বয়সের পরেও অনেক বছর কাজ করতে সক্ষম। উপরন্তু অবসর গ্রহণের বয়স বাড়ালেও জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অন্তত সমান হারে সমাজে নির্ভরশীলের অনুপাত বৃদ্ধি পাবে না।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ভারতীয়

মার্কিনবাসী ভারতীয় পুরুষরা ভারতের 'পাত্রপাত্রী' কলমে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় প্রায়ই একটা কৌশল অবলম্বন করে—মার্কিন বেতন টাকায় উল্লেখ করে। এতে তাদের স্বাচ্ছল্য হাস্যকর রকম অতিরঞ্জিত হয়ে প্রতিভাত হয় এবং তার ফলে হয়তো এমন অভাগিনী কনে জুটে যায় যে ডলার-টাকার বিনিময়-হারকে জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী সংশোধন করে নিতে শেখেনি। তবু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে সাধারণভাবে ভারতীয়রা খুবই ভালো করছে মার্কিন দেশে। এ কথা অবশ্য অনেক দিন যাবৎই বলা হচ্ছে, কিন্তু এত দিন তার ভিত্তি ছিল টুকরো টুকরো তথ্য আর বুকলিন বা অ্যান আরবার বা অন্য কোথাও চশমাপরা ভারতীয় বাচ্চার বিজ্ঞানে অজ্ঞাত রেকর্ড ভাঙার খবর।

এখন প্রথম বারের মতো সুযোগ পাওয়া গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের—বা আরো ব্যাপভাবে দক্ষিণ এশীয়দের—সাফল্য সুশৃঙ্খলভাবে মূল্যায়ন করার। ১৯৮০ সালের মার্কিন আদমসুমারির এ বিষয়ে পূর্বতন যে কেনো আদমসুমারির চেয়ে বেশি তথ্য সংগ্রহ করেছে। গবেষকরা সে সব তথ্য বিশ্লেষণ করা শুরু করেছেন। এ বিষয়ে প্রথম কটি নিবন্ধের অন্যতমটি Peter Xenos, Herbert Barringer ও Michel Levin-এর প্রণীত, এখন পর্যন্ত তা পাওয়া যায় মিমিওগ্রাফের আকারে।

আদমসুমারি থেকে স্পষ্ট বেরিয়ে আসে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক সাফল্য অন্য যে কোনো জনগোষ্ঠীর চেয়ে—শ্বেতাঙ্গ ও জাপানিদের চেয়েও—বেশি। একজন গড়পড়তা ভারতীয় গড়পড়তা শ্বেতাঙ্গের চেয়ে শতকরা ১৭ ভাগ ও গড়পড়তা জাপানির চেয়ে শতকরা ৯ ভাগ বেশি আয় করে।

আর্থিক সচ্ছলতা আর কৃষ্টির বিশ্লেষণে প্রবেশ করার আগে কয়েকটা মূল পরিসংখ্যান বলে নেওয়া যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশীয়দের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ, তার ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ভারতীয়। ভারতীয়দের মধ্যে ভাষাগত গোষ্ঠীগুলি এই রকম—হিন্দিভাষীরা হল সর্ববৃহৎ গোষ্ঠী (১ লক্ষ ৩০ হাজার), তার পরে গুজরাতি (৩৭ হাজার), পাঞ্জাবি (১৯ হাজার), বাঙালি (১৩ হাজার), মালয়ালি (১১ হাজার), তামিল (১০ হাজার পাঁচশো) ও অন্যান্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশীয় জনসংখ্যার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত বৃদ্ধি। ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়া থেকে মাত্র ৭৬২৯ জন ওখানে গিয়েছিল। ১৯৬৫ সালের মধ্যেই বার্ষিক প্রায় তিন হাজার দক্ষিণ এশীয় মার্কিন দেশবাসী হচ্ছিল, ১৯৮৫ সাল নাগাদ সংখ্যাটা গিয়ে ঠেকল বার্ষিক ৩০ হাজারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনৈতিকভাবে ভারতীয়দের এত ভালো করার কারণ কি? প্রথম কারণ টেকনিকাল। মার্কিন দেশে ভারতীয় জনসংখ্যায় ১৫ থেকে ৪৪ বৎসর বয়সের অনুপাত শতকরা ৭২—অন্য সব জনগোষ্ঠীর চেয়ে তা অনেক বেশি। অর্থাৎ ভারতীয়দের একটা অতি বৃহৎ অংশ কর্মক্ষম বয়সের, যা স্পষ্টতই তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার একটা বড় কারণ।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল তাদের অসাধারণ শিক্ষার মান। ১৯৮০ সালে ভারতীয়দের মধ্যে হাইস্কুল উত্তীর্ণের অনুপাত ছিল শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, চীনা ও ফিলিপিনোদের উক্ত অনুপাতের চেয়ে বেশি। এদিক থেকে কোরীয়রা ছিল ভারতীয়দের কাছাকাছি, কেবল জাপানিরা ছিল ভারতীয়দের থেকে এগিয়ে।

ভারতীয় শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিফলন ঘটেছে তাদের জীবিকায়। ভারতীয় পুরুষদের শতকরা ৪২ ভাগ রয়েছে পেশাগত কাজে (যেমন এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, গবেষণা, ইত্যাদিতে), শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মাত্র ১০ ভাগ। ভারতীয় মেয়েদের শতকরা ২৭ ভাগ রয়েছে অনুরূপ কাজে, অথচ শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের মাত্র ১৩ ভাগ।

Xenos, Barringer ও Levin অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষাগত ও পেশাগত মানের উল্লেখ করেছেন 'শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ভারতীয় গড়পড়তা শিক্ষাগত যোগ্যতা অবশ্যই অনেক উঁচু'। তারপরে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তুলেছেন। ভারতীয়দের শিক্ষার মান যদি শ্বেতাঙ্গদের সমান হত তাহলে কি তারা শ্বেতাঙ্গদের সমান উপার্জন করতে পারত? পরিষ্কার জবাব, না। সমান শিক্ষাসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ আর ভারতীয়দের মধ্যে শ্বেতাঙ্গরাই উপার্জন করে বেশি। তাতে বোঝা যায় চাকরির বাজার মার্কিনী এশীয়দের প্রতিকূল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তুলনায় দক্ষিণ এশীয়রা তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনেকটাই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। 'পরিসংখ্যানগত ভাবে (যেমন আয়ের দিক থেকে) তারা অন্য যেকোনো বিদেশাগতের চেয়ে অনেক বেশি সমতা অর্জন করেছে মার্কিনীদের সঙ্গে, অথচ সংস্কৃতি ও সামাজিক আচারের দিক থেকে তারা বৈসাদৃশ্য বজায় রেখেছে সবচেয়ে বেশি...'। ভারতীয় পরিবারের সংবদ্ধতা শুধু যে মানসিক স্থৈর্য দিয়েছে তাই নয়, অর্থনৈতিক প্রগতিতেও সহায়তা করেছে (যেমন ঘটেছে ব্রিটেনের পরিবারভিত্তিক ব্যবসায়গুলিতে)।

এ সব ব্যাখ্যার পর প্রশ্ন ওঠে—কেন আমরা দেশের মাটিতে এত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ অথচ অন্যত্র এমন সফল? এক ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ একবার এ বিষয়টির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার মানে ভারতের অর্থনৈতিক দুঃস্থতার কারণ ব্যক্তিগত ক্ষমতার অভাব নয়—ব্যবস্থার সমস্যা, সাংগঠনিক ব্যর্থতা।

উক্ত অনুমানটির পাল্টা যুক্তি আছে, তবে লঘুভাবে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্ন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজার, ক্ষমতা ও সামাজিক অনুশাসন

ভূমিকা

অর্থনীতির একটি মৌলিক উপপাদ্য অ্যাডাম স্মিথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বারে বারে পরিমার্জিত হয়ে চলেছে

প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার নিজ স্বার্থমুখী উপযোগিতাকে সর্বাধিক ক'রে তোলে তাহলে, কতগুলি শর্তসাপেক্ষে, সমাজ আপনা থেকেই কাম্যতা (optimality) অর্জন করবে।

এটাই বোধ হয় অর্থনীতির সবচেয়ে বিতর্কিত, সবচেয়ে ব্যবহৃত ও অপব্যবহৃত উপপাদ্য। এর ব্যাখ্যায় বিচিত্র উদ্ভাবনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। অবাধ অর্থনীতিতে (laissez-faire) বিশ্বাসীরা 'কতগুলি শর্তসাপেক্ষে' কথাগুলি নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। আর কট্টর নিয়ন্ত্রণবাদীরা ঐ কথা কটি ছাড়া আর কিছু মোটে লক্ষ্যই করেন না, তাঁদের মতে ওগুলোর ফলে পুরো উপপাদ্যই অকেজো হয়ে গেছে।

এই মৌলিক প্রতিজ্ঞাটির ভ্রান্ত-ব্যাখ্যার প্রবণতা জন্ম নেয় এই ব্যাপক ধারণা থেকে যে, প্রতিজ্ঞাটি স্বীকার করবার অর্থই হল একটি বিশেষ মতাদর্শগত অবস্থান গ্রহণ করা। অথচ প্রত্যক্ষবাদী (positive) অর্থনীতির বেশির ভাগ উপপাদ্যের মতোই এ উপপাদ্যটিও মতাদর্শ-নিরপেক্ষ এটা গ্রহণ করলেই কোনো বিশেষ অনুশাসনমূলক (normative) মতবাদের অনুসারী হয়ে পড়তে হয় না। এটা ডেভিড হিউমের সুপরিচিত একটি নিয়মেরই প্রত্যক্ষ পরিণাম।

বাজার ব্যবস্থার ভূমিকা শুধু পুঁজিবাদী নয়, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ। এর সত্যতা সবিশেষ অনুভূত হয় তৃতীয় বিশ্বে—যেখানকার স্বাভাবিক প্রবণতা হল দাম বাঁধা, লাইসেন্স প্রবর্তন আর আমদানি ঠেকানোর দিকে। 'সব কিছু বাজারের উপর ছেড়ে দাও' ধরনের যে সব মতান্ধ ফতোয়া অর্থনীতির এই মৌলিক উপপাদ্যের নামে মধ্যে মধ্যেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর জারি করা হয় সেগুলোতে এর কোনো পরিবর্তন হয় না। সমাজের সুবিধার্থে বাজারকে ব্যবহার করতে গেলে তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।[১]

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত যুক্তিশীলতা অবধারিতভাবে দক্ষতা সুনিশ্চত করে, দিল্লির চাঁদনি চক দিয়ে একবার গাড়ি চালিয়ে গেলে তাঁদের বিশেষ জ্ঞানলাভ হবে। উল্টো দিক দিয়ে ওভারটেক করা, অন্য গাড়ির গা ঘেঁষে যাওয়া, জেব্রা ক্রসিং দেখলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথচারীদের পিলে চমকে দিতে গতি বাড়িয়ে দেওয়া—ড্রাইভারদের ব্যক্তিগত যুক্তিশীলতা ও উদ্যমের ইত্যাকার নানা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তের পরিণাম হয় চরম বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে যে যুক্তিশীল জনসমষ্টির 'অদৃশ্য হাত'-এর সঙ্গে ট্র্যাফিক পুলিশের দৃশ্য হাত যুক্ত হওয়া একান্ত দরকার সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

মূল্য ব্যবস্থা (Price mechanism) দক্ষভাবে কাজ করতে না পারার নানা কারণ সুবিদিত। তাদের পক্ষে পড়ে অনাভ্যন্তরিকতা, non-convexties ও discontinuities। এখানে আমি উক্ত মৌলিক প্রতিজ্ঞাটির কিছু মৌলিক ও 'সামাজিক' সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। প্রতিজ্ঞাটির লৌকিক সূত্রায়ণে এই সব সীমাবদ্ধতা উপেক্ষিত হয়, অথচ আমাদের কর্মপন্থাগত ও প্রস্তাবের মূলে থাকে ঐ মৌলিক সূত্রায়ণই।

প্রথমত, বাজারের মধ্যে সামাজিক অনুশাসন ও নীতির ভূমিকা আলোচিত হবে। এ বিষয়ে ছবি আকর্ষণ করা হবে যে মুক্ত বাজারের কার্যকারিতার একটা পূর্বশর্ত আছে। তা এই যে, সমাজের ব্যক্তিরা কিছু অভিন্ন মৌলিক অনুশাসনের অনুসারী অর্থাৎ প্রত্যেকে যে সম্ভবপর set-এর মধ্যে তার স্বার্থপরতার হিসাব প্রয়োগ করে তা প্রথম থেকেই কিছু সামাজিক অনুশাসন দ্বারা সীমাবদ্ধ (যেমন একজন যে সব বৃত্তির মধ্য থেকে নিজের সর্বোত্তম বৃত্তিটি বেছে নেয় চৌর্য তার অন্তর্ভুক্ত নয়)। দ্বিতীয়ত, এটা দেখানো হবে যে একটি atomistic বাজারে পারস্পরিক অনুমান ও অনুমোদনের (sanction) শাখাজাল মারফৎ কিছু সামাজিক অনুশাসন, রীতি, এমন কি ক্ষমতা-কাঠামোও টিকিয়ে রাখা যায়। এই ধরনের অনুমানগুলি বাঞ্ছনীয় ও অবাঞ্ছনীয় উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠানকেই টিকিয়ে রাখতে পারে এবং তদ্দ্বারা বাজারকে সবল বা দুর্বল করে দিতে পারে। এ যুক্তি বহুকাল যাবৎই উঠছে যে বাস্তব জীবনের অর্থনীতি বুঝতে গেলে—বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলিতে—আমাদের বিধিবদ্ধ (formal) মডেলগুলিতে প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতা সম্পর্কসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই নিবন্ধে যে পদ্ধতি আমি অনুসরণ করেছি তা ওগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করারই একটি প্রয়াসমাত্র।

এতে যেসব ধারণা আলোচিত হয়েছে সেগুলোর কিছু কিছু ইতিমধ্যেই বিধিবদ্ধ (formalized) হয়ে গেছে ; 'গেম থিওরি'র সাম্প্রতিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তা আরো হতে থাকবে। তবে এখানে আমি অত কঠোর লিখনশৈলী অবলম্বন করিনি।

সামাজিক বিধান

কিছুদিন আগে London Magazine-এ Adewale Maja-Pearce (১৯৮৪, পৃ ৬১) লাগোস-এর একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন

> দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বচসা হচ্ছিল। ঘটনা অনেক দূর গড়িয়ে গেল, ভাঙল একটা জানালা। কে একজন পুলিশে খবর দিল। পুলিশ এল আধ ঘন্টা বাদে, রাস্তার মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ডেকে পাঠাল লোক দুটিকে, হুকুম দিল পাল্লা দিয়ে দর হাঁকতে। একজন ২০০ পর্যন্ত উঠল, অন্যজন হার মানল। প্রথম ব্যক্তি টাকা দিয়ে ছাড়া পেল। অন্যজন এমন মার খেল যে তাকে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরতে হল। সর্বাধিক উপযোগিতার জন্য পুলিশের আগ্রহ এখানে সন্দেহাতীত। অথচ তাদের আচরণ সামাজিক কাম্যতার সহায়তা করছে, এমন ভাবা কেবল মুষ্টিমেয় কিছু কাঠগোঁয়ারের পক্ষেই সম্ভব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বাধিকপন্থী আচরণের থেকে ভিন্ন প্রকার আচরণ যে শুধু সত্য তা-ই নয়, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর-ব্যবস্থা—আরো সাধারণ ভাবে, সমাজ—চালু রাখার জন্য অপরিহার্যও। বাজারও করতে গিয়ে পুলিশ কর্মচারীরা সর্বাধিক উপযোগিতা সন্ধান করুক, কিন্তু উপরোক্ত দৃষ্টান্তের মতো তারা যদি ডিউটির সময়েও তা-ই করে তাহলে সমাজের পক্ষে তার পরিণাম বিপর্যয়কর হতে পারে।

সামাজিক অনুশাসনের প্রশ্নে প্রবেশ করার আগে আমি মানব-যুক্তিশীলতার কিছু কিছু লৌকিক সূত্রায়ণে যে দার্শনিক ভ্রান্তি দেখা যায় সে দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বিশেষত, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযোগিতা সন্ধান করে—এই চলতি কথাটা অর্থহীন হওয়া সম্ভব।[২] কোনো ব্যক্তি সর্বাধিক উপযোগিতা হাসিল করছে, এমন কথা বলার আগে পরিষ্কার বলতে হবে উপযোগিতা অপেক্ষকটি কোন ক্ষেত্রের জন্য সংজ্ঞায়িত, 'প্রত্যেক ক্ষেত্রে' কথাগুলির দ্বারা ক্ষেত্রটি সুষ্ঠভাবে সংজ্ঞায়িত হয় না। আমরা আজ জানি যে প্রসিদ্ধ রাসেল কূটাভাসের মূলে ছিল নিখিল (universal) সেট-এর (যে সেটে সব কিছু আছে) প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি। প্রাথমিক সেট তত্ত্ব দ্বারাই প্রমাণ করা যায় যে এমন কোনো সেট নেই যাতে সব কিছু অন্তর্ভুক্ত।

বিধিবদ্ধ (formal) সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব (general equilibrium theory) এ গোপ্পদে ডোবেনি। Individual উপযোগিতা অপেক্ষকগুলি তাতে সংজ্ঞায়িত একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে—অ-ঋণাত্মক কিংবা n-মাত্রাসম্পন্ন ইউক্লিডীয় স্থানে। সম্ভবপর সেটগুলি হল বাজেট বহুতলকসমূহ অথবা, দ্বিমাত্রিকতার বিশেষ পরিস্থিতিতে, সুপরিচিত বাজেট ত্রিভুজসমূহ।[৩] তারপর তা প্রমাণ করে যে লোকেরা যদি উপযোগিতাকে সর্বাধিক করে তোলে—অর্থাৎ নিজেদের বাজেট সেটগুলির মধ্য থেকে কাম্যতমটি নির্বাচন করে—তাহলে (কতগুলি শর্তসাপেক্ষে) সমাজ 'পারেতো কাম্যতা' (Pareto Optimality) অর্জন করে। এ সিদ্ধান্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে—শুধু লোকেরা তাদের সম্ভবপর সেটগুলির উপর সর্বাধিক উপযোগিতার হিসাব প্রয়োগ ব্যর্থ হলেই নয়, সে হিসেব যদি তারা তাদের সম্ভবপর সেটগুলির বাইরে প্রয়োগ করতে যায়, তাহলেও।[৪]

সাধারণ ভারসাম্যের মডেলে একজন যে আরেকজনের জিনিস চুরি করে না তার কারণ সে কাজ তার সম্ভবপর সেট-এর মধ্যে পড়ে না। এ কাজে তার উপযোগিতা বাড়ত কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। ব্যক্তির সম্ভবপর সেটকে আমরা যদি এমনভাবে সম্প্রসারিত করি যাতে সে পরিভোগ-সমাবেশ পছন্দ করা ছাড়াও পরের দ্রব্য চুরি করবে-কি-করবে-না তা-ও ঠিক করতে পারে, তাহলেও পারেতো অপটিম্যালিটি অর্জিত হবে কিনা সে কথা স্পষ্ট নয়। আমার অনুমান, হবে না কারণ শ্রমিক সংখ্যার একাংশকে উৎপাদনশীল কর্ম থেকে সরিয়ে আনতে হবে পুলিশ বাহিনী বানানোর জন্য (এবং এটাই বাস্তবে ঘটছে)। এখানেই সামাজিক অনুশাসনের মোক্ষম গুরুত্ব। পাহারাদার ছাড়াই তা লোকের কাজকর্ম পাহারা দেয়।

কতগুলি মূল সামাজিক অনুশাসন মেনে চলার উপর আমাদের বাজারগুলো যে কতখানি নির্ভরশীল তা আমরা সবসময় হৃদয়ংগম করি না। বলতে গেলে সব অর্থনৈতিক লেনদেনেই ঠকানোর সুযোগ থাকে—কারণ দু পক্ষের কর্তব্য সমাপনের মধ্যে, যত কমই হোক, একটা সময় ব্যবধান থাকেই। নাপিত আগে চুল কাটে, তারপর পয়সা পায় সিনেমা হলে আগে টিকিট কেটে তারপর ছবি দেখতে হয়। সর্ব ক্ষেত্রেই এক পক্ষের সুযোগ থাকে অন্যের পাওনা না মেটানোর। 'ক' ব্যক্তি 'খ' ব্যক্তিকে 'গ' দিচ্ছে, তারপর 'খ' ব্যক্তি 'ক' ব্যক্তিকে 'ঘ' দিচ্ছে। প্রশ্ন হল, 'ক' তার দেয় দেবার পরে 'খ' কেন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্তব্য পালন করছে ? দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, স্বার্থ—লোক ঠকালে শেষ পর্যন্ত তার বেশি লোকসান হয়ে যেতে পারে, পুলিশি ঝামেলার দরুন কিংবা বদনামের ঠেলায় খদ্দের হারানোর দরুন। দুই, সামাজিক অনুশাসন—লাভ লোকসান নির্বিশেষে চুক্তি ভঙ্গ না করাটা হয়তো তার সামাজিক অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। এর নাম দেওয়া যেতে পারে চুক্তি পালনের অনুশাসন।

আমি অন্যত্র (Basu,) ১৯৮৪ বিস্তারিতভাবে যুক্তি দেখিয়েছি যে একটা অর্থনীতির নির্বাধ সচলতা অন্তত অংশত নির্ভর করে চুক্তি পালনের অনুশাসনের উপর। স্বার্থ ও পুলিশ ভীতি দিয়ে সব সময় ব্যাখ্যা করা যায় ব্যাংকের কেরানি কেন আপনার চেক ও টাকা দুই-ই পকেটস্থ করে আপনাকে কেটে পড়তে বলে না।[৫]

সমাজে-সমাজে চুক্তি পালনের অনুশাসনের তারতম্য ঘটে ; কোনো কোনো ধরনের লেনদেনে থাকে না। বোম্বাইয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা সাধারণত যাত্রীদের সবচেয়ে সোজা পথেই গন্তব্যস্থলে নিয়ে যায়, দিল্লিতে সাধারণত তামাম শহর ঘুরিয়ে। পালাম বিমানবন্দর থেকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে এক বিদেশি অধ্যাপককে দু-বার লাল কেল্লা দেখতে হয়েছিল।

চুক্তিপালনের অনুশাসন দুর্বল হলে বাজার ঠিকমতো চলে না, এমন কি তা অস্তিত্বও সম্ভব না হতে পারে। বাজারে অনস্তিত্ব অবশ্য চট করে ধরা পড়ে না, তবে তার ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়ার বহু প্রমাণ আছে। আমি এখানে গ্রামীণ ঋণ বাজারের দৃষ্টান্ত দেব।

গ্রামীণ ঋণের বাজারে চুক্তিভঙ্গের সমস্যা অতি প্রবল। তবু গ্রামীণ অর্থনীতির উপর তার প্রভাব সব সময় সঠিকভাবে স্বীকৃত হয় না। একটি বহুপ্রচলিত তত্ত্ব—যার ভিত্তি হল উত্তমর্ণের ঝুঁকি প্রকল্প—ভারত ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের গ্রামাঞ্চলে সুদের উচ্চ হারকে ব্যাখ্যা করতে চায় মূলধন মার যাওয়ার ঝুঁকি দিয়ে। এই প্রকল্প (Bottomley ১৯৭৫) অনুযায়ী পশ্চাৎপদ কৃষিতে এ ঝুঁকি খুবই বেশি, এবং সুদের উচ্চ হার এই ঝুঁকিটাই পুষিয়ে দেয় মাত্র। ঝুঁকির খরচ বাদ দিলে যে কার্যকর হার বেরিয়ে আসে তা বেশ যুক্তিযুক্ত, সংগঠিত ক্ষেত্রগুলির হারের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রকল্পটি তত্ত্ব ও তথ্য উভয় দিক থেকেই সমালোচিত হয়েছে (Bhaduri, ১৯৭৭ ; Raj, ১৯৭৯ ; Basu, ১৯৮৪ ক)। রাজ প্রমাণ দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষে দেনা ফাঁকির ঘটনা খুবই বিরল। এ থেকে যদি এক লাফে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় যে চুক্তি পালন বা চুক্তিভঙ্গ গ্রামীণ ঋণের বাজারে কোনো প্রভাবই ফেলে না। তা হবে ভ্রান্ত। বাস্তবে ফাঁকি প্রায় থাকলেও সম্ভাব্য ফাঁকির ঝুঁকি বাজার গঠনে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এত কম ফাঁকির কারণ সুপরিণত চুক্তিপালনের অনুশাসন নয় কারণ হল, মহাজন এমন লোকদেরই ধার দেয় যাদের উপর তার নিয়ন্ত্রণ আছে এবং যাদের দেনা শোধে বাধ্য করা যায়। ব্যবসায়ী ধার দেয় তার দোকানের নিয়মিত খরিদ্দারকে, জমিদার ধার দেয় তারই জমিতে যারা কাজ করে তাদের।

এর তাৎক্ষণিক অর্থ হল, ঋণ-বাজারের চরম বিখণ্ডীভবন এবং প্রতিটি খণ্ডে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ (এর তথ্যগত প্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্য Chandavarkar, 1965)। ফলে সুদের হার সাংঘাতিক চড়া হয়ে দাঁড়ায় এবং একই এলাকায় তার বিপুল তারতম্য হতে পারে (তথ্যগত প্রমাণ Griffin, ১৯৭৪)। মোট কথা, সত্যিকারের ঋণ-বাজারের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এক গ্রামে হয়তো লভ্য ঋণের দারুণ অভাব, তবু সেখানে পর্যাপ্ত নগদসম্পন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের গ্রাম থেকে ঋণের যোগান আসবে না।

মূল সমস্যাটা হল ঋণ-বাজারে চুক্তিপালনের অনুশাসনের অভাব। এর অর্থ হল এই নয় যে গ্রামীণ ঋণ-বাজারে দেদার দেনা ফাঁকি চলছে, ব্যাপারটা আরো পরোক্ষ। এর অর্থ, যার উপর নিয়ন্ত্রণ নেই তাকে কেউ ধার দেয় না। তার মানে ঋণের বাজারে প্রতিযোগিতা সীমিত, তা অত্যন্ত বিখণ্ডিত ও অদক্ষ।[৬]

আমরা দেখলাম যে, সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় কোনো কোনো ধরনের আচরণ ব্যক্তিকে দিয়ে করানো যায় পুলিশের দ্বারা কিংবা সামাজিক অনুশাসন দ্বারা। তৃতীয় একটি পদ্ধতিও আছে—সামাজিক অনুমোদনের জাল মারফৎ। তবে এ চিন্তাটি আগে আমি ক্ষমতা-কাঠামো ও রীতির প্রসঙ্গে ফুটিয়ে তুলব, তারপর কথা বলব সামাজিক অনুশাসন সম্পর্কে।

ক্ষমতা

অনেকে বিশ্বাস করেন যে কোনো সামাজিক রীতির প্রয়োজন থাকলেই তবে তার উদ্ভব ঘটে। আমি এটা মেনে নেওয়ার কোনো জোরালো কারণ খুঁজে পাই না। তবে উদ্ভবের কারণ যা-ই হোক, রীতিগুলি যে সকলের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ালেও টিকে থাকে, এটা সত্য। Akerlof (১৯৭৬) তা প্রতিপন্ন করেছেন এবং এর কথাই Sen (১৯৮৫, পৃ ১) বলেন যখন তিনি লেখেন 'কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমাজ সংগঠিত হয়ে যাওয়ার পরে ব্যক্তির নিকট সেই প্রতিষ্ঠানের মূল্য, আর সমাজ অন্যভাবে সংগঠিত হলে সমাজের ও সেই ব্যক্তির অবস্থা যা দাঁড়াত, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে।'[৭]

এই ধরনের যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে সমাজে 'ত্রিপদী' (triadic) সম্পর্কের অস্তিত্বের উপর। এ রকম সম্পর্কের গুরুত্ব বহু কাল আগেই লক্ষ্য করেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা, এ বিষয়ে প্রথম কাজ হল George Simmel-এর (১৯৫০)। ঢিলেঢালাভাবে বলা চলে যে 'ক' আর 'খ'-এর সম্পর্ক যখন অসম্পৃক্ত কোনো তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে উপর নির্ভরশীল হয় তখন 'ক' ও 'খ'-এর সম্পর্ককে মেনে নিলে বাস্তব জীবনের অনেক রকম অভিজ্ঞতা আমাদের বিশ্লেষণের আওতায় এসে পড়ে (দ্রষ্টব্য Akerlof, ১৯৮৪ ; Basu ১৯৮৬ ; Platteau ও Abraham, ১৯৮৭। অতঃপর আমরা দেখাতে পারি ব্যক্তিরা সবাই নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করলেও পারেতো কাম্যেতর (sub optimal) ভারসাম্য কেমন করে টিকে যেতে পারে।

সনাতন অর্থনীতির বেশির ভাগটাই 'দ্বিপদী' (sub optimal) (অর্থাৎ মানুষের জোড়ায়-জোড়ায় অন্তঃক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত) হলেও বাস্তবে ত্রিপদী সম্পর্কের প্রমাণ প্রচুর এবং আমি ইতিপূর্বে দেখিয়েছি (Basu, ১৯৮৬) যে তা থেকে কোনো কোনো ক্ষমতা-কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা মিলতে পারে। একটা সহজ উদাহরণ দিই। ধরুন, কোনো দেশের রাজাকে কেউ পছন্দ করে না। সেই রাজা আইন করে দিয়েছেন, প্রত্যেককে তার উৎপন্নের একাংশ দিতে হবে আর রাজা তা নিজের বিলাস-ব্যসনে ওড়াবেন। কোনো প্রজা রাজাকে তার ভাগ না দিলে 'আনুগত্যহীন' বলে চিহ্নিত হয়। আবার যে ইতিমধ্যে আনুগত্যহীন বলে চিহ্নিত হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও আনুগত্যহীন আখ্যা পেতে হয়।[৮] এবার ধরুন প্রত্যেকের বিশ্বাস, অন্য সকলে রাজার প্রতি অনুগত থাকতে চায়। সেক্ষেত্রে সমাজ কর্তৃক একঘরে হওয়া যদি যথেষ্ট যন্ত্রণাকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় তাহলে রাজা সরাসরি কোনো সাজা না দিলেও প্রত্যেকে তার ভাগ রাজাকে দেবে। কারণ প্রত্যেকেই ভাবছে যে তা না হলে সে আনুগত্যহীন বিবেচিত হবে এবং অন্যেরা তাকে একঘরে করে দেবে নিজেরা একঘরে হওয়ার ভয়ে। এই ধরনের বিশ্বাস চালু থাকলে প্রত্যেকেই কড়াকড়িভাবে তার উৎপন্নের ভাগ রাজাকে দেবে ও আনুগত্যসম্পন্ন বলে প্রতীয়মান হবে, এবং এইভাবে প্রতিপন্ন হবে (বা খণ্ডিত হবে না) সেই প্রারম্ভিক বিশ্বাস যে প্রত্যেকে আনুগত্যসম্পন্ন হয়েই থাকতে চায়।

অবশ্য উপরের দৃষ্টান্তে রাজা থাকারও দরকার নেই। এমন একটা আচার প্রচলিত থাকলেই চলে যে সবাইকে উৎপন্নের একাংশ ফেলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নৃতাত্ত্বিকরা তেমন প্রথার বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। উপরের যুক্তিধারা দিয়ে এই জাতীয় আচারের টিকে-থাকা ব্যাখ্যা করা যায় Akerlof (১৯৭৬) ভারতের মতো বর্ণ-সমাজসমূহের (caste societies) কিছু কিছু আচরণ মোটামুটি এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় কিভাবে এক দল লোক কিছু পারস্পরিক অনুমানের কারণে এক নিম্নমানের ভারসাম্যের ফাঁদে আটকে পড়তে পারে। এই ধরনের ঘটনা আমাদের নজরে পড়ে না আমরা এগুলোর মধ্যেই বাস করি বলে। এগুলো বিরল বলে নয়। বর্ণ সম্পর্কবিলীতে (caste relations) (Akerlof, ১৯৭৬), ঋণ-সম্পর্কবিলীতে (Plattean ও Abraham, ১৯৮৫) ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুমান ও ত্রিপদী সম্পর্কবিলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, প্রতিবাদী চেকোশ্লোভাক নাট্যকার এবং রাজনীতিবিদ Vaclav Havel (১৯৮৫) দেখিয়েছেন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একনায়কের ভূমিকা পালন না করলেও কিভাবে একনায়কতন্ত্র থাকতে পারে। প্রত্যেক নাগরিক আনুগত্যহীন বলে চিহ্নিত ও উৎপীড়িত হওয়ার ভয়ে ব্যবস্থার নিয়ম মেনে চলে। যারা উৎপীড়ন করে তারাও তা করে নিজেরা আনুগত্যহীন বলে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে। এইভাবে প্রত্যেকে তার নিজস্ব যুক্তিশীল আচরণ দ্বারা এমন একটি শাসনব্যবস্থা টেকাতে সাহায্য করে যা হয়তো সে নিজেই চায় না। অনুরূপভাবে একজন নেতার চারপাশের লোকরা অনেক সময় আনুগত্যের ভান করে অন্যদের দ্বারা একঘরে হওয়ার ভয়েই। আবার অন্যেরাও তাকে একঘরে করবে নিজেরা একঘরে হওয়ার ভয়ে।

এখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে যারা কোনো রীতি বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা মেনে চলছে তারা সবাই তা অপছন্দ করে। বাস্তব অবশ্য কদাচিৎ এত বিশুদ্ধ রূপে দেখা দেয়। তবু, যারা কোনো রীতি বা শাসন-ব্যবস্থা থেকে সরাসরি সুবিধা লাভ করে তাদের সঙ্গে মিশে কিছু লোক কিভাবে আনুগত্যের ভান করতে পারে। সেটা অন্তত উপরের যুক্তির সাহায্যে বোঝা যেতে পারে। কোনো সামাজিক রীতি বা শাসনব্যবস্থার খপ্পর থেকে মানুষকে বের করে আনতে গেলে এই দুই ধরনের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রেষণা (motivation) লাগবে—যদিও আচরণের দিক থেকে তারা পার্থক্যবিহীন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা ঘাটে। দুটো দেশ হয়তো একই শক্তিজোটের অংশ, আচরণেও এক, তবুও তাদের নিগূঢ় প্রেষণা হয়তো একেবারেই আলাদা। একটির হয়তো জোটটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাযুজ্য আছে, অন্যটা হয়তো তাতে রয়েছে রণনৈতিক কারণে, পরোক্ষ সুবিধাদির জন্য।

একটু প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে লক্ষ্য করা যেতে পারে, ত্রিপদী সম্পর্কগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এবং তা থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতি ও রাজনীতির অঙ্গাঙ্গী যোগের ব্যাখ্যা মেলে। একটা সহজ দৃষ্টান্ত। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিল যে বাংলাদেশ যদি কিউবায় পাট রপ্তানি বন্ধ না করে তাহলে তার জন্য মার্কিন খাদ্যশস্যের যোগান বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাংলাদেশ নতিস্বীকার করল, মার্কিন খাদ্যশস্যের যোগান চালু রইল। এ রকম উদাহরণ ভূরি ভূরি, তবে অন্তঃক্রিয়ার ত্রিপদী চরিত্র প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীর সৌভাগ্য যে বাংলাদেশ কিউবায় পাট রপ্তানি করছিল, পরে তা বন্ধ করে দিল। অথচ হুমকির সম্ভাবনা আগে ভাগে ধরে নিয়ে বাংলাদেশ যদি কোনোদিনই কিউবায় রপ্তানি না করত তাহলে ত্রিপদী অন্তঃক্রিয়া আমাদের চোখেই পড়ত না, কেন না কিউবা মোটে আসতই না ব্যাপারটার মধ্যে।

গ্রামীণ সম্পর্কবিলীতেও অনুরূপ সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ত্রিপদী সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন থাকার দরুণ চট করে চোখে না-ও পড়তে পারে। হুমকিগুলো তো সবাই জানে, অতএব তারস্বরে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন কি? তৎসত্ত্বেও এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ওগুলো।

এতক্ষণ শুধু ক্ষতিকর অনুমানের কথাই আলোচিত হল, কিন্তু একইভাবে আমরা এমন স্বপোষক অনুমানের কথাও চিন্তা করতে পারি যা সমাজের পক্ষে হিতকর। অনুকূল অনুমানের দ্বারা পরিপোষিত ব্যবস্থার সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হল টাকা। আমরা টাকা গ্রহণ করি কারণ আমাদের অনুমান অন্যেরাও তা গ্রহণ করবে। অন্যেরাও একই রকম অনুমানের ভিত্তিতে তা গ্রহণ করে এবং একইভাবেই অনুমানগুলি স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এই অনুকূল অনুমান ব্যতীত আমাদের কোনো বিনিময়-মাধ্যম থাকত না। আধুনিক সমাজও সম্ভব হত না দ্রব্য-বিনিময়ের (barter) সমাজে লোকেরা ভাবতেই পারে না টাকা না থাকায় কি তারা হারাচ্ছে। এটা চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব যে অনুকূল অনুমানের অভাবে এমন অনেক সম্ভবপর ও হিতকর ব্যবস্থা হয়তো আমাদেরও নেই এবং আমরা তা জানিও না। যে কারণে অন্ধের দেশে চাক্ষুষ জগতের কোনো প্রমাণ থাকবে না, ঠিক সেই কারণে এরও কোনো প্রমাণ আমরা দেখতে পাই না। অতএব আমাদের সমাজে দৃশ্য অকাম্যতার পাশাপাশি হয়তো এমন মৌলিক অকাম্যতাও আছে যেগুলো এত গভীর যে আমরা সেগুলোকে টেরও পাই না।

এবার সামাজিক অনুশাসনের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। এখন সহজেই বোঝা যাবে যে এগুলোর পাহারাদারিও অংশত হতে পারে উপরিবর্ণিত পারস্পরিক অনুমান ও অনুমোদন মারফৎ। একটা সমাজ ভাবা যাক, যাতে লোকেরা কতগুলি বাঞ্ছনীয় সামাজিক অনুশাসন আপনা থেকে মানে না, মানে কেবল নিজেদের স্বার্থে। আমি শুধু বলতে চাই যে মানাটা তাদের স্বার্থানুকূল করে তোলা যায় দুভাবে না-মানাকে পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করিয়ে অথবা অন্যদের ঘৃণা ও নিন্দার বিষয়ে পরিণত করে।

পুলিশি পদ্ধতি অনুমোদনের পদ্ধতির চেয়ে অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া তার সঙ্গে নিত্য জড়িত সেই প্রশ্ন পাহারাদারকে পাহারা দেয় কে? মোট কথা শেষ পর্যন্ত হয়তো সেই অনুমোদনেরই ভরসা করতে হয় এবং সেটাই হয়তো দক্ষতার পদ্ধতি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রবৃদ্ধি-প্রবণতার সঙ্গে বোধ হয় যথোচিত সামাজিক অনুশাসন অনুমোদনের অস্তিত্বের একটা যোগাযোগ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো সমাজে যদি কঠোর শ্রম প্রশংসিত হয় তাহলে প্রত্যেকেই কঠোর শ্রমে প্রবৃত্ত হতে পারে—শ্রম ভালো লাগে বলে নয়, প্রশংসা ভালো লাগে বলে। এর ফলে এমন কি এইসব সমাজ অবসর এত কমিয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনতে পারে যা তারা নিজেরাও চায় না।

প্রবৃদ্ধি-পোষক সামাজিক অনুশাসন করার জন্য পারস্পরিক অনুমোদনের পদ্ধতি ব্যবহারের একটা মুশকিল হল, বিশেষ বিশেষ অনুশাসনের উদ্ভব কিভাবে ঘটে সে বিষয়ে আমাদের কোনো সুদৃঢ় তত্ত্ব নেই। এটা বোঝা দরকার যে এ নিবন্ধে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি কিভাবে রীতি, প্রতিষ্ঠান শাসনব্যবস্থা বা সামাজিক অনুশাসন টিকে থাকে ; কিন্তু কেন ঐ বিশেষ রীতি বা সামাজিক অনুশাসন জন্ম তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ নিবন্ধে যা নির্মাণ করা হয়েছে তা হল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির টিকে থাকার তত্ত্ব, তাদের উদ্ভব বা উৎসের তত্ত্ব নয়। শেষোক্ত প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ, তবে অতি দুরূহ—তার জন্য দরকার সমাজবিজ্ঞান ছাড়াও ইতিহাসের জ্ঞান।

অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় আমি যা খাড়া করেছি তা হল বহুল (multiple) ভারসাম্যের একটি মডেল—অর্থাৎ এমন এক মডেল যা প্রতিষ্ঠানাদির সমাহার ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু ঠিক কোনো সমাহার বাস্তবে দেখা দেবে তা বলতে পারে না। কোনো কোনো সমাহারকে তা অসম্ভব বলেও প্রতিপন্ন করতে পারে, কিন্তু ঠিক কোনটা বাস্তবায়িত হবে তা বলতে পারে না। তবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল, তা প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেছে। বলছে যে, কোনো বিশেষ প্রথা—যেমন যৌতুক বা বৈধব্য—ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা যদি শুধু খুঁজি কে তাতে লাভবান হচ্ছে এবং তারপর দাবি করি যে তারাই প্রথাটা বজায় রেখেছে, তাহলে খুব ভুল হবে। প্রথার কারণ এখনও সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলেও প্রথা পালন ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে।

যে সমাধান-ধারণা (solution concept) বহুল সম্ভাবনার (multiple possibilities) আশা দেয়, অনন্যতা-ধর্মসমূহ (uniqueness properties) প্রমাণে নিরত কোনো বিষয়ে তা গ্রহণযোগ্য মনে না হওয়ারই কথা। কিন্তু আমার যুক্তি হচ্ছে, আমাদের অনন্যতা-অন্বেষণে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধরুন, 'বন্দীর উভয়সংকট' (prisoner's dilemma) খেলাটি সসীম-সংখ্যক বার খেলা হচ্ছে। প্রায় সব সুবিদিত সমাধান-ধারণা (যেমন subgame perfection বা rationalizability) এবং সব বাঁধা যুক্তি-ধারায় (যেমন পশ্চাৎমুখী আরোহ backward induction) বলা হয় প্রতিটি খেলাতেই খেলুড়েরা সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেবে। অথচ অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি (introspection) থেকে আমরা জানি যে খেলুড়েরা কিছুকাল সহযোগিতা করবে, অন্তত প্রথম দিককার খেলায়।[১০] উপরন্তু ঠিক কিভাবে খেলা হবে তা নির্ভর করবে, খেলুড়ে কারা, তার উপর। তাই যদি হয় তো আমার মনে হয় আমাদের এমন সমাধান-ধারণারই সন্ধান করা উচিত যা অনন্য নয়, যাতে একাধিক ফলাফলের অবকাশ আছে। না হলে তথ্যের সাক্ষ্য থেকে বোধ হয় আমরা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হতে বাধ্য সেটাই 'অনন্য' পরিণাম, ভাবতে খুব উৎসাহ পাওয়া কঠিন। খেলাগুলোর—এমন কি, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক তত্ত্বের—তথ্যকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুব বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে আমরা ঠিক কি ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে অক্ষম। সক্ষম হলেই তা বিস্ময়কর হত।

উপসংহার

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সূক্ষ্মদর্শী অর্থনীতিবিদেরা এ সম্বন্ধে চিরকালই অবহিত, তবু এ ক্ষেত্রে গবেষণা হয়েছে নগণ্য মাত্রায়। তার কারণ প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে তা অতি জটিল। তা ব্যাখ্যা করতে গেলে তত্ত্বের যে পরিশীলন দরকার অর্থনীতি তা সবে অর্জন করতে শুরু করেছে। এই বিশাল কর্মসূচীর একটা এক-নজর পরিচয় দেওয়াই ছিল এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

কোনো অর্থনীতির সনাতন মডেলটি হল প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষ—রীতি ও অনুশাসনের যদি কোনো ভূমিকা থাকেও তা নিষ্ক্রিয়।[১১] অনেক অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী তার সমালোচনা করেছেন, যুক্তি দিয়েছেন যে প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক মডেলের পরিণতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এ নিবন্ধে আমি আরো এক ধাপ এগিয়ে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছি যে সব অর্থনৈতিক মডেলই প্রাতিষ্ঠানিক অনুমিতি অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো স্পষ্টব্যক্ত হতে পারে, যেমন Akerlof (১৯৭৬) ; কিন্তু যেখানে সেগুলো স্পষ্টব্যক্ত নয়—যেমন সাধারণ ভারসাম্য মডেলে—তখনও সেগুলো থাকেই (দৃষ্টান্তস্বরূপ, চুক্তিপালনের অনুশাসনগুলি ব্যবহৃত হয় প্রচ্ছন্নভাবে)। এ বিষয়টার স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাহলে আমরা সচেতনভাবে বাস্তবসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক অনুমিতি বেছে নিতে পারি—নচেৎ প্রতিষ্ঠান-নিরপেক্ষ মডেল বানাতে গিয়ে এমন মডেল বানাব যার প্রাতিষ্ঠানিক অনুমিতিগুলি হবে প্রচ্ছন্ন ও অযৌক্তিক। রীতি ও বিধানকে আমাদের মডেলের আওতায় নিয়ে আসতে পারলে উন্মুক্ত হবে অর্থনৈতিক ফলাফল ব্যাখ্যার ও বিভিন্ন অর্থনীতির বিভিন্ন গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যার নতুন নতুন ধারা।

AMARBOI.COM

টীকা

১ নৈতিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্ত বাজারের সমালোচনামূলক মূল্যায়নের জন্য Sen (১৯৮৫) ও Gibbard (১৯৮৫) দ্রষ্টব্য।

২ Arrow (১৯৮২) Sen (১৯৮৩)।

৩ 'বাজেট সেট' হল একজন ব্যক্তিভোক্তা তার আয়ের সীমার মধ্যে দ্রব্য ও সেবার যত রকম সমাবেশ কিনতে পারে সেই সবগুলির সমাহার। পরিভোক্তা দ্রব্য ও সেবার দামকে প্রভাবিত করতে না পারলে একটি বাজেট সেটকে 'বহুতলক'-এর জ্যামিতিক রূপ দেওয়া যায়।

৪ অতএব লৌকিক নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্বের দাবি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ লোকে যদি শুধু তাদের বাজেট সেট বাছাইয়েই সর্বাধিক উপযোগিতা হাঁসিল না করে অন্যান্য ব্যাপারেও (ধরে নেওয়া যায় তা একটা সুনির্দিষ্ট সেট) তা-ই করে, তাহলে পারোতা কাম্যতা বিষয়ে আমরা আর নিশ্চিত হতে পারি না, কারণ আমাদের বিধিবদ্ধ উপপাদ্যগুলি সে সম্পর্কে নীরব।

৫ গেম থিওরিতে স্বার্থের সাহায্যে সহযোগিতা ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে অসহযোগিতামূলক খেলার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহযোগিতার উদ্ভব ঘটে অসীম পুনরাবৃত্তিতে। পশ্চাৎমুখী আরোহমুক্তি একটা বিরাট সংখ্যক সসীম-পুনরাবৃত্ত খেলায় সহযোগিতার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয় বলেই মনে হয়—যদিও এই জাতীয় খেলাই বাস্তব জীবনে, বিশেষত সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে, প্রাসঙ্গিক (Basu ১৯৮০ ; Schick, ১৯৮৪)। কিছু সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে এক ধরনের সসীম-পুনরাবৃত্ত খেলায় সহযোগিতা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তির সংখ্যা অন্তর্জনিষ্ণুভাবে প্রদত্ত (endogenously given) এবং অত্যন্ত বেশি, তা ছাড়া খেলায় থাকতে হবে একাধিক Nash ভারসাম্য।

৬ একটি আগ্রহজনক সদৃশ সমস্যা ওঠে North-এর (১৯৮৪) এই যুক্তি থেকে যে বিভিন্ন চুক্তিগত বন্দোবস্তের সঙ্গে বিভিন্ন লেনদেন-ব্যয় জড়িত থাকে। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে এই ব্যয় বাস্তবে সম্ভবত খুবই বেশি। তবু লেনদেনের সঙ্গে জড়িত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ ব্যয় উপেক্ষা করেছেন তিনি। চুক্তি বলবৎ করার ব্যাপারটা খুব বেশি ব্যয়সাপেক্ষ হলে চুক্তি না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বলবৎ করার খরচ নেই, অথচ বৃহৎ একটি ব্যয় ঠিকই আছে—না-হওয়া লেনদেনের ব্যয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭ এ নিবন্ধে সেনের মনোযোগের বিষয় হল এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান—বাজার।

৮ আনুগত্যহীনতার আরো যথাযথ ও কড়াকড়ি সংজ্ঞার জন্য দ্রষ্টব্য : Basu (১৯৮৬, পাদটীকা ৭)

৯ গ্রামীণ সমাজে ত্রিপদী সম্পর্কের ভূমিকা আমি আলোচনা করেছি পরিচ্ছেদ ৩, বসু (১৯৮৬)-তে।

১০ 'বন্দীর উভয়সংকট'-এর পুনরাবৃত্তিতে যে দার্শনিক প্রশ্নাবলী জড়িত তার আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Schick (১৯৮৪)।

১১ তাদের একমাত্র সম্ভবপর ভূমিকা হল ব্যক্তির পছন্দ প্রভাবিত করার ভূমিকা। কিন্তু সে পছন্দ যেহেতু প্রদত্ত (given) ও অপরিবর্তনীয়, রীতি ও অনুশাসনের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় ও আকর্ষণবিহীনই হয়ে দাঁড়ায়।

নির্দেশিকা

Akerlof, G. (১৯৭৬) 'The Economics of Caste and of the Rat Race and Other Woeful Tales', *Quarterly Journal of Economics, 90.*

—(1984), *An Economic Theorist's Book of Tales.* Cambridge University Press.

Arrow, K.J. (1982), 'A Cautious Case for Socialism', in Iriving Howe (ed), *Beyond the Welfare State,* Shocken Books.

Basu, K. (1980), *Revealed Preferences of Government,* Cambridge University Press.

— (1984), *The Less Developed Economy: A Critique of Contemporary Theory,* Basil Blackewll and Oxford University Press.

—(1984ক), 'Implicit Interest Rates, Usury and Isolation in Backward Agriculture', *Cambridge Journal of Economics,* 8.

— (1986), 'One Kind of Power', *Oxford Economic Press* 38.

Bhaduri, A (1977), 'On the Formation of Usurious Interest Rates in Backward Agriculture', *Cambridge Journal of economics,* 1.

Bottomley, A. (1975), 'Interest Rate Determination in Underdeveloped Rural Areas', *American Journal of Agricultural Economics, 57.*

Chandavarkar, A. (1965), 'The Premium for Risk as a Determinant of Interest Rates in Underdeveloped Rural Areas: Comment', *Quarterly Journal of Economics,* 79.

Gibbard, A. (1985), 'What's Morally Special About Free Exchange', *Social Philosophy and Policy,* 2.

Griffin, K. *The Political Economy of Agrarian Change,* Macmillan.

Havel, V. (1985), *The Power of the Powerless,* Hutchinson.

Maja-Pearce, A. (1984), 'Out of Slavery: Lagos Revisited', *London Megazine,* 24.

North, D. C. (1984), 'Transactions Costs, Institutions, and Economic History', *Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft,* 140.

Platteau, J.P. and A. Abraham, (1987), 'An Enquiry into Quasi-credit Systems in Traditional Fisherman Communities', *Journal of Development Studies.*

Raj, K. N. (1979), 'Keynesian Economics and Agrarian Economics', in C. H. H. Rao and P C. Joshi (eds), Reflections on Economic and Social Change, Allied Publishers.

Schick, F. (1984), *Having Reasons: An Essay in Relation and Sociality,* Princeton University Press.

Sen, A. K. (1983), 'Carrots, Sticks, and Economics: Perception Problems in Incentives', *Indian Economic Review.* 18

—(1985), 'The Moral Standing of the Market', *Social Philosophy and Policy,* 2.

Simmel, G. (1950), *The Sociology of George Simmel,* edited by K. H. Wolff, Free Press.

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনৈতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব

তত্ত্ব ও কায়েমি স্বার্থ

তত্ত্ব ও গাণিতিক পদ্ধতির প্রতি অবজ্ঞা ভারতবর্ষে শুধু অর্থনৈতিক তত্ত্বেরই ক্ষতি করেনি, করেছে তথ্যগত গবেষণারও। তার কারণ উপাত্ত (data) আর পরিসংখ্যাকে তথ্য আর জ্ঞানে পরিণতি করার জন্যই চাই তত্ত্ব। এ দেশে অভিজ্ঞতামুখী গবেষণার ফলাফলগুলিকে কোনো রকমে বিন্যস্ত করা হয় যেসব তাত্ত্বিক মডেলে সেগুলোর উদ্ভব অন্যত্র, ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। এ অবস্থা সংশোধনের জন্য আমাদের বিমূর্ত তাত্ত্বিক কাজকে উৎসাহিত করতে হবে—তাতে প্রবৃদ্ধি-অর্থনীতি এবং কর্মপন্থা প্রণয়নের মান দুই-ই সমৃদ্ধ হবে।

ভারতে তাত্ত্বিক গবেষণার শোচনীয় হালের কারণ ত্রিবিধ।

প্রথমত, গবেষণা-সংশ্লিষ্ট আমলাতন্ত্রের অত্যধিক আগ্রহে গবেষণাকে 'প্রাসঙ্গিক' ক্ষেত্রাভিমুখে 'চালিত' করার জন্য। ভালো অর্থনীতি উদ্ভাবনের জন্য দেশদরদী হওয়া প্রয়োজন—এ ধারণাটি ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের ঘাটতি জাতীয়তাবাদ দিয়ে পূরণ করা যায় না। গবেষণা প্রাসঙ্গিক হোক, এটা অবশ্যই আমরা চাই। কিন্তু দরদ ও প্রাসঙ্গিকতা সৃজনশীল কাজের উৎস হয় কদাচিৎ। প্রকৃতিবিজ্ঞানে বা অর্থনীতিতে যা গবেষককে বৃহৎ আবিষ্কারের দিকে প্রণোদিত করে তা হল আবিষ্কারের অন্তর্নিহিত আনন্দ[১] আর সে আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জনের তাগিদ। অতএব প্রাসঙ্গিক গবেষণা লাভের একমাত্র পথ হল গবেষণাকে উৎসাহিত করে আশায় বুক বেঁধে থাকা।

এখন কি, কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা বলাও বোধ হয় অতিসাবধানতা। উপরের মন্তব্যগুলো যে কোনো সৃষ্টিশীল কাজের বেলাতেই খাটে। নাট্যকার Tom Stoppardকে যখন তাঁর লেখার পিছনের প্রেরণা (motivation) জিগ্যেস করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন: 'উপযোগিতার চিন্তার সর্বপ্রকার ছোঁয়া থেকে তাকে [আমার লেখাকে] মুক্ত হতে হবে। আমার চাই প্রত্যয়হীনতার সাহস (I should have the courage of my lack of convictions)'।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের অনেক সমালোচকের অভিযোগ, তত্ত্বের নামে যা বর্তমানে বেরোচ্ছে তার বেশির ভাগই ছেঁদো গণিত। আমার মতো তাঁদের কথা ঠিক এবং তত্ত্বের প্রতি ব্যাপক তাচ্ছিল্যের এটাই দ্বিতীয় কারণ। সত্যিই, সমসাময়িক তাত্ত্বিক কাজের অনেকটাই বড় তুচ্ছ[২]—প্রাসঙ্গিকতার বিচারে তো বটেই, মননের দারিদ্র্যেও। তবে বুঝতে হবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনৈতিক তত্ত্ব মানেই গাণিতিক অর্থনীতি নয়। উপরন্তু আংশিক অপব্যবহারের কারণে সব তত্ত্ব ও সব গাণিতিক অর্থনীতি উড়িয়ে দেওয়াও ভুল।

শেষত, বিমূর্ত যুক্তি বড় কঠোর ও সংযমী। তা আমাদের সংশয়বাদের শিক্ষা দেয়, প্রায়ই 'জানি না' বলতে বাধ্য করে। আজকের উপদেষ্টা-ব্যবসায় প্রমত্ত যুগে তা খুবই অসুবিধাকর—এখন চাই চটপট জবাব, যতই অন্তঃসারশূন্য হোক তাতেই পয়সা। এইভাবে কায়েমি স্বার্থ গড়ে উঠেছে তত্ত্বের বিরুদ্ধে।

ভারতে অর্থনৈতিক পেশাভুক্ত তথাকথিত বামপন্থীরা কর্মপন্থা প্রভাবিত করতে যে এত ব্যর্থ হয়েছেন তার একটি কারণ এই কায়েমি স্বার্থ। এটাই বামপন্থীদের প্ররোচিত করে, যে-ই তাঁদের বিশ্লেষণে যৌক্তিক ত্রুটি নির্দেশ করে, তাকে দক্ষিণপন্থী ছাপ মেরে দিতে। এরই দরুন এক ধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় বামপন্থীদের মধ্যে জীর্ণ হয়ে গেছে বিশ্লেষণ-প্রয়াস। পক্ষান্তরে কোনো কোনো রাজ্যের বামপন্থী সরকার কিন্তু অনেক বেশি বাস্তবমুখিতার, অর্থনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক গভীরতর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছে।

ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের বামপন্থীরা অনেক বেশি কার্যকর হতে পারবেন যদি তাঁরা অর্থনৈতিক তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত থাকেন। ব্যক্তিগত প্রণোদনা (incentive) ও বাজার চাইলেই উবে যাবে না। আমাদের প্রয়োজন ওগুলোকে বোঝা এবং বাঞ্ছনীয় দিকে পরিচালিত করা।[৩]

একটা পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করি, আবার জানাই আমার বিশ্বাস যে অর্থনৈতিক তত্ত্ব সত্যই মূল্যবোধ নিরপেক্ষ। তা ভালো বা খারাপ হতে পারে, বাম বা ডান হতে পারে না। তত্ত্ব—তা নব্য-ধ্রুপদী বা আর যা-ই হোক—কোনো মতাদর্শের অংশ, এমন ভাবাটাই ভুল।[৪] একই ভুল করেছিলেন Father Thomas Caccini, যখন গ্যালিলিও-র প্রতি ক্রোধে অন্ধ হয়ে ১৬১৪-র ২১ ডিসেম্বর তাঁর গির্জার মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে কোপার্নিকাসের চিন্তাধারা, গণিত ও সকল গণিতবিদ খৃস্টধর্মের পরিপন্থী। আমাদের কাছে আজ এটা স্পষ্ট যে গাণিতিক সত্য ধর্ম বা মতাদর্শের বিরোধী হতে পারে না। আর যদি হয়ই, কোনটা বিসর্জন দিতে হবে তা-ও পরিষ্কার।

অর্থনীতি সম্বন্ধে আর কথা না বাড়িয়ে এবার অর্থনীতিতেই ঢোকা যাক। অতঃপর, নিতান্ত সহজ কিছু বিশ্লেষণের সাহায্যে কিভাবে আমরা মিথ্যা ও বিভ্রান্তির জাল কাটাতে পারি তার কিছু দৃষ্টান্ত আমি প্রবৃদ্ধি অর্থনীতি থেকে দাখিল করব। তার জন্য জটিল পরিসংখ্যান বা গণিতের দরকার হবে না। অবশ্য এই দৃষ্টান্তগুলি সাবধানে বাছাই করা—অর্থনীতির সব সমস্যা এতটা সরল নয়।

কাম্যতা ও অন্তঃসংযোগ

গ্রামীণ ঋণ-বাজারের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল, মহাজন যখন পুরোপুরি শোষণপরায়ণ তখনই বাজারের ভারসাম্য হয় প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের মতো—যেখানে মহাজনের শোষণ করার কোনো ক্ষমতা নেই। সুদের হার নিচু, পারেতো কাম্যতা সুনিশ্চিত।

পারেতো কাম্যতা ও মহাজনের শোষণ ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝি ব্যাপক। প্রথমে পারেতো কাম্যতার সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করা যাক। দুটো ধাপে তা করলেই সবচেয়ে ভালো হয়। কোনো পরিবর্তনকে 'পারেতো উন্নতি' বলা যায় যদি তাতে অন্তত একজনের অবস্থা ভালো হয় এবং কারো অবস্থা খারাপ না হয়। একটা সমাজ 'পারেতো কাম্যতা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জন করে যখন আর সেখানে পারেতো উন্নতির অবকাশ থাকে না, অর্থাৎ যখন তার সব সুযোগ নিঃশেষিত।

প্রথমেই লক্ষ্য করুন, কোনো অবস্থাকে 'পারেতো কাম্যতা'র অবস্থা বলা একটি প্রত্যক্ষবাদী (positive) মন্তব্য।[৫] কোনো অবস্থাকে পারেতো কাম্যতা আখ্যা দিয়েও অবাঞ্ছিত বলা যায়, এমন কি এ-ও বলা যায় যে সব পারেতো কাম্যতার অবস্থাই অবাঞ্ছিত।

'পারেতো' কথাটা না বলে কেউ যদি কোনো অবস্থাকে 'কাম্য' বলেন তাহলে কি হয়? মন্তব্যটা কি অনুশাসনমূলক? সেটা পাত্রবিশেষের উপর নির্ভরশীল। বক্তা যদি একজন অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হন তাঁর মন্তব্যটা অনুশাসনমূলক সচরাচর ব্যবহারে 'কাম্য' শব্দটিতে 'ভালো' শব্দের মতোই একটা প্রশংসার ভাব থাকে (দ্রষ্টব্য Hare, ১৯৫২)। পক্ষান্তরে বক্তা যদি হন অর্থনীতিবিদ, শ্রোতারাও তাই, তাহলে হয়তো 'কাম্যতা' তাঁর কাছে 'পারেতো কাম্যতা'রই সংক্ষিপ্ত রূপ, ফলত তাঁর মন্তব্যটি পুরোপুরি প্রত্যক্ষবাদী। উপরন্তু একজন অর্থনীতিবিদ সাধারণত 'দক্ষতা' শব্দটিকে 'পারেতো কাম্যতা'র সমার্থকরূপে ব্যবহার করেন, তাই তিনি কোনো অবস্থাকে 'দক্ষ' আখ্যা দিলে তার মানে এই নয় যে তিনি তার প্রশংসা করছেন।

কেউ কেউ হয়তো আপত্তি তুলবেন যে এই মাত্র আমি কাম্যতা ও দক্ষতার যে সংজ্ঞা দিলাম সেগুলোই একমাত্র সংজ্ঞা নয়। অর্থনৈতিক সাহিত্যে ওগুলোর আরো সংজ্ঞা রয়েছে,[৬] নানা মতের অর্থনীতিবিদ হয়তো নানা সংজ্ঞায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাতে আমার মূল যুক্তির আদৌ কোনো হেরফের হয় না। কাম্যতা ও দক্ষতার সংজ্ঞা যদি এমন সুনির্দিষ্ট হয় যে কোনো সমাজের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া গেলেই আমরা বস্তুনিষ্ঠভাবে স্থির করতে পারি তা কাম্য বা দক্ষ কিনা, তাহলেই উক্ত আখ্যাদুটিতে প্রশংসার ভাব ধ'রে নেওয়ার, কোনো হেতু থাকে না।[৭]

অতএব কেউ যদি বলে যে গ্রামীণ উৎপাদন কারকের (factor) বাজারগুলির অন্তঃসংযোগের (interlinkage) প্রবণতা দক্ষ পরিণামের অভিমুখে তাহলে তাতে অন্তঃসংযোগের সুপারিশ কিংবা গ্রামীণ বাজারে সরকার নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা কোনোটাই নির্দেশিত হয় না।

এবার গ্রামীণ বাজারগুলির গঠন এবং ভরসাম্যগুলির দক্ষতা, এ দুইয়ের সম্পর্কের দিকে ভালো করে তাকানো যাক। আমি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব গ্রামীণ ঋণ-বাজারগুলির উপর। এই ধরনের বাজারে সবাই যদি প্রতিযোগিতামূলক আচরণ করে তাহলে convexity জাতীয় কিছু অনুমিতি সাপেক্ষ ফলাফল দক্ষ বা কাম্য হতে বাধ্য।[৮]

এখন ধরুন এই রকম একটি বাজারে আছে কোনো একচেটিয়া মহাজন এবং বেশ কিছু খাতক। একচেটিয়ার তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে এর ফল হবে অদক্ষ এবং সুদের হার হবে উঁচু। একে বলা হয়েছে গ্রামীণ ঋণ-বাজারের 'radical' মডেল; Cambridge Journal of Economics-এ প্রকাশিত কিছু কিছু লেখা এই ধারানুসারী।

একটু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই ধরা পড়ে যে গতানুগতিক একচেটিয়া ব্যবসায়ের এইসব ধর্ম থাকে কারণ গতানুগতিক একচেটিয়া কারবারি পুরো শোষণপরায়ণ নয়।[১০] এবার এমন একজন একচেটিয়া কারবারির কথা ভাবুন যে তার যে-কোনো খরিদ্দারের থেকেই সবটুকু উদ্বৃত্ত আদায় করে নেয়। তার নাম দেওয়া যাক জুলুমবাজ একচেটে। সহজেই দেখানো যায় যে এক্ষেত্রে বাজার দক্ষতা বা পারেতো কাম্যতার ভারসাম্যে উপনীত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণটা সহজ। কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে একজন সম্পূর্ণ শোষণপরায়ণ হলে তার স্বার্থ থাকে লভ্যাংশকে যথাসাধ্য বড় করায়, যাতে অন্যদের নিছক গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানটুকু দিয়ে বাকি সবটা সে আত্মসাৎ করতে পারে। ফলে এটা সুনিশ্চত হয় যে ভারসাম্য থাকে গোষ্ঠীর উপযোগিতা-সম্ভাবনা সেটের সীমানায়।

এই মডেলে ভারসাম্যের দক্ষতা অস্বীকার করার অর্থ এ কথা বলা যে একচেটিয়া মহাজনটি পুরোপুরি শোষণপরায়ণ নয়। অনেক অর্থনীতিবিদ এ বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন (যেমন গুহ, ১৯৮৬)। অন্তঃসংযোগ অদক্ষতার জন্ম দেয়—এ কথায় জোর দিতে গিয়ে তাঁরা গ্রামীণ মহাজনের শোষণপরায়ণ চরিত্রকে অংশত মাপ ক'রে দিয়েছেন।[১১]

আরো দেখানো যায় যে একচেটিয়া মহাজন যদি জমিদারও হয় (অর্থাৎ গ্রামীণ বাজার যদি অন্তঃসংযোগ-বিশিষ্ট হয়) তাহলে তার পক্ষে খাতকদের কাছ থেকে সবটুকু পরিভোগকারীর উদ্বৃত্ত আদায় ক'রে নেওয়া খুবই সহজ। ফলে এই ধরনের অন্তঃসংযোগ থেকে যে ভারসাম্য উদ্ভূত হয় তো জুলুমবাজ একচেটের কবলিত বাজারের ভারসাম্যের অনুরূপ। অর্থাৎ ফলাফল দক্ষ এবং উপরন্তু এক্ষেত্রে সুদের হারও প্রতিযোগিতামূলক মডেলের মতোই নিচু।[১২] এই ধর্মগুলি নিচের সারণিতে সন্নিবেশিত হল।

	সুদের হার	ভারসাম্যের প্রকৃতি
(ক) প্রতিযোগিতামূলক ঋণদান	নিচু	দক্ষ
(২) একচেটিয়া ঋণদান	উঁচু	অদক্ষ
(৩) অন্তঃসংযোগসহ একচেটিয়া ঋণদান	নিচু	দক্ষ

প্রতিযোগিতামূলক মডেলের সঙ্গে চূড়ান্ত শোষণমূলক মডেলের বাহ্যিক সাদৃশ্য অনেক বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী কৃষির শোষণমূলক চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক লেখক খ-কেই শোষণমূলক সম্পর্কের যথার্থ বর্ণনারূপে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন, এবং এমন কি গ-জাতীয় মডেলগুলিতে অশোষণমূলক পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সেগুলোর সমালোচনাও করেছেন। তাঁরা বোঝেননি যে গ-তে খাতক ও ভূমিহীন মজুরদের হাল সব থেকে খারাপ। দক্ষ ভারসাম্য ও নিচু সুদের হার তারই আবশ্যিক অনুষঙ্গ।

আর এগোনোর আগে আমি একটি বিষয়ে জোর দিতে চাই। উপরের বিশ্লেষণ দ্বারা আমি এ দাবি করতে চাইছি না যে গ্রামীণ বাজারগুলি দক্ষ ; আমি শুধু বলতে চাই যে তাদের অদক্ষতা অন্তঃসংযোগ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, যদিও এ বিষয়ে প্রথম দিককার লেখকরা তাই মনে করতেন।

ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ আইন

কৃষি-কাঠামোর পর্যালোচনায় একটা বিষয় প্রভূত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—তা হল প্রযুক্তিগত অচলতা। বসু (১৯৮৯)-তে আমি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছি যে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে আমাদের ভোগদখলের আইন[১৩] ও জমিতে অধিকারের কাঠামো (বিপরীত মতের জন্য দ্রষ্টব্য: Olsen, ১৯৮৭)। এখানে আমি বিচার করব একটি সম্পর্কিত কিন্তু ব্যাপকতর বিষয়—কাম্য ভাড়া সংক্রান্ত আইন। এ বিষয়ে বিভ্রান্তি ব্যাপক। এ বিভ্রান্তিগুলি ইতিপূর্বের দৃষ্টান্তের বিভ্রান্তিগুলি মতো অর্থনীতিবিদদের আভ্যন্তরীণ বিতর্কে সীমাবদ্ধ নয়, এগুলি ছড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের আলাপ-আলোচনায়, সংবাদপত্রের প্রবন্ধে, চায়ের টেবিলের তর্কাতর্কিতে। 'আমাদের ভাড়াটে আইন ভাড়াটে-ঘেঁষা' ধরনের মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়, যদিও বিশ্লেষিত হয় কদাচিৎ। যাবতীয় হাতিয়ার প্রয়োজন—তত্ত্ব, তথ্য, অর্থমিতি (econometrics) ; তবে কিছু প্রশ্ন নিছক যুক্তির সাহায্যেই মীমাংসা করা যায়, বাস্তব দুনিয়ার এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কাজে লাগানো যায় অর্থনৈতিক তত্ত্ব।

ভাড়াটে আইনের বিষয়ে প্রবেশ করার আগে আমি আইন ও অর্থনীতির বিষয়ে কিছু সাধারণ মন্তব্য করব। আমার বিশ্বাস, একটি ক্ষেত্রে অর্থনীতি ও অর্থনীতিবিদদের খুবই কম কাজে লাগানো হয়েছে—আইনের প্রণয়ন ও প্রয়োগে। অনেক ক্ষেত্রে—যেমন ভাড়াটে সংক্রান্ত প্রশ্নে, ট্রাস্ট বিরোধী বিষয়ে, প্রতিবন্ধজনক বাণিজ্যের আচরণ (restrictive trade practice) ও সম্পত্তি বিভাজন[১৪]—অর্থনীতিবিদ আইনবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বিশ্লেষণের হাতিয়ারের অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতিবিদরা যে এত প্রচুর সংখ্যায় আদালতে ঢুকছেন তাতে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই (যেমন দ্রষ্টব্য Ashenfelter ও Oaxaco, ১৯৮৭)।

ভোগদখলী আইনের বিশেষ বিষয়টির দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার যে আইন কেবল ভাড়াটে বা বাড়িওয়ালার প্রতি ন্যায্যতা বিধানের দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এগুলো জমিতে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনশীলতাকে উৎসাহিত করতে পারে, নির্মাণ-শিল্প ও তার সহযোগী শিল্পসমূহকে মদত দিতে পারে।

একটা বিশ্বাস বেশ ব্যাপক যে, ভারতের ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ আইন ভাড়াটে ঘেঁষা। প্রথমে এটাই বিচার করা যাক। বিশ্বাসটাকে সংক্ষেপে অভিহিত করা যাক 'ভাড়াটে-ঘেঁষা তত্ত্ব' বলে। আমার যুক্তি হবে—এ তত্ত্বের ভিত্তি দুর্বল, এমন কি হয়তো ভ্রান্ত।

তত্ত্বটির ভিত্তি হল এই তথ্য যে, ভারতের সর্বত্র ভাড়াটে আইন এমন যে বাড়িওয়ালার পক্ষে ভাড়াটে তোলা কিংবা বিদ্যমান ভাড়াটের ভাড়া বাড়ানো খুবই কঠিন।[১৫] এটা ভাড়াটে-ঘেঁষা বলেই মনে হয়, ফলে আমরা চট করে সিদ্ধান্ত করে বসি যে আমাদের আইন সত্যিই ভাড়াটে-ঘেঁষা।

এ যুক্তির গলদ রয়েছে একটা অর্থনীতির সাধারণ ভারসাম্যগত চরিত্র বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার মধ্যে। এর ফলে সাধারণ্যে এ বিষয়ে যে বিতর্ক সম্ভব হয়েছে তা খুবই নিম্ন মানের। কিছু কিছু সাম্প্রতিক পরামর্শ তো যেন আমাদের গোলমালে ভাড়াটে-আইনকে আরো গোলমেলে করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত। এমন কি Economic Administration Reforms Commission-ও 'ন্যায্য ভাড়া' বেঁধে দেওয়ার সুপারিশ করেছে—এমন সব আদর্শবাদী আইন যে কত কার্যকরী হয় তা যেন এখনও আমাদের দেখা হয়নি।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বোঝা দরকার। অর্থনীতির পক্ষে আইন একটা বহির্জনিত (exogenous) ভেদকেরই অনুরূপ। তার প্রতি বাজারগুলির প্রতিক্রিয়া নানা রকম এবং পরিণামটা অভিপ্রায়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেতে পারে। এ দেশে বাড়িওয়ালা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাড়াটে উভয়েই জানে যে ভাড়াটে ওঠানো বর্তমান আইনে কঠিন। মুদ্রাস্ফীতির অবস্থায়, বাড়িওয়ালা জানে, ভাড়াটে যে ভাড়া দেবে তার প্রকৃত মূল্য বছর-বছর কমে যাবে। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভাড়াটের চেয়ে স্বল্পকালীন ভাড়াটেই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তবে Akerlof-এর (১৯৭০) মডেলের মতোই এখানেও একটা অসম জ্ঞানের সমস্যা (asymmetric information problems) আছে—ভাড়াটে বসানোর সময় দীর্ঘকালীন আর স্বল্পকালীন ভাড়াটেকে আলাদা করে চেনার কোনো পরিষ্কার পথ নেই। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপার স্পষ্টই বটে—যেমন, বদলির চাকরি-করা লোক কিংবা কূটনৈতিক ফরমায়েশে আসা কোনো বিদেশি নিশ্চয়ই স্বল্পকালীন ভাড়াটেই হবে। ফলে এই ধরনের ভাড়াটের জন্য চাহিদা হবে—বাস্তবে হচ্ছেও—খুব বেশি। দিল্লিতে আমার ভাড়া-করা ফ্ল্যাট ছাড়ার কয়েক সপ্তাহ পরে আমার প্রাক্তন বাড়িওয়ালা একগাল হেসে আমাকে জানালেন, এবার তিনি বিদেশি ভাড়াটে পেয়েছেন—বিদেশি স্বামী আর ভারতীয় স্ত্রী। এক বছর পরে দেখি তাঁর মুখ চুন—ভাড়াটেদের বিয়ে ভেঙে গেছে আর বিদেশি ভদ্রলোকটি উঠে গেছেন অন্য একটি ফ্ল্যাটে।

অসম জ্ঞানের সমস্যার দরুণ 'ভালো-খারাপ' ভাড়াটে বাছাই করার জন্য বাড়িওয়ালারা অন্যান্য লক্ষণ খোঁজে। তার পরে বাজার কিন্তু ব্যবহার করে প্রত্যেক ধরনের ভাড়াটেদের গড়পড়তা লক্ষণসমূহ। অতএব গড়পড়তা ভাড়াটে যদি কুড়ি বছর থাকে, তাহলে ভাড়াটে যা-ই বলুক না কেন বাড়িওয়ালা তার হিসাব করে এই ভিত্তিতে যে ভাড়াটে কুড়ি বছরই থাকবে। বাড়িওয়ালা তাই কুড়ি বছরের মূল্যস্ফীতিজনিত ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার মতো উঁচু ভাড়াই দাবি করে।

সুতরাং বর্তমান ভারতে অধিকাংশ স্বল্পমেয়াদি ভাড়াটে যে ভাড়া দেয়, তার চেয়ে অনেক কম তাদের দিতে হত ভিন্নতর আইনে—বিশেষ করে বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে যদি যেমন খুশি মেয়াদের চুক্তি সই করতে পারত আর আদালত যদি বলবৎ করত সেই চুক্তি। অর্থাৎ আমাদের বর্তমান আইন সাধারণ ভারসাম্যের নিয়মাবলী মারফৎ একটা গোটা শ্রেণীর ভাড়াটেদের যে ভাড়া দিতে বাধ্য করে, ভিন্নতর মাইনে তার চেয়ে তাদের কম দিতে হত। আমাদের আইনের ভাড়াটে-ঘেঁষা চরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততা ঐ পর্যন্তই।

তবে বর্তমান আইন ভাড়াটে-ঘেঁষা নয় বলে তার মানে এ নয় যে তা বাড়িওয়ালা-ঘেঁষা। আইনটা আসলে অদক্ষ, বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে উভয়েরই ক্ষতি করতে পারে তা, প্রকৃতপক্ষে বর্তমান আইনের ফয়দা-লোটার দল রয়েছে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে উভয় পক্ষেই—যারা অধিক পেশীশক্তি ও কম বিবেকবুদ্ধির অধিকারী, তারা।

পন্থা-নির্ধারণের প্রশ্নে প্রবেশ করার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে তুলনা করা যেতে পারে দুটি বিকল্প ব্যবস্থার সঙ্গে। আমি ও দুটোর নাম দেব 'অ-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা' ও 'চুক্তি বলবৎকারী ব্যবস্থা'। অ-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থায় সরকার কোনো ভাড়াটে-আইন প্রণয়ন করে না, বাজারের উপর হস্তক্ষেপ করে না কোনোভাবেই। বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে যেমন খুশি চুক্তি করে এবং নিজেদের দায়িত্বে তা বলবৎ করে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ [যেমন নব্য-প্রাতিষ্ঠানিক ধারার (new institutional school) কেউ কেউ] মনে করেন, এ ব্যবস্থা চমৎকার চলবে, হস্তক্ষেপ না থাকলে যথোচিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে ও কাম্যতা নিশ্চিত করবে।

এইসব আশায়-উজ্জ্বল সিদ্ধান্তের পিছনে আছে বেশ কিছু ভ্রান্তি। প্রথম ভ্রান্তি হল এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস যে, কোনো প্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় হলেই তা আবশ্যিকভাবে রূপায়িত হবে। অথচ বাস্তবে এটা খুবই সম্ভব যে একটি প্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তির তরফে তা নির্মাণের কোনো প্রচেষ্টা নেই। প্রতিষ্ঠান সাধারণত ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং খারাপ প্রতিষ্ঠান দেখা দেবে না ও টিকে থাকবে না এমন কোনো গ্যারান্টি নেই।[১৬]

নিয়ন্ত্রণ-বিরোধী চিন্তাধারার দ্বিতীয় সমস্যা হল আভ্যন্তরীণ যুক্তিসঙ্গতির। ধরুন একদল লোক মুক্ত আচরণ করতে করতে একটি প্রতিষ্ঠানের—ধরুন, সরকারের—জন্ম দিল এবং সেই প্রতিষ্ঠান এবার তাদের মুক্ত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ কি রোধ করা উচিত ? তা তো লোকেদের আচরণ থেকে স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত, সুতরাং নব্য প্রাতিষ্ঠানিক মতবাদ অনুযায়ী তো তা খারাপ হতে পারে না। আবার নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়াও তো এ মতবাদের পরিপন্থী।

চুক্তি বলবৎকারী ব্যবস্থা এর চেয়ে বেশি যুক্তিসঙ্গত ও আকর্ষণীয়। তার বিশুদ্ধতম রূপে তা দুই ব্যক্তিকে যা খুশি করতে দেবে—চিরকালের জন্য বাঁধা ভাড়া, পাঁচ বছর বাদে বাদে ভাড়া সংশোধন, কিংবা মূল্যস্ফীতি-নির্ভর ভাড়া। বিচারবিভাগের কাজ শুধু হবে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ বিচার করে ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া।

এই আইন ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা এই যে তাতে ভাড়াটে উঠে যাওয়া তারিখ সংবলিত চুক্তি করা যাবে এবং সে চুক্তি বলবৎ করা যাবে। এই ব্যবস্থায় একই ফ্ল্যাট ও একই জমির জন্য একাধিক ভাড়া থাকবে। যে ভাড়াটে অল্প কালের জন্য ভাড়া নেবে সে কম ভাড়া দেবে। বাহুবল আর দাপটের ভূমিকা কমে যাবে।

তবে ব্যবস্থাটার দুটো অসুবিধা। প্রথমত, চুক্তি লেখার সময় সব সম্ভাবনা আন্দাজ করা অসম্ভব হতে পারে। এ শুধু একটা ব্যবহারিক অন্তরায় নয়, মৌলিক অসম্ভবতাও জটিল হয়ে উঠতে পারে যে এক পক্ষ তাতে সুকৌশলে আইনী বুকনির আড়ালে অন্যায় সব শর্ত ঢুকিয়ে রাখতে পারে এবং অন্য পক্ষ সেসব টের না পেয়েই সই করে দিতে পারে চুক্তিতে।

এ সমস্যা এড়ানোর একটা উপায় হতে পারে 'সীমিত চুক্তি বলবৎকারী ব্যবস্থা'—যাতে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে একটি পূর্বনির্ধারিত কাঠামোর সীমার মধ্যে যে কোনো চুক্তি করতে পারবে। যেমন, সব চুক্তি করতে হতে পারে শূন্যস্থান সংবলিত সহজ একটি ছাপানো ফর্মে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাড়া কত, সে ভাড়া মুদ্রাস্ফীতি-নির্ভর কিনা, ভাড়াটে বাড়ি ছাড়বে কিনা, ছাড়লে তা কতদিন পরে, ইত্যাদি বিষয়ের জন্য শূন্য স্থান রাখা যায়। এখনকার ব্যবস্থার চেয়ে এ ব্যবস্থা অনেক নমনীয় হলেও আসল চুক্তি-বলবৎকারী ব্যবস্থার নমনীয়তা এতে অবশ্যই নেই। তবে এর সুবিধা হল অন্য পক্ষকে বোকা বানিয়ে অন্যায় শর্তাবলী ঢুকিয়ে দেওয়ার সুযোগও এতে নেই।

একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া ভালো। এই নতুন ভাড়াটে আইন শুধু নতুন চুক্তিকারীদের জন্যই প্রযোজ্য হওয়া উচিত, বিদ্যমান ভাড়াটেদের বেলায় নেয়। পুরনো ব্যবস্থার চুক্তিগুলি কথা হয়েছিল সে ব্যবস্থার ভিত্তিতে, আচমকা সেগুলোর শর্ত বদলে দিলে তা কোনো কোনো পক্ষের জন্য খুবই অন্যায্য হয়ে যেতে পারে।

ন্যায্যতার প্রশ্ন বাদ দিলেও চুক্তি-বলবৎকারী ব্যবস্থা—এমন কি তার সীমিত সংস্করণ—ফ্ল্যাটের রক্ষণাবেক্ষণ ও বাসস্থানের যোগানবৃদ্ধির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। শেষোক্তটা ঘটতে পারে দুভাবে। এক, নির্মাণ শিল্পকে চাগিয়ে তুলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে তা যদি সংস্থানের (resource) অভাব ও প্রতিক্রিয়ার (response) অস্থিতিস্থাপকতার কারণে সম্ভব না-ও হয় তবু বাসস্থানের কার্যকরী যোগান বাড়তে পারে, কেননা বর্তমান ব্যবস্থায় বাড়িওয়ালারা যেসব ফ্ল্যাট ফাঁকা রেখে দেওয়াই বেশি লাভজনক মনে করছেন সেগুলো তখন তাঁরা ভাড়া দিতে শুরু করবেন।

উপসংহার

বিশুদ্ধ তত্ত্ব নির্দিষ্ট পন্থা বাতলাতে পারে না—এটা ডেভিড হিউমের একটি সুবিদিত নিয়মেরই পরিণাম। তত্ত্ব পন্থা-সংক্রান্ত বিতর্কের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, পন্থা নির্দেশের জন্য তার সঙ্গে যুক্ত হতে হয় আন্দাজ, পরিসংখ্যান, মূল্যবোধ। হিউমের নিয়মকে উল্টে নিয়ে বলা যায়, বিশুদ্ধ তত্ত্ব আমাদের অরুচিকর অনুশাসন অবহান গ্রহণে বাধ্য করতে পারে না। অতি সহজ কথা এটা, অথচ অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রতি আমাদের অহেতুক অবিশ্বাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই কথাই না বোঝা।

টীকা

১ লুই পাস্তুরের বৈজ্ঞানিক কীর্তির উপযোগিতা তো প্রশ্নাতীত। দেখুন তিনিও কি বলছেন 'যে বিজ্ঞানী শিল্পগত প্রয়োগের সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ সে আপনা থেকেই আর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সেবক থাকে না ; তার জীবন-মনন এমন সব চিন্তায় ভারাক্রান্ত ওঠে যে তার আবিষ্কার-ক্ষমতাকেই দেয় পঙ্গু করে।' (H. Cuny, Louis Pasteur, Souvenir Press, লন্ডন, ১৯৬৩, পৃ ১৮)।

২ এখানে আমার স্মরণ (অনুমোদন নয়) করতে লোভ হচ্ছে গাণিতিক মডেলের বিরুদ্ধে অশোক মিত্রের (১৯৭৯, পৃ ১২০) বর্ণাঢ্য সমালোচনা 'অর্থনীতিতে যা গাণিতিক মডেল-নির্মাণ বলে চলে আর প্রেবয় পত্রিকায় পাতায় যা স্থান পায়, এ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য খোঁজার দরকারই নেই। দুইই ব্যসনের দৃষ্টান্ত...।'

৩ চক্রবর্তী (১৯৮৭) তাঁর ভারতীয় পরিকল্পনা-সংক্রান্ত বইয়ে এ অবস্থান গ্রহণ করেছেন—বিশেষত পৃ ৪১-২ দ্রষ্টব্য। Arrow-র নিবন্ধ (১৯৮২) এবং এবং Roemer-এর সমর্থিত বিচারধারার সঙ্গেও আমার কিছু পদ্ধতিবিদ্যক সহমর্মিতা আছে—দ্রষ্টব্য Romer (১৯৮৫)।

৪ তাহলে Harcourt-এর এই বিচক্ষণ মন্তব্যের কি অর্থ ?—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রশ্নের কোনো অর্থনীতিবিদ...যুদ্ধিবাদী না শান্তিবাদী তা জানা গেলেই যথেষ্ট সঠিকতার সঙ্গে বলে দেওয়া যায় অর্থনৈতিক তত্ত্বে তাঁর সাধারণ বিচারভঙ্গি কি, বর্তমান বিতর্কগুলিতে (প্রধানত পুঁজিসংক্রান্ত বিতর্কে) তিনি কোন পক্ষে থাকবেন।' (Harcourt, ১৯৭২, পৃ ১৩) আমার ভাষণের সময় এই প্রশ্নটাই উত্থাপন করেছিলেন এন. আর. রামগোপাল।

Harcourt সঠিক। শুধু ভিয়েতনামের বেলাতেই নয়, গ্রানাডা আর নিকারাগুয়াতেই। আরো এগিয়ে এ-ও বলা যায় যে যেসব অর্থনীতিবিদ monetarist পন্থায় বিশ্বাসী তাঁরা সাধারণত দক্ষিণপন্থী। কিন্তু তার সঙ্গে আমার যুক্তির কোনো বিরোধ নেই। এ পাদটীকার দৃষ্টান্তগুলি হল সহসম্পর্কের (correlation) দৃষ্টান্ত, যৌক্তিক সম্পর্কের নয়। Monetaristরা সাধারণভাবে (অনিবার্যভাবে নয়) দক্ষিণপন্থী। কিন্তু তাই বলে এটা বলা উচিত নয় যে monetarism-এ বিশ্বাসের কারণেই তাঁরা দক্ষিণপন্থী। অনুরূপভাবে কোনো অর্থনীতিবিদ যদি তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বেও অবিচল থেকে ভিয়েতনাম সম্পর্কে তাঁর সম্পর্কে তাঁর অবস্থান বদল করেন তাতে অসংগতি কিছু থাকবে না।

৫ পারেতো কাম্যতা ও অনুশাসনমূলক (normative) উক্তির আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Sen (১৯৭০)।

৬ দক্ষতার কিছু বিকল্প সংজ্ঞার জন্য দ্রষ্টব্য Bhaduri (১৯৮৬)।

৭ অবশ্য এমন ব্যক্তিও আছেন যিনি 'ছেলেটা পাঁচফুট লম্বা' মন্তব্যটিও প্রত্যক্ষবাদী মন্তব্য বলে মানবেন না। আমার বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য 'অমুকে পারেতো কাম্যতা সম্পন্ন' মন্তব্যটিকে যদি অন্তত 'ছেলেটা পাঁচ লম্বা' মন্তব্যের সমান প্রত্যক্ষবাদী বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলেই চলবে।

৮ এটা Welfare অর্থনীতির একটি মৌলিক উপপাদ্যের অনুসিদ্ধান্ত। উপপাদ্যটিকে অনেকে নিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী বলে মনে করেন, কিন্তু নব্য-ধ্রুপদী অর্থনৈতিক গবেষণার সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে দেখা গেছে যে অতীব কঠোর শর্তসাপেক্ষেই তা সত্য।

৯ দৃষ্টান্তস্বরূপ Bhaduri (১৯৭৭), Basu (১৯৮৪)। Indian Economics Review-তে Mukherji (১৯৮২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবন্ধের সুরও একই।

১০ অন্যত্র (Basu, ১৯৮৭খ) এ বিষয়টা আমি বিশদ করেছি। একই ধারণা ভিন্ন প্রসঙ্গে, দ্রষ্টব্য Oi (১৯৭১), এমন কি Pigon (১৯২০)।

১১ Rudra (১৯৮২, চতুর্থ অধ্যায়) সঠিকভাবেই সমালোচনা করেছেন এই মিথ্যা ধারণাকে যে গ্রামীণ ঋণ প্রতিযোগিতামূলক। কিন্তু তা থেকে তিনি ভ্রান্তভাবে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে গ্রামীণ ঋণ-বাজার অদক্ষ। উপরন্তু (আমাদের বিশ্লেষণে দেখা যায়) এ সিদ্ধান্তের ফলে মহাজনকে অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি চূড়ান্ত শোষণপরায়ণতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

১২ জটিলতা আরেকটু বাড়িয়ে অত্যুচ্চ (usurious) সুদের হারের ব্যাখ্যা সম্ভব কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে তা খুবই দুরূহ। বসু (১৯৮৭ক)তে আমি অ-সরলরৈখিক দর ও কাম্য আয়করের কিছু সুবিদিত উপপাদ্য কাজে লাগিয়ে সে চেষ্টা করেছি।

১৩ এই অংশে সামাজিক অনুমানের দ্বারা সমর্থিত সামাজিক শাসন ও বিচারব্যবস্থার দ্বারা রূপায়িত আইনের মধ্যে পার্থক্য করব না।

১৪ যেমন দুই উত্তরাধিকারীর মধ্যে ন্যায্যভাবে সম্পত্তি ভাগ করার জন্য আমরা গেম থিওরি ও অর্থনীতির সহজ নীতিসমূহ ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারি। একজন সম্পত্তি ভাগ করুক, অন্যজন যে কোনো একটি ভাগ বেছে নিক। বাকি ভাগটা পাবে যে সম্পত্তি ভাগ করেছিল, সে। উভয় উত্তরাধিকারীর পছন্দ যদি একই হয় তাহলে প্রত্যেকে, ভাগ কবা বাছাই যা-ই করুক, সমান লাভবান হবে। পছন্দ যদি আলাদা হয় তাহলে যে ভাগ তার সুবিধা বেশি হয় বটে, তবে ভাগ করার এই পদ্ধতিতে অন্তত কেউ এ অভিযোগ করতে পারবে না যে অন্যের পছন্দ করা ভাগটাই তার পছন্দ ছিল। আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভাষায় বিভাজন হবে অবধারিতভাবে ঈর্ষা-মুক্ত।

১৫ যেমন ১৯৫৮ সালের দিল্লি ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ আইন। তার বিখ্যাত ২১ ধারা—যা বিশেষ অবস্থায় স্বল্পকালীন লিজ-এর ব্যবস্থা রেখেছে—একটি ব্যতিক্রম মাত্র।

১৬ এটা এখন মোটামুটি ব্যাপকভাবে মেনে নেওয়া হয়। দ্রষ্টব্য Akerlof (১৯৭৬) ; Basu, (১৯৮৬) ; Basu, Jones ও Schlicht (১৯৮৭) ; Bardhan (১৯৮৭ক)।

১৭ এই সমস্যাটা ভেবে দেখুন। একটা ফোটো কি কথায় পুরোপুরি বর্ণনা করা সম্ভব ? এমন বর্ণনা যে শুধু তারই ভিত্তিতে, যে কখনো ফোটোটা চোখে দেখেনি, সে-ও সেটার হুবহু প্রতিরূপ এঁকে দিতে পারবে ? অধিকাংশ লোকই সম্ভবত বলবেন, না। এর অর্থ, আমি যদি একটা চুক্তি লিখতে চাই, যাতে আকাশটা একটা বিশেষ ফোটোর মতো দেখালে আমি একটা কিছু করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকব, তাহলে তেমন চুক্তি লেখার যথাযথ উপায় নেই, কেননা তাতে থাকতে হবে আকাশের একটা পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা।

AMARBOI.COM

নির্দেশিকা

Akerlof, G. (1970), 'The Market for "Lemons": Quality, Uncertainty and the Market Mechanism', *Quarterly Journal of Economics, 84.*

—(1976), 'The Economics of Caste and of the Rat Race and Other Woeful Tales', *Quarterly Journal of Economics, 90.*

Arrow, K. J. (1982), 'A Cautious Case for Socialism' in I. Howe (ed), *Beyond the Welfare State,* Schoeken Books.

Ashenfelter, O. and R. Oaxaco (1987), 'The Economics of Discrimination: Economists Enter the Courtroom', *American Economic Review* (paper and proceeding), 77.

Bardhan, P. K. (1987ক), 'Alternative Approaches to the Theory of Institutions in Economic Development' in Bardhan (1987খ).

—(1987খ), *The Economic Theory of Agrarian Institutions,* Oxford University Press.

Basu, K. (1984), 'Implicit Interest Rates, Usury and Isolation in Backward Agriculture', *Cambridge Journal of Economics,* 8.

—(1986), 'One kind of Power', *Oxford Economic Papers,* 38.

—(1987ক), 'Disneyland Monopoly, Interlinkage and Usurious Interest Rates', *Journal of Public Economics, 34.*

—(1987খ), *'Rural Credit Market: The Structure of Interest Rates, Exploitation and Efficiency',* in Bardhan (1987খ).

(1989) , 'Technological Stagnation, Tenurial Laws and Adverse Selection,' *American Economic Review,* 79.

Basu, K., E. Jones and E. Schlicht (1987), 'The Growth and Decay of Customs: The Role of the New

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Institutional Economics in Economic History', *Explorations in Economic History, 24.*
Bhaduri, A. (1977), 'On the Formation of Usurious Interest Rates in Backward Agriculture', *Cambridge Journal of Economics,* 1.
—(1986), 'Economic Power, Organisational Form and the Commercialisation of Backward Agriculture', mimeo: Delhi.
Chakravarty, S. (1975), 'Mahalanobis and Contemporary Issues in Development Planning', *Sankhya,* Series C: 37.
—(1987), *Development Planning: The Indian Experience,* Clarendon Press, Oxford.'
Guha, A. (1986), 'The Less Developed Economy in Fantasy and Myth', *Indian Economic Review,* 21.
Harcourt, G. C. (1972), *The Language of Morals,* Clarendon Press, Oxford.
Haw, R. M. (1952), *The Language of Morals,* Claredon Press, Oxford.
Mitra, A. (1979), *Calcutta Diary,* Rupa and Co. Calcutta.
Mukherji, B. (1982), 'Usurious Interest Rates and Price of Collateral: A Note', *Indian Economic Review, 17.*
Oi, W. (1971), 'A Disneyland Dilemma: Two-Part Tariffs for a Mickey Mouse Monopoly', *Quarterly Journal of Economics,* 85.
Olsen, E. O. (1987), 'Rent Control and Housing Maintenance, mimeo: Charlottesville.
Pigou, A. C. (1920), *The Economics of Welfare,* 4th edition, 1932, Macmillan Press.
Roemer, J. E. (1985), 'Rational Choice Marxism: Some Issues of Method and Substance', *Economic and Political Weekly,* 20, 24 August.
Rudra, A. (1980), *Indian Agricultural Economics: Myths and Realities,* Allied Publishers.
Sen, A. (1970), *Collective Choice and Social Welfare,* Oliver and Boyd.

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব

অর্থনীতিবিদরা নিয়ত কারণ ও ফলাফল নিয়ে ব্যাপৃত, অথচ কারণ বিষয়টি ঐতিহ্যগতভাবে দার্শনিকদের এক্তিয়ারভুক্ত হয়ে থেকেছে। সেইজন্যই অধ্যাপক হিকস-এর ছোট নতুন বই 'Causality in Economics' (Basil Blackwell, Oxford, ১৯৭৯) একটি অ-গতানুগতিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস ; একজন অর্থনীতিবিদ এত কারণের প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন নিজের বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। বইটি (এখন থেকে সংক্ষেপে Causality) তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায় হল কারণ ও সময় সম্বন্ধে একটি আধা দার্শনিক নিবন্ধ, সেটাই বইয়ের মূল উপজীব্য। চার থেকে সাত অধ্যায় অর্থনীতি-সম্পর্কিত। সে বিষয় থেকে নানা রকম দৃষ্টান্ত টানা হয়েছে বইয়ের প্রথম দিকে সূত্রায়িত কারণ সংক্রান্ত বিমূর্ত সূত্রগুলির সমর্থনে। শেষ অধ্যায় হল সম্ভাব্যতার (probability) ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা, সুর আবার দার্শনিক।

ইতিহাস আর বিজ্ঞানের সীমানায়

আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে এই যুক্তির দ্বারা যে অর্থনীতির সঙ্গে কারণের সম্পর্কটা বিশেষ ধরনের। তার একটা কারণ অর্থনীতি ও সময়ের মধ্যেকার বিশেষ সম্পর্ক।

হিকস-এর যুক্তি হল, নিরীক্ষামূলক (experimental) বিজ্ঞান ঐতিহাসিক সময়ের বহির্ভূত। এই অর্থে যে নিরীক্ষার সনতারিখ অবান্তর। পক্ষান্তরে অর্থনীতি সময়ের অন্তর্ভূত এবং এ দিক থেকে ইতিহাসের সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন। অতঃপর হিকসের সেই মন্তব্য যা ইতিমধ্যেই আপ্তবাক্যে উন্নীতি হতে চলেছে : 'ফলত অর্থনীতি যদি বিজ্ঞানের সীমানাবর্তী হয়ে থাকে তবে তা ইতিহাসেরও সীমানাবর্তী ; দুইয়েরই অভিমুখী হওয়ায় তা এক তাৎপর্যময় স্থানের অধিকারী' (পৃ ৪)। কিন্তু একটা বিষয় সময়ের অন্তর্ভূত, এ কথার মানে কি ?

হিকস কিছুকাল ধরেই এ বিষয় নিয়ে লিখছেন। Causality ও তাঁর অন্য কিছু লেখাপত্র [১] মন দিয়ে পড়লে পরিষ্কার হয়ে যায় যে এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চাইছেন অর্থনৈতিক তথ্যগুলি 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যসমূহের মতো স্থায়ী বা পুনরাবৃত্তি যোগ্য নয়' ('Revolutions', পৃ ৩)। এই মতটি যুক্ত তাঁর আরেকটি মতের সঙ্গে যে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিভিন্ন সময়ে প্রযোজ্য। তবে সময়ের নিজস্ব কোনো প্রভাব নেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়—দুটি ভিন্ন সময়ে সব কিছু যদি একই থাকে তাহলে, ফলও এক হতে হবে। এমন দার্শনিক মতবাদ আছে যাতে এই প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য নয়, তবে অর্থনীতিবিদরা সাধারণভাবে এটা মানেন আর হিকসের পরবর্তী মন্তব্যাদি (Causality, পৃ ১০৬) থেকে মনে হয় তিনিও মানেন।

তাহলে, যদি বলা হয় যে নিরীক্ষার সময়টা তাৎপর্যপূর্ণ, সে কথার মানে কি? একটা প্রতিজ্ঞা ধরুন 'ক খ-এর কারণ'। হিকসের অবস্থানের আসল কথা হল, অর্থনীতির এমন কথা আমরা হামেশা বলি বা বলতে বাধ্য হলেও আসলে এমন সাধারণ প্রতিজ্ঞা তাতে অচল। বরং সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এই জাতীয় কোনো সীমাবদ্ধ উক্তির 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন দুনিয়ায় ক খ-এর কারণ'। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যই নিশ্চয় এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সেগুলো ঐ সময়ের সামগ্রিক চরিত্রের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে জড়িত যে নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের পুনর্নির্মাণ করা তো যায়ই না, এমন কি ধারণাতেও সেগুলোকে আলাদা ক'রে সূত্রায়িত করা যায় না। আর সেই জন্যই আমাদের প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে সময়কে টেনে আনতে হয় 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন দুনিয়ায় ক খ-এর কারণ'। যখন প্রাসঙ্গিক সময়টা খোলাখুলি উল্লেখ করা হয় না, তখনও তার প্রচ্ছন্ন থাকে। হিকসের মৌলিক প্রতিজ্ঞা—যে অর্থনীতি সময়ের অন্তর্ভূত—এটা তা একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা।

এবার আমরা বুঝতে পারব, হিকস কেন দাবি করেন যে অর্থনীতির বিপরীতে বিভিন্ন বিজ্ঞান সময়ের অন্তর্ভূত নয়। এই প্রতিজ্ঞাটি দেখুন একটা মিনার থেকে একটা পাথর ফেললে পাথরটা সেকেন্ডে ৩২ ফিট হারে ত্বরণ লাভ করবে (সংক্ষেপে, 'প' প্রতিজ্ঞা)। তর্কের খাতিরে কল্পনা করুন, ঊনবিংশ শতকে আবহাওয়া অত্যন্ত লঘু ছিল, বিংশ শতকে তা অত্যন্ত ঘন। তখন দেখা যাবে, প ঊনবিংশ শতকে সত্য, বিংশ শতকে নয়। এটা দেখে বিজ্ঞানীরা প্রথমে হয়তো বলবেন, 'প ঊনবিংশ শতকে সত্য'। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা বুঝবেন যে উক্ত শতকের একটা বিশেষ বিষয়ই শুধু এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক—লঘু আবহাওয়া। তখন তাঁরা প্রকল্পটি থেকে সময়ের উল্লেখ বাদ দিয়ে বলবেন, 'প শূন্য স্থানে সত্য'। হিকস আসলে বলতে চান যে এটা সাধারণ বিজ্ঞানেই সম্ভব। অর্থনীতিতে, 'কিনসের তত্ত্ব ত্রিশের দশকে প্রযোজ্য ছিল' জাতীয় প্রতিজ্ঞার বেলায় ত্রিশের দশকের সারমর্ম আলাদা করে প্রতিজ্ঞাটিকে ত্রিশের দশকের উল্লেখ না করে বলা অত্যন্ত কঠিন, হয় তো বা অসম্ভব।[২]

মতটা তাৎপর্যপূর্ণ ও আগ্রহজনক, তবে এটাও খেয়াল করা দরকার যে অর্থনৈতিক গবেষণার এক বৃহৎ অংশ হল তার তত্ত্বগুলিকে সময়ের বাইরে নিয়ে আসারই প্রয়াস। আধুনিক macroeconomic গবেষণার অনেকটাই তাই নিয়োজিত, ত্রিশের দশকের কোন কোন বৈশিষ্ট্য কিনসবাদকে তখন সত্য করে তুলেছিল, সেটা বের করার কাজে। ফলত বিভিন্ন অর্থনীতির শ্রেণীবিভাগের জন্য Malinvaud-র চেষ্টা।

হিকস দাবি করেছেন, অর্থনীতিতে এক প্রকার দ্বৈত দৃষ্টি প্রয়োজন—অতীতমুখী ও ভবিষ্যৎমুখী। জ্যোতির্বিদ্যার একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত তুলনা (তুলনীয়তা কতখানি তা অবশ্য প্রশ্নসাপেক্ষ) হিসাবে ব্যবহার করেছেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, না সূর্য পৃথিবীকে, সেটা পুরোপুরি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। শিশু আর পাদ্রি ভাবে সূর্যই ঘুরছে, কিন্তু তাদের তাই বলে নির্বুদ্ধিতার দোষে দোষী করা চলবে না। উৎকৃষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীর এই দ্বৈত দৃষ্টি প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা ও যুক্তিশীলতার সঙ্গে নির্ণয়বাদের যে সুবিদিত অসঙ্গতি, তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যও হিকস এই দ্বৈত দৃষ্টির যুক্তি ব্যবহার করেছেন। নির্ণয়বাদ যদি সত্য হয় তাহলে ব্যক্তিকে আমরা তার কাজের জন্য দায়ী করতে পারি না।[৩] তাছাড়া তখন যুক্তিশীলতারই বা মানে কি দাঁড়ায়? J.R. Lucas তাই লেখেন, 'নির্ণয়বাদকে শুধু মানবজাতি নয়, যুক্তিশীলতার পক্ষেও হুমকি বলে ধরা হয়।'[৪] অর্থনীতির এক বৃহৎ অংশের কেন্দ্রে রয়েছে যুক্তিশীলতা, তাই তৎসংক্রান্ত বিতর্ক অর্থনীতিবিদের পক্ষে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিকস দ্বৈত দৃষ্টির উপদেশ দিয়ে অর্থনীতিবিদকে ত্রাণ করতে চেয়েছেন অতীতকে দেখুন নির্ণয়বাদী চোখে, কিন্তু ভবিষ্যৎকে নয়। এটা মোটেও সমাধান নয়, সমস্যাটার দিকে চোখ বুজে থাকা। কখনো-সখনো এ বুদ্ধিটা কাজে লাগে বটে, কিন্তু এ ফাঁপর থেকে বেরোনোর পথ খোঁজার নিশ্চয় যৌক্তিকতা আছে। পরিশিষ্টে কয়েকটা পাতা লাগানো হোল এই উদ্দেশ্যে।

কারণের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

কারণ কি? তাঁর 'The Austrian Theory of Capital and its Rebirth in Modern Economics' প্রবন্ধে হিকস লিখেছেন 'ভবিষ্যতে প্রসারিত দুটি বিকল্প পথ আমরা তুলনা করি। একটাতে কোনো নতুন "কারণ" ক্রিয়া করছে না অন্যটাতে করছে। পথ দুটোর তফাৎ হল সেই কারণের ফল।' পদ্ধতিটা অতি সাবলীল, তবে এমন একটা কাল্পনিক দুনিয়ার কথা চিন্তা করা কঠিন যাতে বাস্তবে সংঘটিত কোনো কিছু ঘটছে না, অথচ অন্য সব কিছু একই আছে। সমস্যাটা আসলে হল, দুনিয়াটাকে আমরা পরস্পর বিচ্ছেদ্য ঘটনার সমাহার বলে ভাবছি কিনা, তাই।

Causality-তে হিকস আরেকটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা আরো সংক্ষিপ্ত ও দ্ব্যর্থক, এবং যার সারমর্ম একই তদনুযায়ী 'ক খ-এর কারণ' মানে 'ক-নয় খ-নয়ের দ্যোতক (implies)'। এতেও সমস্যা আছে। প্রথমত, 'কারণ'-এর সংজ্ঞানির্ধারণের সমস্যাটা পরিণত হল সমান প্রহেলিকাময় 'দ্যোতক'-এর সংজ্ঞানির্ধারণের সমস্যায়। দ্বিতীয়ত, 'ক-নয়' কথাটা বর্ণনা হিসাবে বেশ অস্পষ্ট। (এ সমস্যার আলোচনায় আর এগোনোর আগে আমার বলে রাখা উচিত, হিকস এ সব সমস্যা সম্পর্কে অনবহিত নন। তবে এ বিষয়ে পরে আসছি।) এ উক্তিটি নিন হাওয়ায় ওড়া লাল ঝাণ্ডাটা ছিল ষাঁড়ের তেড়ে আসার কারণ। ধরুন, 'ক'-এর মানে 'হাওয়ায় ওড়া নীল ঝাণ্ডা? ডাণ্ডায় ঝুলে-পড়া লাল ঝাণ্ডা? নাকি তাবৎ পতাকার অনুপস্থিতি? সবই তো ক-নয়। আসলে ক-নয় কোনো বিশেষ সামাজিক অবস্থা নয়, একাধিক সামাজিক অবস্থার সমাহার। এদিক থেকে দেখলে হিকসের সংজ্ঞা মোটেও পরিষ্কার নয়। ষাঁড় নানা কারণেই তেড়ে আসতে পারে, নিছক লাল ঝাণ্ডা না থাকাটা তার শান্ত আচরণের গ্যারান্টি নয়।

সমস্যাটা অবশ্য হিকসের মতো সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন লেখকের নজর এড়িয়ে যায়নি, তিনি তার মোকাবিলাও করেছেন সরাসরি (পৃ ৮ ও ২৬)। তাঁর যুক্তি হল, 'ক-নয়' অর্থপূর্ণ হবে কোনো বিশেষ তত্ত্বের প্রসঙ্গে। এতে কিছুটা সুরাহা হলেও পুরো সমস্যার সমাধান হয় না। একটি সাধারণ ভারসাম্যের মডেলই ধরুন। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র বহির্জনিত (exogenous) ভেদকগুলি অন্য সব কিছু একই থাকার শর্তে (Ceteris paribus) পরিবর্তিত হতে পারে; অন্য সব কিছু একই থাকার শর্তে অপরাপর যে কোনো ভেদকের পরিবর্তনই প্রহেলিকাময় ও সাধারণত অসম্ভব। যেমন একটি নব্য-ধ্রুপদী সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারসাম্যের মডেলে আমরা যদি চাহিদার উপর দাম-পরিবর্তনের প্রভাব জানতে চাই তাহলে অন্য সব কিছু একই থাকার শর্তে দুটি ভিন্ন দাম বিচার করে আমরা তা জানতে পারি না। তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন দাম ভিন্ন ভিন্ন বহির্জাত অবস্থার সঙ্গে যুক্ত। তাই দাম-পরিবর্তনের কথা ভাবলেই বহির্জনিত ভেদকগুলির পরিবর্তনেরও অবকাশ রাখতে হয়। আর এইসব পরিবর্তন অনন্যভাবে জানা নেই। ফলে আমাদের গিয়ে পড়তে হয় উপরোল্লিখিত সমস্যায়। কেবলমাত্র কারণটা বহির্জনিত ভেদক হলে খুবই গুরুতর হতে পারে কারণ বাস্তবে কোনো বহির্জনিত ভেদক না থাকাও সম্ভবপর (অর্থনীতিতে বহির্জনিত ভেদক সম্বন্ধে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী একটি মন্তব্যের জন্য Causality-র পৃ ২২ দ্রষ্টব্য)।

আসলে বোধ হয় এ বইয়ে 'কারণ'-এর একটা যুক্তিনিষ্ঠ সংজ্ঞা আশা করাটাই ভুল—তার জন্য দ্বারস্থ হওয়া উচিত কোনো দার্শনিক সন্দর্ভের। কারণ বা শক্তির মতো কোনো দুরূহ ধারণার অবতারণার জন্য দুটো চরম পথ আছে (তৎসহ তাদের নানা রকম সংমিশ্রণ) প্রথমে সাবধানে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করে তারপর তা ব্যবহার করা ; বিকল্পে তা সোজাসুজি ব্যবহার করতে শুরু করে দেওয়া—এই আশায় যে তার সম্বন্ধে লোকের একটা মোটামুটি সদৃশ ধারণা আছে,[৬] অথবা অন্ততপক্ষে পড়তে পড়তে তারা তার অর্থ শিখে নেবে।[৭] হিকস দ্বিতীয় পথটি নিয়েছেন, কোনো ক্ষতি নেই তাতে।

অতঃপর হিকস অগ্রসর হয়েছেন কারণের শ্রেণীবিভাগে। এখানে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন তিনি। দুর্বল কারণ, সবল কারণ, বিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছেদ্য কারণ, অধিক্রমী (overlapping) কারণ, পারস্পরিককারণ, সমকালিক কারণ, স্থিতীয় (static) কারণ—এগুলোর কয়েকটাকে বাদ দিলে, বা অন্তত নাম না দিলে, তেমন কোনো ক্ষতি হত না।

হিকসের যুক্তি হল, ফলের তুলনায় কারণের প্রাক্কালতা বিষয়ক হিউমের নীতিটি অলঙ্ঘ্য নয়, কারণ ফলের সমকালিকও হতে পারে। বেশ অভিনব তাঁর যুক্তি। তিনি দাবি করেন, আমরা ভ্রান্তভাবে বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক কারণ ও ফল এক-একটি কাল-বিন্দুতে ঘটে এবং এই বিশ্বাস থেকেই আমরা আঁকড়ে রয়েছি হিউমের নীতিটিকে। বাস্তবে কারণ ও ফল কাল-ব্যবধান (internal) জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে। যেমন , গত রাত্রির সুনিদ্রার কারণ ছিল রাতভোর বৃষ্টি। এটা সমকালিক কারণের দৃষ্টান্ত। তাতে এটাও প্রমাণিত হয় যে পারস্পরিক কারণ একটি পৃথক বর্গ (category), কেননা সুনিদ্রা নিশ্চয় বৃষ্টির কারণ ছিল না।

এবার আমরা অর্থনীতিতে স্থিতীয় বিশ্লেষণের অর্থ বোঝার প্রস্তুতি অর্জন করেছি। সমকালিক কারণে আমরা যদি কাল-ব্যবধানকে অসীমের দিকে বিস্তৃত করতে থাকি তাহলে তার সীমায় (limit) আমরা যা পাই তা হল স্থিতীয় কারণ—অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতীয় বিশেষণের ভিত্তি।

একটা আগ্রহজনক ব্যাপার হল, কারণের শ্রেণীবিভাগের জন্য হিকস যদিও মৌলিকভাবে সময়কে এনে ঢুকিয়েছেন, নীতিগতভাবে তার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই। বিমূর্ত মডেল নির্মাণে সময়ের কোনো উল্লেখ না করেও এক ভেদককে কারণগতভাবে অন্য ভেদকের পূর্ববর্তী বলে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। Herbert Simon এটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর 'Causal Ordering and Identifiability' (W.C. Wood ও T.C. Koopmans সম্পাদিত 'Studies in Economics Method', Yale University Press, ১৯৫৩ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) নামক প্রবন্ধে। তাতে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমীকরণগুলিকে একটি সরলরৈখিক (linear) বিন্যাসে সাজানোর পদ্ধতি ছকেছেন, যাতে ভেদকগুলর মধ্যেকার কারণক্রম চিহ্নিত করা যায়। সময় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাঠামো সমকালিক ও পারস্পরিক কারণের কথা বলা সম্ভব।

বাস্তবে সময় অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে অনেক অর্থনৈতিক মডেলই সময়নির্ভর নয়। হিকসের 'স্থিতীয় কারণ' (Static causality) এই মডেলগুলোতে কারণ ব্যাখ্যার একটা সম্ভাব্য পথ, একমাত্র নয়। Simon-এর অ-কালিক (atemporal) কারণের ধারণাও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ আরেকটি জটিল প্রশ্নে। কারণ হল তথ্যসমূহের এক প্রকার সম্পর্ক, কিন্তু শুধু যুক্তি দিয়ে দুটি তথ্য যুক্ত করা যায় না। ফলত যে কোনো কারণ সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞায় কিছু অভিজ্ঞতাবাদ নিহিত থাকবেই। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা কারণ নিয়ে প্রায়শ বাস্তবে এমনভাবে কথা বলি যেন তা অভিজ্ঞতাবাদের বিকল্প, যেন তা দুটি পৃথক তথ্যের মধ্যে কোনো নিগূঢ় যোগসূত্র উদ্‌ঘাটন করে দেয়। কিন্তু সে আশা বৃথা। অভিজ্ঞতাবাদ থেকে নিস্তার নেই, আর তাই হিকস বলেছেন যে কারণের 'সূচনা কোনো প্রতিজ্ঞা থেকে, বিভিন্ন চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত কোনো সম্পর্ক থেকে, আর সেটা অবরোহ থেকে লাভ করা যায় না' (পৃ ২৮)।

তৃতীয় অধ্যায়টি অতি-সরল বলে প্রতিভাত হতে পারে, বিশেষত এই সব প্রশ্ন নিয়ে আগে ভাবা না থাকলে। আসলে এখানে রয়েছে অনেক সূক্ষ্ম বিচার, অনেক অন্তর্দৃষ্টি। এই সুযোগে এখানে কারণ ও অভিজ্ঞতাবাদের সম্পর্ক ভালো করে দেখে নেওয়া যেতে পারে। তা করতে গিয়ে আমরা অবশ্য তথ্য ও তত্ত্বের পার্থক্য নিরূপণের সেই সুপরিচিত সমস্যায় জড়াব না তবে যাকে আমরা তথ্য বলছি তা যে তাত্ত্বিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল হতে পারে, এই সম্ভাবনা মেনে নিলে যে সত্যিকারেরই নানা সমস্যার উদ্ভব হয় সে কথা অস্বীকার করার কোনো প্রচেষ্টাও আমরা তা বলে করছি না। পরবর্তী যুক্তিধারা Causality দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু তার অন্তর্ভুক্তি নয়, তাই হিকসের উপর তা আরোপ করা উচিত হবে না।

মনে করুন, শিকাগোর এক অধ্যাপক প্রচুর উপাত্ত (data) সংগ্রহ করে দেখেছেন যে যখনই টাকার যোগান বেড়েছে, তার এক বছর পরে দামও চড়েছে। এ থেকে তিনি একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞায় উপনীত হয়েছেন 'টাকার যোগানবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দেয়।' একটা কথা সাধারণত শোনা যায় যে, প্রতিজ্ঞাটি বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতানির্ভর এবং যতক্ষণ না দেখানো যাচ্ছে যে টাকার যোগানই মূল্যস্ফীতির কারণ ততক্ষণ তা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। পেছনে এই বিশ্বাস লুকিয়ে আছে যে কারণ যেন কোনো উপায়ে আমাদের অভিজ্ঞতাবাদ থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু তা হবার নয়।

উপরের প্রতিজ্ঞাটির কারণগত ব্যাখ্যা কি হতে পারে? সম্ভবত এই রকমের কিছু যেহেতু (১) টাকার যোগান বৃদ্ধির মানে লোকের হাতে বেশি টাকার উদ্বৃত্ত, এবং (২) লোকের হাতে টাকার উদ্বৃত্ত বাড়লে লোকে বেশি ব্যয় করে, এবং (৩) ব্যয় বাড়লে দাম বাড়ে—অতএব এটা পরিষ্কার যে টাকার যোগানবৃদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতির কারণ।[৮]

লক্ষ্য করুন যে এ যুক্তির সব কটি অংশ—১, ২ ও ৩—বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতামূলক প্রতিজ্ঞা। সুতরাং আমরা যখন দুটি তথ্যের মধ্যে কোনো 'কারণ' আরোপ করি তখন আসলে আমরা তাদের একটি থেকে অন্যটিতে যাবার পথ ক্ষুদ্রতর অংশে ভেঙে নিই মাত্র—সে অংশগুলির প্রত্যেকটাই অভিজ্ঞতানির্ভর। অতএব কারো কাছে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকাগোবাসী অধ্যাপকের প্রতিজ্ঞাটি বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী বলে গ্রহণীয় না হয় তাহলে কোনো কারণগত ব্যাখ্যাও তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। অর্থাৎ অভিজ্ঞতাবাদের উপরোক্ত অভিযোগ ধোপে টেকে না।

বরং অনেক যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় যে প্রতিজ্ঞাটি অগ্রহণীয় সহসম্পর্ক (correlation) ভিত্তিক বলে নয়, তা যথেষ্ট মজবুত সহসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই। আমরা খুব বৈধভাবেই অধ্যাপকের কাছে দাবি করতে পারি, তিনি টাকা ও দামের সহসম্পর্কের আরো ভালো তথ্য দাখিল করুন।

ফলত আমাদের ফিরে যেতে হয় আধুনিক তত্ত্ববিস্তারে প্রায়শ-লঙ্ঘিত সেই সনাতন নিয়মে যে, কোনো তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধগুলিকে হতে হবে সিদ্ধান্তগুলির চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য। [৯] পরিভোক্তা তত্ত্বের কোনো কোনো সংস্করণে ঠিক এর উল্টো অনুভূতিই হয়—'দাম কমলে চাহিদা বাড়ে' এই নিয়ম যেসব স্বতঃসিদ্ধ থেকে উৎপাদন করা হয় সেগুলোর চেয়ে নিয়মটাই যেন বেশি স্পষ্ট ঠেকে।

কিন্তু এসবের সঙ্গে হিকসের মতের সম্পর্ক কি? আগেই উল্লেখ করেছি, অনেকের কথায় এ বিশ্বাস ফুটে ওঠে যে 'কারণ' বুঝি আমাদের বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদ থেকে মুক্তি দানে সক্ষম। পক্ষান্তরে হিউম দাবি করেছেন,[১০] কারণ সুপ্রতিষ্ঠিত সহসম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয়। হিকসের কথা হল, কারণ নির্দেশ করতে হলে চাই একটা 'তত্ত্ব'। তত্ত্ব বলতে তিনি কি বোঝাচ্ছেন তা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাখ্যাকারীও তাঁর শ্রোতাদের একযোগে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে কতগুলি মৌলিক তথ্যে—কারণ-সম্পর্ক প্রতিপন্ন হবে সেগুলোর সাহায্যেই। অতএব 'তত্ত্ব' বলতে হিকস যদি স্বীকৃত তথ্যের একটি কাঠামো বোঝান তাহলে এ অংশে আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, তাঁর মতটা ঠিক তা-ই দাঁড়ায়।

তবে হিকসের বিশ্লেষণের অন্যতর ভাষ্যও যে সম্ভবপর তা অস্বীকার করার কোনো চেষ্টা এখানে নেই।

অর্থনীতি থেকে দৃষ্টান্ত

অর্থনীতি সংক্রান্ত অংশটির শুরু অ্যাডাম স্মিথ থেকে স্থিতীয় তত্ত্বের একটি উদাহরণ দিয়ে। তার মাধ্যমে অবতারণা করা হয়েছে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ধারণার—অর্থনৈতিক নীতি (economic principle) এবং ভারসাম্যের পদ্ধতি। প্রথমটি হামেশা ব্যবহৃত হয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে। তার মোদ্দা কথা হল, আপেক্ষিক সুবিধা আপেক্ষিক সম্পদের জন্ম দেয়। দুভাবে নীতিটিকে দেখা যেতে পারে। প্রথমত অভিজ্ঞতামূলক প্রতিজ্ঞা হিসাবে। তখন নীতিটার সার কথা দাঁড়ায় এই যে, মানুষ যুক্তিশীল। তবে এ কথাটাও বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পরস্পর নির্ভর দুনিয়ায় একটি গোষ্ঠীর প্রত্যেকে যুক্তিশীল আচরণ করলেও সমগ্র গোষ্ঠীর আচরণ অযৌক্তিক হতে পারে (তার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে গেম থিওরিতে)। অতএব কড়াকড়িভাবে বলতে গেলে অর্থনৈতিক নীতি কেবল ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলাতেই প্রযোজ্য। [১১] যদি তাকে যৌথ সিদ্ধান্ত বা আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেই হয় তাহলে তা আর ব্যক্তিগত যুক্তিশীলতার সমার্থক থাকে না, আরো জোরালো এবং সম্ভবত অভিজ্ঞতাগতভাবে ভ্রান্ত একটি অনুমিত হয়ে দাঁড়ায়।

আরেক ভাবেও নীতিটি ব্যাখ্যা করা যায়—একটি সিদ্ধান্ত হিসাবে। ক্রিয়া অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেগুলোকেই অর্থনৈতিক ক্রিয়ারূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়। মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে প্রতিনিয়ত সর্বাধিক কল্যাণের লক্ষ্যে আচরণ করে না, এই সত্যের সঙ্গে তখন আর এই নীতির আদৌ কোনো বিরোধ থাকে না।

যে পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক নীতির ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—অর্থাৎ পাত্রপাত্রীরা তাদের গ্রহণযোগ্য অবস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানগুলি বেছে নিয়েছে—সেটা হল ভারসাম্যের পরিস্থিতি। ভারসাম্যের পদ্ধতি দ্বারা আমরা একই সময়ে বিভিন্ন বিকল্প অনুমিতির (assumption) ভিত্তিতে বিকল্প ভারসাম্যগুলিকে তুলনা করে থাকি।

স্থিতীয় তত্ত্বাবলীর প্রসঙ্গে হিকস 'ধ্রুপদী' অবিচল অবস্থা (steady state) ও 'নব্যধ্রুপদী' উৎপাদন অপেক্ষক (production function) বিচার করেছেন এবং দাবি করেছেন তিনি কোনোটারই সমর্থক নন।

আরো একবার তিনি ফিরে গেছেন সমকালিক কারণে। এবার তিনি দাবি করেছেন, 'আধুনিক অর্থনীতিতে এটাই কারণ সম্পর্কের স্বভাবসিদ্ধ রূপ' (পৃ ৬৩)। তা প্রতিপন্ন করার জন্য অনেক রকম দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন তিনি। সময় সময় দৃষ্টান্তগুলিকে দুমড়ে-মুচড়ে সমকালিক কারণের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর চেষ্টা দেখা যায়। কতগুলি ক্ষেত্রে তিনি নিজেই দেখিয়েছেন যে, কোনো কোনো কারণ ফলের পূর্ববর্তী, কিন্তু তারপর আবার নানাভাবে সংজ্ঞা সংশোধন করে সমকালিক করে দিয়েছেন সেগুলোকে। এই সব হিকস বনাম হিকস তর্কে সমকালিক কারণের সপক্ষে দেখানো কারণগুলিকে প্রায়ই কৃত্রিম মনে হয়। এর একটা বিপদ হল এই যে কেউ কেউ হয়তো ভেবে বসতে পারেন সমকালিক কারণের ধারণাটাই কৃত্রিম। তা কিন্তু সত্য নয়।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় কেইন্‌সীয় macroeconomics বিষয়ক। আলোচনার কেন্দ্র কারণ (সমকালিক ও ক্রমকালিক), যদিও হিকস ঘন ঘন ঢুকে পড়েন বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে। তাতে কিন্তু ভালোই হয়, কারণ বইয়ের কিছু শ্রেষ্ঠ অংশ পাওয়া যায় এই সব প্রসঙ্গ চ্যুতিতেই। সাধারণ ভারসাম্যের ধারণা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য (পৃ ৭৯, বিশেষত টীকা ১০) আগ্রহজনক, নবতর নগদ-তত্ত্বের (liquidity) বিষয়ে পরামর্শগুলি (পৃ ৯৬-১০০) অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

কেইন্‌সীয় macroeconomics বলতে হিকস বোঝেন বিনিয়োগ। সঞ্চয়, liquidity preference ও টাকার যোগান সংক্রান্ত বিশ্লেষণ। এতে কেইন্‌সের সবটুকু ধরা পড়ে না তা আমরা সবাই জানি। তথাপি অন্তত কেইন্‌সের মূল বিষয়গুলি বোঝাতে উক্ত বিশ্লেষণ ব্যবহার করায় খুব আপত্তির কারণ থাকতে পারে না, বিশেষ করে কেইন্‌স নিজেই যখন তা অসমীচীন মনে করেননি।[১২] তাঁদের মতান্তরগুলি এবং তাঁদের ক্রমশ অর্জিত মতৈক্য সুন্দরভাবে ধরা আছে হিকস ও কেইন্‌সের পত্রাবলীতে (দ্রষ্টব্য D. Moggeridge সম্পাদিত 'Collected Works of John Maynard Keynes' Vol ১৪, Macmillan, ১৯৭৩, পৃ ৭১-৮৩)।

উক্ত বিশ্লেষণের তিনটি উপাদান পরিভোগ অপেক্ষক, capital schedule-এর প্রান্তিক দক্ষতা, এবং liquidity preference। প্রথমে দুটোকে (এক-আধটু টানাটানি করে) সমকালিক কারণ সম্পর্কে হিসাবে ভাবা যেতেও পারে, সমস্যা ওঠে তৃতীয়টাকে নিয়ে। সেটা একটা stock relation, কাল-ব্যবধানের বদলে কালবিন্দুর সঙ্গেই তার যোগ। তা খাপ খায় ভালো ক্রমকালিক কারণের কাঠামোতেই—অর্থাৎ কারণ ফলের পরম্পরার সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এসেছে একটি নবতর নগদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বের (Liquidity Theory) সম্ভাবনা সম্বন্ধে হিকসের আলোচনা।

সম্ভাব্যতা (probability) সম্বন্ধে দুটি মত

শেষ অধ্যায়টি হল সম্ভাব্যতার ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন পৌনঃপুন্য (frequency) তত্ত্ব এবং স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব।

পৌনঃপুন্য তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো ঘটনার সম্ভাব্যতা নির্ধারিত হয় একটি নিরীক্ষার বিপুল সংখ্যক পুনরাবৃত্তিতে উক্ত ঘটনার পৌনঃপুন্য দ্বারা। সূত্রটিকে এই চিরাচরিত রূপে পেশ করার পর হিকস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুপুঙ্খ সচেতনতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে এই সংজ্ঞার একটা অসুবিধা আছে। নিরীক্ষার পুনরাবৃত্তিগুলি হুবহু এক হলে তার ফলও এক হবেই (যদি অবশ্য দুনিয়া সম্পর্কে নির্ণীয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেওয়া যায়)। সুতরাং অর্থবহ ফল পেতে গেলে পুনরাবৃত্তিগুলি এক রকম হতে হবে, অথচ হুবহু এক হলে চলবে না।

হিকসের মতে অর্থনীতির জন্য অন্য সংজ্ঞাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিকল্প মতটি—কেইনস ও Jeffreys যার সমর্থক—সম্ভাব্যতাকে দেখে বিশ্বাসের মাত্রা রূপে। Jeffreys-এর সম্ভাব্যতা-সংক্রান্ত স্বতঃসিদ্ধগুলি আলোচনা করতে গিয়ে হিকস এই স্বতঃসিদ্ধের সমালোচনা করেছেন 'নির্দিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে যে দুটি বিকল্প খোলা থাকে, হয় তাদের একটি অন্যটির চেয়ে বেশি সম্ভাব্য কিংবা দুটিই সমান সম্ভাব্য'। এটা Consumer Preference Theory-র completeness স্বতঃসিদ্ধের তুল্যরূপ (analogue) এবং সেটা যেভাবে সমালোচিত হয়েছে এটাকেও হিকস যেভাবে সমালোচনা করেছেন একটা নির্দিষ্ট ঘটনার জন্য যেমন বেশি সম্ভাব্য ও কম সম্ভাব্য ঘটনা থাকবে সাধারণত ঠিক তেমনি থাকবে মধ্যবর্তী ঘটনাসমূহ, যেগুলো আমাদের নির্দিষ্ট জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বেশি সম্ভাব্য নয়, কমও নয়। ওগুলোকে কোনো পংক্তিভুক্ত করা যায় না।

হিকসের সমালোচনা হয়তো যথার্থ, কিন্তু সম্ভাব্যতার এই শিথিলতর (weaker) ধারণাটির উপযোগিতা কতটা তা খুব পরিষ্কার নয়। আর উপযোগিতা যদি না থাকে তাহলে হিকসের প্রদর্শিত পথে পশ্চাদপসরণ কতটা যুক্তিযুক্ত? এ তো জানা কথাই যে একটা অনুমিতিকে শিথিল করে চলি না কেননা তাদের ব্যাখ্যা-ক্ষমতাও সেই সঙ্গে কমতে থাকে। উপযোগিতাকে যখন সংখ্যাবাচক (cardinal) থেকে ক্রমবাচক (ordinal) করা হল তখন তা ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিল, কারণ হিকস দেখিয়েছিলেন যে পরিভোক্তা তত্ত্বের বেশির ভাগ ফল তাতে অপরিবর্তিত থাকে। হিকস অনুরূপ কাজ এক্ষেত্রে না করেই আমাদের বলছেন সম্ভাব্যতার তুলনা থেকে সম্পূর্ণতার স্বতঃসিদ্ধ (completeness axiom) বর্জন করতে।

হিকসের অবস্থানের প্রবণতা অবশ্যই অর্থনীতিতে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিসমূহের প্রাসঙ্গিকতা খর্ব করার দিকে এবং হিকস সে সিদ্ধান্তে উপনীতও হয়েছেন। 'পরিসংখ্যানিক বিচারধারা'—তার মানে সম্ভবত econometrics—যত কার্যকরী বলে সাধারণত মনে করা হয় ততটা তা না-ও হতে পারে। তাঁর মতে তা অপ্রতুল তথ্য থেকে সাধারণ নিয়মাবলী উপপাদন উৎসাহিত করে এবং একটা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অপরিমাপ্য (non-quantifiable) তথ্য উপেক্ষা করতেও প্ররোচিত করে। এটা সমর্থনীয় নয়। 'সম্ভাব্যতা-গমন নিশ্চয় বিস্মৃতির সাফাই হতে পারে না' (পৃ ১১২)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছনে তাকিয়ে

কিন্তু এত সবের পরে বইটার সামগ্রিক মূল্যায়ন কি হবে ? এক কথায় তার জবাব হয় না, এবং সেটাই এ নিবন্ধের কারণ। তবু অতি-সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়েও আমি এই কটি কথা বলব। অত্যন্ত অ-গতানুগতিক বই এটি। নানা জায়গায় আছে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির ঝিলিক, রাশি রাশি খুঁটিনাটির আবরণ ভেদ করে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ে অবলীলায় আলোচিত করে তোলার ক্ষমতা। অথচ এত সব সত্ত্বেও মোটের উপর বইটা কিন্তু নৈরাশ্যজনক। তার একটা কারণ অবশ্যই এই যে হিকসের কাছ থেকে লোকে বড় বেশি আশা করে। বইটি অর্থনীতি ও দর্শন উভয়ের প্রান্তবর্তী তা স্থানে স্থানে মননদীপ্ত হলেও তার বিরাট অংশ যান্ত্রিক এবং জ্ঞানের উক্ত দুটি শাখার কোনোটাতেই বিশেষ আলোড়ন ঘটাবে বলে বোধ হয় না। এতে অবশ্য এ সত্য বদলায় না যে, আজ থেকে বহু বৎসর পরে বিংশ শতাব্দীর দিকে তাকিয়ে অর্থনীতিবিদদের কাছে হিকস প্রতিভাত হবেন Pareto, Jevons ও Marshall-এর মতোই অসাধারণ বলে।

পরিশিষ্ট : যুক্তিশীলতা ও নির্ণয়বাদ

যুক্তিশীলতা ও নির্ণয়বাদের তথাকথিত বিরোধের একটি নিকট জ্ঞাতি আছে। একটা প্রচলিত মত হল 'নির্ণয়বাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত, অতএব প্রচেষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই।' এই ধরনের যুক্তি থেকেই মার্কসীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অসংগতির অভিযোগ ওঠে। মার্কসবাদীর মতে সমাজতন্ত্র অনিবার্য, তাহলে তিনি লোককে তার জন্য চেষ্টা করতে বলেন কেন ? এ যেন, একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এক দিকে গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন আর অন্য দিকে তা-ই সফল করার জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। আমি দেখাব, এই কূটাভাস এবং অন্য যে কূটাভাসটি হিকস উল্লেখ করেছেন—যুক্তিশীলতা ও নির্ণয়বাদের সংঘাত—দুই-ই একই কারণ থেকে উদ্ভূত।

Lyons তাঁর 'Determinism and Knowledge' (Analysis ১৯৭৫) প্রবন্ধে বলেছেন যে এই জাতীয় কূটাভাসের মূলে আছে 'এই বিশ্বাস যে সব কারণই বিলিয়ার্ড বলের সমপর্যায়ী'। তাঁর যুক্তি সঠিক, কিন্তু সর্বজনীন নয়। নির্ণয়বাদের প্রসঙ্গে বিলিয়ার্ড বল ঠিক কি অর্থে মানুষের থেকে আলাদা ? হিকস যে সমস্যা তুলেছেন তার বিচারের মধ্য দিয়ে এ প্রশ্নের জবাব মিলবে।

প্রথমে দরকার নির্ণয়বাদের একটা সংজ্ঞা। অতি-সরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে বলা চলে যে একজন ক্রিয়াকারী (agent) নির্ণয়াধীন হবে যদি তার ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণের উপর নির্ভরশীল হয়। মানুষের বেলায় নির্ণীত তার বংশগতি (heredity) ও পরিবেশ দ্বারা—সংক্ষেপে এগুলোকে বলা যাক 'বাহ্যিক উপাদান' (factor)।

উপরের সব কটি হেত্বাভাসের (fallacy) মূলে রয়েছে নির্ণয়বাদ সম্বন্ধে একটি প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস—একটি লোকের জীবনের কোনো ঘটনা যে বাহ্যিক ছাড়া অন্য কোনো factor-এর উপরেও নির্ভরশীল হতে পারে এই সম্ভাবনাটাই যেন নির্ণয়বাদ মানে না। অর্থাৎ রাম 'ম্যাকবেথ' কিনা তা যেহেতু নির্ণয়বাদ অনুযায়ী বাহ্যিক factor-এর উপর নির্ভর করে, সেহেতু তা যেন শেকসপিয়রের দিকে রামের কোনো বিশেষ ঝোঁকের উপর নির্ভর করতে নেই। ক যদি খ-এর অপেক্ষক হয়, তাতে এটা বোঝায় না যে ক গ-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষক নয়। যৌগিক (composite) অপেক্ষকও অপেক্ষক। অতএব ক নিশ্চয় গ-এরও অপেক্ষক হতে পারে, আবার গ হতে পারে খ-এরও অপেক্ষক। এই হেত্বাভাসের নাম দেওয়া যাক FIB—fallacy of the ignored bridging function।

এবার নির্ণয়বাদ ও প্রচেষ্টার সমস্যার কথা ভাবুন। নির্ণয়বাদ সত্য হলে জীবনে প্রচেষ্টার কোনো দরকার নেই, এ বিশ্বাসটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিচার করা যাক। রাম একটা পরীক্ষা দিতে চলেছে এবং সে তাতে পাশ করতে চায়। প্রশ্ন হল, তার পড়াশোনা করা উচিত কিনা। মনে হতে পারে, নির্ণয়বাদ সত্য হলে উচিত নয়। এ সিদ্ধান্তের উৎস হল এই বিশ্বাস

(ক) নির্ণয়বাদ সত্য হলে পরীক্ষার ফল রামের পড়া বা না-পড়ায় প্রভাবিত হবে না।

কিন্তু (ক) ভুল, FIB থেকে তার উদ্ভব। (ক) আসলে পড়া এবং না-পড়ার সেট ও পাশ-করা এবং ফেল-করার সেটের মধ্যে কোনো অপেক্ষকের অস্তিত্ব অস্বীকার করছে। স্পষ্টতই নির্ণয়বাদ তা দাবি করে না। নির্ণয়বাদ শুধু বলে যে রাম পাশ করবে না ফেল করবে তা পূর্বনির্ধারিত। বস্তুত এমন একটা অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব খুবই সম্ভব যে কেবলমাত্র পড়াশোনা করলেই একজন পরীক্ষার্থী পাশ করবে। পড়াশোনা করবে কি করবে না তা স্থির করার জন্য রামের শুধু জানতে হবে ঐ প্রাকৃতিক নিয়মটি, যার তাৎপর্য হল

(খ) রামকে পাশ করতে হলে পড়তে হবে।

নির্ণয়বাদ সত্য হলে সে পাশ করবে কিনা সেটা পূর্বনির্ধারিত কিন্তু তা কেবল এই কারণে সে পড়াশোনা করবে কিনা সেটা পূর্বনির্ধারিত। এতএব নির্ণয়বাদ (খ)-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, আর তাই (ক) মিথ্যা। সুতরাং রাম যখন জিগ্যেস করে পরীক্ষার জন্য তার পড়া উচিত কিনা, তখন নির্ণয়বাদীর ফাঁপরে পড়ার কোনো হেতু নেই। পরীক্ষার ফল পূর্বনির্ধারিত, এ সত্য কোনোভাবেই স্পর্শ করে না এই জবাবকে যে, 'পাশ করতে পেলে পড়তে হবে।' নির্ণয়বাদী হন বা না হন, ঐ জবাব অপরিবর্তিতই থাকে। অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রকে অনিবার্য বলা আর লোককে তার জন্য চেষ্টা করতে বলার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অবশ্য এই বলার পেছনে এ বিশ্বাস নিশ্চয়ই আছে যে লোকে সমাজতন্ত্রের জন্য অনিবার্যভাবে চেষ্টা করবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী যদি তাঁর পূর্বাভাসিত গ্রহণ সফল করার জন্য প্রচার চালান তা বোকামি হবে ; কিন্তু তার কারণ এই নয় যে পূর্বনির্ধারিত ঘটনা সফল করার জন্য প্রচার চালানোটা বোকামি..., তার কারণ শুধুমাত্র এই যে সমাজতন্ত্রের মতো গ্রহণকে মানুষ চেষ্টা করে সম্ভব করতে পারে না।

এবার যুক্তিশীলতা ও নির্ণয়বাদের সমস্যাটা দেখুন। প্রথমেই বুঝে নেওয়া ভালো যে যুক্তিশীলতা বলতে যদি আচরণে কোনো প্রকার সঙ্গতিনিষ্ঠা বোঝানো হয় তাহলে তার সঙ্গে যে নির্ণয়বাদের কোনো বিরোধ নেই সে কথা অতি স্পষ্ট। যে চৌম্বক কাঁটাটি সর্বদা উত্তরমুখী হয়ে থাকে তার আচরণ সঙ্গতিনিষ্ঠও বটে, নির্ধারিতও বটে। নির্ণয়বাদ ও যুক্তিশীলতার বিরোধের কথা আসলে ওঠে যখন যুক্তিশীলতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় কোনো ধরনের প্রেষণার (motivation) আকারে—যেমন সর্বাধিক সুখ বা উপযোগিতা সন্ধানের প্রেষণা।

বিরোধটা এইভাবে প্রকাশ করা যায়। জিবের (গ) ও (ঘ) উক্তি দুটি বিচার করুন।

(গ) একজন ক্রিয়াকারীর ক্রিয়া বাহ্যিক factors দ্বারা নির্ধারিত।

(ঘ) একসারা বিকল্পের মধ্যে একজন ক্রিয়াকারী বাছাই করে যাতে তার সুখ বা প্রেয়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(preference) সর্বাধিক হতে পারে।

(ঙ) উক্তিটা কিন্তু tautology নয়। তার মানে হল, বিকল্পগুলির ক্ষেত্র জুড়ে ক্রিয়াকারীর একটা প্রেয়তা সম্পর্কে (preference relation) বিদ্যমান এবং সে সর্বাধিক প্রেয়তা বাস্তবায়নের জন্য বাছাই করে (অর্থাৎ সে বাছাই করে তার বাছাই সেটের মধ্য থেকে)।

সমস্যাটার পেছনে রয়েছে এই বিশ্বাস যে (গ) সত্য হলে (ঘ) মিথ্যা। Lucas (ঐ, পৃ ২৭) লিখছেন 'নির্ণয়বাদ সত্য হলে আমার ক্রিয়া সত্যকার অর্থে আর আমার ক্রিয়া থাকে না, এমন ভাবা যায় না যে সেগুলো কথা হয়েছে কারণের চেয়ে যুক্তির তাগিদে।' তা সত্য নয়। যুক্তি ও কারণ পরস্পর বর্জিত নয়। নির্ণয়বাদের অর্থ এ নয় যে ক্রিয়াকারীর ক্রিয়া প্রেয়তাবোধ দিয়ে নির্ধারিত নয়। তা শুধু বলে যে তার ক্রিয়া পুরোপুরি বাহ্যিক factors দ্বারা নির্ধারিত। একজন ক্রিয়াকারীর ক্রিয়া তার প্রেয়তাবোধের অপেক্ষক এবং তার প্রেয়তাবোধ আবার বাহ্যিক factors-এর অপেক্ষক—এটা তো স্পষ্টতই সম্ভব। তার মানে (গ) ও (ঘ) দুই-ই সত্য হতে পারে—তাদের পরস্পর সংহতিবিহীন মনে হচ্ছিল FIB-র দরুণ। বিলিয়ার্ড বল আর মানুষ উভয়ের ক্রিয়াই নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা পৃথক তা এবার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। উভয়ের বেলাতেই (গ) সত্য, কিন্তু (ঘ) সত্য কেবল মানুষের বেলায়। উভয়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক factors পুরোপুরি আচরণকে নির্ধারণ করে, কিন্তু কেবল মানুষের বেলাতেই বাহ্যিক factors থেকে আচরণ অবধি কারণশৃংখলের গতিপথটি যুক্তি আর প্রেয়তাবোধের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত। অনুরূপভাবে নির্ণয়বাদের অর্থ এ নয় যে শৃংখলিত মানুষ আর নিশ্চল মানুষের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই—শেষোক্ত ব্যক্তি ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে।

টীকা

১ দ্রষ্টব্য S.J. Latsis সম্পাদিত 'Method and Appraisal in Economics' (Cambridge University, 1976) গ্রন্থে J.R. Hicks-এর 'Revolutions in Economics'; এবং A.M. Tang ইত্যাদি সম্পাদিত 'Evolution, Welfare and Time in Economics' গ্রন্থে J.R. Hicks-এর 'Some Questions of Time in Economics'

২ এর বিপরীতে দেখুন Nagel-এর মন্তব্য তাঁর 'Assumptions in Economic Theory'-তে (American Economic Review, মে ১৯৬৩) : 'একটি তত্ত্বের সব না হলেও অধিকাংশ প্রতিজ্ঞা' মুক্ত হওয়া উচিত স্থান-কালের 'সীমাবদ্ধতা' থেকে।

৩ যেমন Ved Mehta বলেছেন, প্রত্যাশিত কাব্যময়তা সহকারে, তাঁর Fly and the Fly-Bottle, Encounters with British Intellectuals-এ (Weidenfeld and Nicholson, ১৯৬১, পৃ ২১৪) 'সব চোর কি চৌর্যোন্মাদ ? চেঙ্গিস খান আর এ্যাডলফ হিটলাররা পরিস্থিতিরি অসহায় শিকার ? ফাঁসির দড়ির বদলে তবে কি চাই মনোরোগের চিকিৎসা ?'

৪ 'The Freedom of the Will', J.R. Lucas, Oxford, ১৯৭০, পৃ ২৮। সমস্যাটা অবশ্য বহুপুরাতন, কান্ট তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, 'Fundamental Principles of the Metaphysic of Ethics'-এ (T.K. Abbott কর্তৃক অনূদিত, Longmans, ১৯৬৯, পৃ ৭৮-৯০)।

৫ J.R. Hicks ও W. Weber সম্পাদিত 'Carl Menger and the Austrain School of Economics'-এ প্রকাশিত।

৬ তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ 'সময়'। আমরা সবাই জানি এটা কি, কেউ যখন এর সম্বন্ধে কথা বলে শ্রোতারা বুঝতে পারে। কিন্তু তার সংজ্ঞানির্দেশের অধিকাংশ প্রয়াস পর্যবসিত হয়েছে শব্দার্থের কচকচিতে। সেই যে গল্প আছে : এক ভদ্রলোক স্থানীয় জবানে খুব দড় নন, নেমন্তন্নে পৌঁছতে না পাবার চিন্তায় পীড়িত হয়ে বাসের সহযাত্রীকে জিগ্যেস করলেন, "Sir, what is time?" সহযাত্রী ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক, লাফিয়ে উঠে বসে তিনি ভাষণ দিয়ে চললেন যতক্ষণ না বাস গিয়ে পৌঁছাল ডিপোতে। ভদ্রলোকটির নেমন্তন্ন তো মাঠে মারা গেলই, জ্ঞানচক্ষুও উন্মীলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল না।

৭ বাচ্চারা এভাবেই শেখে। বাচ্চাকে কেউ বর্গক্ষেত্রের সংজ্ঞা শেখায় না। কথাটা আমরা ব্যবহার করি, আর নানা বর্গক্ষেত্র দেখিয়ে চলি। বাচ্চা ক্রমে অর্থটা ধরে ফেলে। বাবা যখন একটা বর্গাকার বাগান দেখান সে ঠিক তার অর্থ বুঝতে পারে—যদিও বাবা কিংবা সে নিজে তার সংজ্ঞা দিতে পারবে না।

৮ যুক্তিটা খুব উঁচুদরের নয় অবশ্য। তবে বর্তমান উদ্দেশ্যে উঁচুদরের যুক্তি দরকার নেই, দরকার ওটাকেই উঁচুদরের যুক্তি বলে মেনে নেওয়া।

৯ এ মত অবশ্য মিলটন ফ্রিডম্যানের 'Essays in Positive Economics (University of Chicago Press, ১৯৩৫) গ্রন্থের 'The Methodology of Positive Economics' প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের একেবারে বিপরীত। আরো দ্রষ্টব্য A.K.Sen, 'Description as Choice', (Oxford University Papers, ১৯৮০, Vol ৩২, পৃ ৩৫৩-৩৬৯)।

১০ তাঁর 'An Enquiry Concerning Human Understanding'-এ। অবশ্য এটা হল, যাকে বলা যায়, হিউমের প্রচলিত মত। তাঁর মতের অন্যবিধ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য O. Hanfling, 'Hume's Idea of Necessary Connection' (Philosophy, ১৯৭৯, Vol ৫৪, পৃ ৫০১-৫১৪০)।

১১ এমন কি এখানেও ব্যাপারটা পুরো নিছক নয়। মানুষের অজ্ঞতা ও অ-সুখবাদী প্রেষণার (Non-hedonistic motivation) গুরুত্ব প্রায়ই উল্লেখিত হয়েছে, এখন তার নতুনত্ব-প্রিয়তার উপরেও জোর পড়ছে। F. Night তাঁর 'What is Truth in Economics?' (Journal of Political Economy, ১৯৪০, Vol ৪৮) প্রবন্ধে বলেছিলেন ...আমাদের আগ্রহ আরো অন্তর্নিহিতভাবেই অনেকাংশে অনুসন্ধানমুখী ; কাজের তাগিদ অংশত ফলাফল সম্বন্ধে কৌতূহল, সুতরাং তা নির্ভর ক্রিয়াসম্পাদনকালীন আংশিক অজ্ঞতার উপর।

১২ তবু আপত্তি করলে তাতে বের্গসঁর প্রতি বার্নার্ড শ-র বাক্যবাণ মনে পড়ে যায় 'আরে মশায়, আমি আপনার চেয়ে আপনার দর্শন ঢের ভালো বুঝি।' ঘটনাটা আছে Russell-এর 'Protraits from Memory'-তে (Simson ও Schuster, ১৯৫১, পৃ ৭৮)।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৮১)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসাগরীয় যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের রাজস্ব নীতি

ভূমিকা

ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে ১৯৯১-এর জানুয়ারির উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলাফল গুরুতর হয়েছিল। আমাদের আন্তর্জাতিক ঋণ বহু বছর ধরেই অলক্ষ্যে একটানা বেড়ে চলেছিল, কিন্তু এবার আমরা নিক্ষিপ্ত হলাম এক ঋণ-সংকটে। ১৯৯১-এর জুনে ভারতের ঋণ পরিশোধ বাকি পড়ার উপক্রম হল। নতুন অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ১৯৯১-এর জুলাইয়ে এবং ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারিতে যে দুটি বাজেট পেশ করেছিলেন সেগুলোতে ছিল এই সংকটেরই প্রভাব। এই নিবন্ধে আমি রাজস্ব সংক্রান্ত ঐ নতুন উদ্যোগগুলি বিচার করব। পরবর্তী দুটি অংশ হল ১৯৯১-এর বাজেটের পর্যালোচনা—তা Economic and Political Weekly (৩১ আগস্ট, ১৯৯১)-তে প্রকাশিত 'পরিবর্তনকালীন বাজেট' ('Budget in the Time of Change') নামক আমার প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। তৃতীয় অংশটি ১৯৯২-এর বাজেটের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, এ বইয়ের জন্য নতুন ক'রে লেখা।

প্রেক্ষাপট

আমার মনে আছে, আমার ছোটবেলায় বাবার বন্ধু এক খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ আমার বোনকে স্বদেশি কাপড় পরার উপদেশ দিয়েছিলেন (কারণটা সম্ভবত ছিল কোনো বিশেষ স্কার্টের প্রতি বোনের পক্ষপাতিত্ব)। বিলেতি কেতা অনুকরণের বিরুদ্ধে বোনকে উপদেশ দিয়েছিলেন বলে 'আমরা কেন বিলেতের অনুকরণ করব?' এ যুক্তি কিন্তু আমাকে নিদারুণ অস্বস্তিতে ফেলেছিল, কারণ আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম যে বিলেতের নকল আমার বোনের চেয়ে অনেক বেশি করছেন তিনি নিজে—ওরা আমাদের অনুকরণ করে না, এই কারণে ওদের অনুকরণ না করাটা তো আসলে ওদেরই অনুকরণ করা! এটাও তখনই বুঝেছিলাম যে বোন পড়েছে জবর ফাঁদে। স্কার্টটা পরলে তা বিলেতের নকল, আবার বাবার বন্ধুর কথা মতো না পরলেও তা বিলেতের নকল—এমন কি আরো গভীর অর্থে।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মপন্থা প্রণয়নকারীদের ফাঁপরটা আমার বোনের মতো অত কঠিন না হলেও খুব অন্য রকমের কিছুও নয়। সারে ভর্তুকি বজায় রাখতে বললে তা হবে ধনী-কৃষক প্রভাবজোটের তাঁবেদারি, না বললে তা হবে IMF-এর চাপের কাছে আত্মসমর্পণ। প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে বললে তা হবে অস্ত্র-উৎপাদকদের প্রভাবজোটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে নতিস্বীকার, না বললে তা হবে অতিশক্তির চাপ মেনে নেওয়া।

এবার যেসব কর্মপন্থা শেষ অবধি স্থিরীকৃত হবে সেগুলো সাম্প্রতিক অন্য যে কোনো বাজেটের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করবে বিরোধী দলগুলির মতামতের উপর। আমার বিশ্বাস, কাঠামোগত পরিবর্তন ও অবাধ নীতি প্রবর্তনে বামপন্থীরা একটা গতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারেন, তাঁদের তা করা উচিতও। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে এ পর্যন্ত অধিকাংশ বামপন্থী (কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদে) স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়ে থেকেছেন, যে কোনো পরিবর্তনের আভাস মাত্র তাঁদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে প্রতিকূল। বামপন্থীদের কাছ থেকে অবাধ নীতির সমর্থন আশা করা আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী ঠেকে। বিষয়টা তাই ব্যাখ্যা করা যাক।

অর্থনৈতিক চিন্তার মর্মকেন্দ্রে রয়েছে বাজারের স্বাভাবিক শক্তিগুলির স্বীকৃতি। কর্মপন্থা প্রণয়নের সময় চাইলেই ঐ শক্তিগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জোর করে তাদের চেপে দিলে অবধারিতভাবে তারা ব্যাধি হয়ে ফিরে আসে। ভারতে বাজারের শক্তিগুলির কণ্ঠরোধ করার জন্য এত লাল ফিতে ব্যবহৃত হয়েছে যে আজ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো সরকারের কি করা উচিত তা খুবই স্পষ্ট—বাজারের মুক্তি সাধন। বাম বা ডান, যে কোনো কর্মপন্থার এটা পূর্বশর্ত। আমি যেহেতু সমতা ও ন্যায্যতার চূড়ান্ত মূল্যে বিশ্বাসী, তাই আমি চাই অবাধনীতি ঐ লক্ষ্যেই ব্যবহৃত হোক—লাতিন আমেরিকার কোথাও কোথাও যেমন ঘটেছে সেভাবে যেন তা ক্ষুদ্র উচ্চকোটির স্বার্থসেবী না হয়ে পড়ে। এখানেই বামপন্থীরা পারেন গুরুত্বপূর্ণ, হয়তো বা নির্ধারক, ভূমিকা পালন করতে।

এই অংশে আমি ১৯৯১-এর বাজেট ও ব্যাপকতর সংস্কারগুলিকে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করব। এই দৃষ্টিকোণ শিল্পক্ষেত্রে উদারনীতি, মুক্ত বাণিজ্যনীতির এবং এমন এক বৈদেশিক বিনিময়-হার নীতির সমর্থক যার লক্ষ্য অদূর ভবিষ্যতে টাকার current account convertibility প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আমি এই কর্মপন্থাগুলি সমর্থন করি আর্থিক সামাজিক সমতা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলেই। ভারতের প্রবৃদ্ধি-হার তত উঁচু নয় ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বড় চিন্তা আমার এই যে শতকরা ৬৬ ভাগ ভারতীয় বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় না ; শতকরা ৭ ভাগ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে না ; অন্য যে কোনো দেশ, এমন কি হয়তো মহাদেশের চেয়েও, ভারতে দরিদ্রের সংখ্যা বেশি।

বাঞ্ছনীয় কর্মপন্থাসমূহের দ্বিতীয় গুচ্ছটি হল দরিদ্রদের জন্য প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবলী। এত দিন যা হয়েছে তার চেয়ে অনেক ব্যাপকভাবে এই সব ব্যবস্থা চাই। প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা বলতে বোঝায়, এগুলোর দরুণ বাজারের বিকৃতি যেন যথাসম্ভব কম হয়।

অতীতে সারের দাম নিয়ে যা ঘটেছে তা হল বিকৃতিসাধক হস্তক্ষেপের একটি দৃষ্টান্ত। এ বাজেটের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ হল সারের দাম বাড়িয়ে ভরতুকির একাংশ তুলে দেওয়া। এটা দুঃখজনক যে নানা দিকের চাপের ফলে শেষ পর্যন্ত যা বেরোল তা এমন একটা জগাখিচুড়ি যার উপযোগিতা রীতিমতো সন্দেহজনক। দ্বৈত দাম-ব্যবস্থায় দুর্নীতির উদ্ভব অনিবার্য। তাছাড়া, ক্ষুদ্র বা বড় যে কোনো চাষি কেন যে একটানা সারে ভরতুকি ভোগ ক'রে যাবে, তা-ও পরিষ্কার নয়।

কিন্তু ক্ষুদ্র চাষিরা কি দরিদ্র নয় ? সাম্যের খাতিরে কি তাদের ভরতুকি দেওয়া উচিত নয় ? আমার জবাব, না। সব গরিব সার কেনে না। ফলে সারে ভরতুকি দেওয়ার অর্থ, যারা একই সঙ্গে গরিব ও সারের ক্রেতা শুধু তাদেরই বিশেষভাবে সাহায্য দেওয়া। গরিবদের নিয়েই যদি আমাদের চিন্তা, তাহলে সাধারণভাবে সব গরিবের কাজে লাগে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু বাছাই-করা ক্ষেত্রেই আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত। যেমন বুনিয়াদি পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা।

এই সব প্রাথমিক মন্তব্যাদির পর আমি এবার বিশেষভাবে বিচার করব ১৯৯১-এর কেন্দ্রীয় বাজেট এবং অতঃপর ফিরব অর্থনৈতিক সংস্কারের কিছু বৃহত্তর প্রশ্নে।

১৯৯১-এর কেন্দ্রীয় বাজেট

সব বাজেটের মতো এ বাজেটেরও প্রশংসনীয় ও নিন্দাযোগ্য দিক আছে। শুরুতে এমন দুটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যেগুলো ব্যাপক সমর্থনের দাবি রাখে। সে দুটি হল—(১) সারের ভরতুকি কমানোর (বা সারের দর বাজারের স্তরে তোলার) সিদ্ধান্ত, এবং (২) খাতার হিসাবের (book entry) বদলে বাজারের হিসাবে বিনিয়োগ সংস্থাগুলির (investment companies) বিত্ত মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত।

দুটো পদক্ষেপই সম্ভবত রাজস্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে, হয়তো ঘাটতি কমাতে সাহায্য করবে। আমি কিন্তু সেজন্য তাদের সমর্থন করছি না। তারা বাজারের ক্রিয়া অবাধ করার সংকেত—এটাই তাদের সবচেয়ে বড় গুণ।

ভারতবর্ষে আমাদের বিশ্বাস করার ঝোঁক আছে যে সম্পত্তি অন্তর্নিহিত মূল্যের অধিকারী। আমাদের মাথায় ঢুকতে চায় না যে তার মূল্য নির্ভর করে লোকে কিভাবে তা দেখছে তার উপর, এবং সেটাই তার বাজার-দরে প্রতিফলিত হচ্ছে। তা না বোঝার ফলেই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মূল্য পুরোনো হিসাবের খাতার অঙ্কে (book-entry) ধার্য হয় এবং প্রভূত কর ফাঁকি সম্ভবপর হয়। উপরের (২) নং সিদ্ধান্তটি তাই সঠিক দিকে একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ। অথচ মজার ব্যাপার হল, যে সব শিল্পপতি বাজারের সপক্ষে গলা ফাটাচ্ছেন তাঁরাই আবার আপত্তি তুলছেন বাজার-দরভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের বিরুদ্ধে।

ভরতুকি রাজস্ব-ব্যবস্থার উপর একটা ক্রমবর্ধমান ভার বিশেষ। পুরো আশির দশক জুড়ে বেড়ে বেড়ে ১৯৮৯-৯০-এ তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে দাঁড়াল মোট জাতীয় উৎপাদনের (GDP) শতকরা ২·৫ ভাগ। ১৯৯০-৯১-এর সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী তা শতকরা ১·৮। এর অর্থ, শুধুমাত্র ভরতুকি তুলে দিয়েই ১৯৯০-৯১-এর শতকরা ৩·৪ ভাগ ঘাটতিকে নামিয়ে আনা যেত ১·৬-এ। বেশ কিছু ভরতুকি অবশ্য গরিবদের প্রত্যক্ষ সাহায্যকল্পে প্রবর্তিত, অতএব আমি সেগুলো বিলোপের বিরোধী ; কিন্তু একটা বিপুল পরিমাণ (সম্ভবত অর্ধেকের বেশি) ভরতুকি হল শক্তিশালী প্রভাবজোটের দাবির ফল।

একই ধরনের যুক্তিতে বোঝা যায় যে বেতনের তুলনায় উপরি সুবিধার (perquisite) অনুপাত কমানোর জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ দেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই কর্মচারীদের মাইনের একটা মোটা অংশ দেওয়া হয় উপরি সুবিধার আকারে। আসলে এগুলো এক ধরনের চোরা বেতন, যা আমাদের বাজারে—বিশেষত বাসস্থান ও জ্বালানির বাজারে—বিপুল বিকৃতির জন্ম দিয়েছে। উপরি সুবিধাগুলিকে নগদ বেতনে রূপান্তরিত করলে সরকারের প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হতে পারে এবং আমার মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সংস্থাগুলি বেচে দেওয়ার চেয়ে তা ঢের ভালো পথ। সরকার প্রভূত পরিমাণ অফিসের জায়গা, জমি ও বাসস্থানের মালিক। খাতার অঙ্কের বদলে বাজারের হারে সেগুলোর ভাড়া ধার্য করলে (আমার মতে তা-ই করা উচিত, বেসরকারি বিনিয়োগ-সংক্রান্ত আলোচনায় যে কারণ দেখানো হয়েছে সেই একই কারণে) ধরা পড়বে সরকারের বার্ষিক ব্যয় আসলে কত বেশি। মনে করুন সরকার কোনো সাংসদ (M P) বা সিভিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্ভেন্টকে এমন একটি ফ্ল্যাট দিয়েছে, খোলা বাজারে যার মাসিক ভাড়া ২০,০০০ টাকা। তার মানে সরকার কার্যত মাসে ২০,০০০ টাকা খরচ করছে। এই উপরি সুবিধা বন্ধ ক'রে সরকার যদি মাইনে আরো ১০,০০০ টাকা বাড়িয়ে দেয় তাহলেই মাসিক ১০,০০০ টাকার সাশ্রয় হয়ে যায়। খোলা বাজারে এই রকম ৫০০০ ফ্ল্যাট ভাড়া দিলে মাথাপিছু ১০,০০০ টাকার বাড়তি মাইনে বাদ দিয়ে সরকারের রাজস্ব বাড়বে বার্ষিক ৬০ কোটি টাকা।

কিন্তু উপরি সুবিধাকে নগদ বেতনে পরিবর্তিত করতে চাওয়ার প্রধান কারণ এই রাজস্ব সাশ্রয়ও নয়। সরকার যদি খোলা বাজারে পাওয়া পুরো ভাড়াটাও বাড়তি বেতন হিসাবে দিয়ে দেয় তবু পরিবর্তনটা বাঞ্ছনীয় হবে। কারণ ধ'রেই নেওয়া যায় যে ২০,০০০ টাকার বাড়তি বেতন থেকে ১০,০০০-এর বেশি বাসস্থানের জন্য ব্যয়িত হবে না, ফলে বাসস্থানের বাজার থেকে একটা বড় বিকৃতি অপসারিত হবে এবং বাসস্থানের যোগান বাড়বে। উপরন্তু বাড়বে লোকের সঞ্চয়।

বাজেটের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে কর-মকুব (Tax amnesty) পরিকল্পনা। যে কেউ তার কালো টাকা National Housing Bankএ (NHB) জমা রাখতে পারবে, কেবল শতকরা ৪০ ভাগ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে শাস্তিস্বরূপ। আমানতকারী তারপর ইচ্ছে করলে সঙ্গে সঙ্গেই বাকি টাকা তুলে নিতে পারবে। এইভাবে NHB যে অর্থ সংগ্রহ করবে তা ব্যয় হবে বস্তি অপসারণ ও দরিদ্রদের জন্য স্বল্পমূল্য বাসস্থান নির্মাণে।

প্রথমেই বলা ভালো, ১৯৮১-তে কালো টাকার বিনিময়ে যে Special Bearer Bonds বিক্রি করা হয়েছিল তার চেয়ে এ পরিকল্পনা ভালো। বণ্ডগুলো ১৯৯১-এ বার্ষিক শতকরা ২ ভাগ সুদ সহ পরিণত (mature) হবে এবং তখন বিনা প্রশ্নে তাদের ব্যাংক থেকে নগদ করে নেওয়া যাবে। টাকা ছাপানোর বদলে এটা কেন সরকারের রাজস্ব আদায়ের উৎকৃষ্টতর পথ ব'লে বিবেচিত হয়েছিল ? সম্ভবত টাকা ছাপানো মুদ্রাস্ফীতিজনক ব'লে। কিন্তু Special Bearer Bonds-এর বেলায় বাস্তবে যা ঘটল তা আরো খারাপ। লোকে যখন বণ্ডগুলো কিনতে লাগল তখন প্রথম প্রথম বেশ টাকা এল সরকারের হাতে। কিন্তু শিগগিরই ক্রেতারা বুঝে ফেলল যে বণ্ড সার্টিফিকেট ঠিক টাকারই অনুরূপ, হয়তো তার চেয়েও ভালো। প্রথমত, বণ্ডগুলো একেবারেই বেনামি—কোনো নাম নেই ওগুলোতে। দ্বিতীয়ত, বণ্ডের মালিক হওয়াটা যেহেতু শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয় তাই নিশ্চিন্তে তা কালো বা সাদা যেমন খুশি টাকা হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। গত দশ বৎসর ধ'রে তাই এক ফলাও ব্যবসা চলছে, যাতে বণ্ডগুলো খাটছে টাকা হিসাবে। ফলত, টাকা ছাপালে যা হত তার চেয়ে এতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সম্ভবত বেশিই হয়েছে।

এ বছরের কর-মকুব পরিকল্পনা মূল্যস্ফীতিকে চাগিয়ে দেবে না। তাছাড়া Bearer Bond যেমন নিছক বাজেট ঘাটতি কমিয়েছিল, তার বদলে এই পরিকল্পনা রাজস্ব ঘাটতি কমাবে। তৎসত্ত্বেও এই মকুব পরিকল্পনাকে নিরুৎসাহী করা উচিত এই কারণে যে সমাজে কর সংক্রান্ত অসততার ব্যাপারে তা ভ্রান্ত প্রণোদনার জন্ম দেয়।

ভবিষ্যতে কালো টাকাকে সরকারের রাজস্বের উৎসরূপে ভাবাটাই ছাড়তে হবে। কালো টাকা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত কারণ তা নৈতিকতা-বিরুদ্ধ এবং ঠিক লাল ফিতের মতোই তা-ও খর্ব করে বাজারকে (এই শেষোক্ত কথাটা হৃদয়ংগম হয় না সাধারণত)।

আমি চাই, গরিবদের সরাসরি সাহায্যার্থে বরাদ্দ আরো অনেক বাড়ানো হোক। এটা সত্য যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ১৯৯০-৯১-এর ৮৬৫ কোটি টাকা থেকে ১৯৯১-৯২-এ ৯৭৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোটি টাকায় উঠেছে, গ্রামীণ উন্নয়নে পরিকল্পিত ব্যয় ৩১১৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৫০৮ কোটি টাকা। তবে ভারতীয় রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় এমনই নিচু যে এ দিকে বিপুল বৃদ্ধির অবকাশ আছে।

পরিশেষে বাজেটের মূল্যস্ফীতি-ঘটিত ফলাফল কি দাঁড়াবে? মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সর্বদাই কঠিন, তবে আমার মনে হয় বাজেট বাজার দরকে একটা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত ঊর্ধ্বমুখী ঠেলা দিলেও তার দীর্ঘমেয়াদি মূল্যস্ফীতিকর প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কমই হবে। দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত ঊর্ধ্বমুখী ঠেলার কারণ হবে মাল-পরিবহণ, রেল ভাড়া, পেট্রোলিয়ামের দাম এবং কোনো কোনো আবগারি শুল্কের বৃদ্ধি। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘমেয়াদি বিচারে বৃহৎ ঘাটতিই বেশি মূল্যস্ফীতিকর। অতএব রাজস্ব ঘাটতি যে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৮·৫ ভাগ থেকে ৬·৭ ভাগে নেমে আসছে, সেটা একটা আংশিক দীর্ঘমেয়াদি সুরাহা।

এ বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। কারণ ওটাই বর্তমান সংকটের উৎস। অনেকেই বলেছেন—আমিও তার সঙ্গে একমত—যে বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংকট নেই, এটা আসলে আস্থার সংকট। তবু বোঝা দরকার যে আস্থার সংকট বেশি দিন চললে তা বাস্তব ক্ষেত্রের সংকটে পরিণত হয়।

এই সংকট আমাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের মধ্যে সংঘাত বাধিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের পরিচালনকে বিশেষভাবে দুরূহ ক'রে তুলেছে। দীর্ঘমেয়াদি বিচারে আমাদের এগোতে হবে অনেক বেশি অবাধ বাণিজ্যের দিকে, হয়তো টাকার current account convertibility-র দিকেও। কিন্তু এগুলো এক্ষুনি সম্ভব নয় কারণ অবাধতর বাণিজ্য আমাদের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের একটা স্বল্পমেয়াদি অবনতি ঘটাতে পারে, convertibility-র ফলে দেখা দিতে পারে পুঁজির নিঃসরণ।

অতএব বাজেটটি এদিক দিয়ে কেন যে এত নিরীহ ধরনের হয়েছে তা বোঝা কঠিন নয়। মুখ্য ও গৌণ বহিঃশুল্কের মূল্যানুপাতী হারের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে শতকরা ১৫০ এর অতিরিক্ত মাশুল বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু বেশির ভাগ মূলধনী দ্রব্যের আমদানি শুল্ক শতকরা ৮৫ থেকে ৮০-তে নামিয়ে আনা হয়েছে। এগুলো ক্ষুদ্র পরিবর্তন, কিন্তু এই সন্ধিক্ষণে এর চেয়ে প্রবলতর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব ছিল না। বস্তুতপক্ষে এই সব পরিবর্তনের থেকেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থমন্ত্রীর উচ্চারিত দীর্ঘমেয়াদি অভিপ্রায়। কোনো অর্থমন্ত্রী বোধ হয় এই প্রথম বললেন যে, মাশুলহ্রাস বাঞ্ছনীয় এবং এখনই তা ব্যাপক হারে সম্ভব না হলেও ঐ দিকেই আমাদের এগোনোর চেষ্টা করতে হবে।

বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি হয়েছে বাজেটের বাইরে। সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে জুলাই মাসে এক সপ্তাহের মধ্যে-শতকরা ২২ ভাগ অবমূল্যায়নের বিষয়টি। এ ব্যাপারে খুব জোরালো মতামত পোষণ করা কঠিন। ১৯৬৬ সালে ভারত ছিল স্থির বিনিময় হারের ব্যবস্থাধীন, তার তুলনায় আজ অনেক কম হবে অবমূল্যায়নের প্রভাব। আজকাল বিনিময়-হারে ছোটখাট রদবদল সব সময়ই ঘটছে, কাজেই অবমূল্যায়ন না ঘটলে এখন থেকে ছ মাস বাদে বিনিময়-হার যা দাঁড়াত অবমূল্যায়নের পরেও তা-ই দাঁড়ানো খুবই সম্ভবপর।

এ ব্যাপারে একগুঁয়ে মতামত পোষণ করার গলদ বুঝতে চাইলে সেইসব লোকের কথা ভাবুন যারা অভ্যাসগতভাবেই অবমূল্যায়নের বিরোধী। এদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে কি পুনর্মূল্যায়ন (revalue) করা উচিত তাহলেও সাধারণত তারা জবাব দেয় 'না'। অর্থাৎ তারা অন্তর্নিহিতভাবে স্থিতাবস্থারই সমর্থক, রিজার্ভ ব্যাংক যা ইতিমধ্যেই করেছে তার উপরই তাদের অটল আস্থা।

অবমূল্যায়ন কাজে লাগত যদি তা টাকার অধিকতর convertibility-র অভিমুখে একটি পদক্ষেপ রূপে ব্যবহৃত হত। REP লাইসেন্স (এখন Exim Script) নিয়মাবলীর কড়াকড়ি হ্রাস ও শতকরা ৩০ পর্যন্ত তার অনুপাত বৃদ্ধি এই জন্যই মূল্যবান।

তবে আমাদের সতর্ক হতে হবে অনাবাসী ভারতীয় সংক্রান্ত ব্যাপারটিতে। আরো অনাবাসী ডলার আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বর্তমান বাজেট দুটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। প্রথমটার সার কথা হল, ৩০ নভেম্বর ১৯৯১-এর আগে পাঠানো নগদ অর্থকে আমাদের কর-আইনের আওতার বাইরে রাখা। দ্বিতীয়টা হল মার্কিন ডলারে মূল্যায়িত India Development Bonds চালু করা। এইসব বণ্ডের সুদ হবে আয়কর মুক্ত, আসল হবে সম্পত্তিকর মুক্ত। বণ্ডগুলি পরিণত (mature) হবে পাঁচ বছরে। কর-আইনের আওতার বাইরে এগুলি দেশবাসীকে দান করা যাবে।

আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এই জাতীয় একটা কিছুর প্রয়োজন থাকলেও এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নিয়ে ভাবিত হতেই হয়। ভারত এখনও বেশ অনুকূল শর্তেই আন্তর্জাতিক ঋণ পায়। গড়ে আমরা সুদ দিই শতকরা ৬·৪ হারে—যেখানে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে সাধারণত দিতে হয় শতকরা ৮·৫-এর বেশি, এমন কি চীনকেও শতকরা ৭·৮ ভাগ। অনুরূপভাবে আমাদের ঋণগুলির গড় রেহাই-কাল (grace period) ছ বছর, আর্জেন্টিনার দু বছর, চীনের চার।

পক্ষান্তরে অনাবাসী ভারতীয়দের দেওয়া ঋণের শর্ত অনেক কঠোর। তার মানে, এ ঋণের পরিশোধ-দায় দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু, অনাবাসীরা দেশপ্রেমিক এবং তাদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ রাজনৈতিকভাবে নির্দোষ —এ সব বিশ্বাস একেবারেই ভুয়া। অনেক দেশেই অনাবাসীরা ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। যেমন নিকারাগুয়ায় কারা যে অধিকতর বিধ্বংসী ভূমিকা পালন করল—অনাবাসীরা না আন্তর্জাতিক ঋণসংস্থাগুলি—তা স্পষ্ট নয় মোটেও।

আশু ভবিষ্যতে, আমরা IMF বা অনাবাসী বা নিজস্ব সোজা যারই শরণাপন্ন হই না কেন, কোনোমতে টেনেটুনে চলা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। লক্ষ্যটা হবে কোনো রকমে ভেসে থাকা।

মধ্যমেয়াদি থেকে দীর্ঘমেয়াদি সীমার মধ্যে আমাদের রপ্তানি নীতি পুনর্বিচার করতে হবে, যাতে তাকে আরো উজ্জীবিত ক'রে তোলা যায়। গত চার বছর যাবৎ ভারতের রপ্তানি ভালোই চলছে। আমাদের আমদানি বৃদ্ধি রপ্তানি বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়নি, বাণিজ্য উদ্বৃত্তেরও কোনো দীর্ঘকালীন অবনতি ঘটেনি—যদিও এর উল্টো বিশ্বাসটাই ব্যাপক। ১৯৮০-৮১-তে আমাদের রপ্তানি ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪·৮ ভাগ, ১৯৮৯-৯০-এ শতকরা ৬·৪ ভাগ। ১৯৮০-৮১-তে আমাদের আমদানি ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৯·২ ভাগ, ১৯৮৯-৯০-এ শতকরা ৯·৩ ভাগ। মোট জাতীয় উৎপাদনে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের শতকরা অনুপাতের গড় ৮০র দশকের প্রথম পাঁচ বছরে ছিল ঋণাত্মক শতকরা ৩·৪, পরের পাঁচ বছরে ঋণাত্মক শতকরা ৩·২। কিঞ্চিৎ উন্নতিই বলতে হবে।

ক্রমবর্ধমান কাঠামোগত ভারবৈষম্যের তত্ত্ব তাই টেকে না। সংকটের উৎস অন্যত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান চিরকালই কিনারা-ঘেষা, রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি। সামান্যতম সংকটই তাই যে কোনো মুহূর্তে স্ফুলিঙ্গের কাজ করতে সক্ষম। ১৯৯০-৯১এ উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলস্বরূপ আমাদের পেট্রোলিয়াম ও পিচ্ছিলক (lubricant) আমদানির মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ৩৮০ কোটি ডলার থেকে এক লাফে বেড়ে দাঁড়াল ৬০০ কোটি ডলার। কুয়েত ও ইরাক থেকে অর্থপ্রেরণ প্রায় ৫০ কোটি ডলার কমে গেল, কমল পশ্চিম এশিয়ায় আমাদের রপ্তানি। এ সবেরই মিলিত ফলস্বরূপ দেখা দিল অনাবাসী ভারতীয় সহ ভারতের আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের মধ্যে আস্থার সংকট।

দীর্ঘমেয়াদি সমাধান রয়েছে আমাদের রপ্তানিতে। শুধু দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়া কেন, চীনের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যাবে যে আমাদের রপ্তানি আমরা বাড়াতে পারি অনেকগুণ। সেজন্য সঠিক বিনিময়-হারের নীতি, কাঁচামাল আমদানির মাশুল হ্রাস এবং প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল একটি দক্ষ দেশীয় অর্থনৈতিক পরিবেশ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের বাজার কাজ করে অন্য অধিকাংশ দেশের চেয়ে মসৃণভাবে। এখানে আয়কর কর্মচারীর 'সহযোগিতা' ক্রয় করা যায়, কেনা যায় ড্রাইভিং লাইসেন্স, টাকা দিয়ে এড়ানো যায় গাড়ির দূষণপরীক্ষা। যাঁরা বিশ্বাস করেন, সব কিছুরই বাজার-দর থাকা উচিত, তাঁরা একবার বিহার ঘুরে এলে টের পাবেন তাঁদের আদর্শের *বাস্তব প্রতিকৃতিটা কি রকম।*

অন্য দিকে এদেশে অর্থনৈতিক উদ্যোগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিদারুণভাবে সীমাবদ্ধ। ব্যবসা শুরু করা, মালের বিক্রয়দর ইচ্ছামতো স্থির করা, কোথায় মাল বেচা হবে তা ঠিক করা—সব কিছুই অবাঞ্ছিত বিধিনিষেধের নাগপাশে বন্দী। এই সব বিধিনিষেধের খানিকটা আমলাতান্ত্রিক, কিন্তু মানতেই হবে যে অনেক 'নিয়ন্ত্রণ'ই আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, হয়তো আমাদের দুর্ভাগ্যেরও, পরিণতি। তাই আমি যে বাজারের জন্য আরো বেশি স্বাধীনতা (অবশ্য আগের অনুচ্ছেদের স্বাধীনতা নয়) চাইছি—ভারতের বিপুল সংখ্যক অর্থনীতিবিদও আজ তা-ই চান—সেটার রূপায়ণ সচরাচর যতটা ভাবা হয় তার চেয়ে অনেক কঠিন।

এর সঙ্গেই জড়িত 'হস্তক্ষেপ'-এর (intervention) বিষয়টি। অর্থনীতিবিদকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে 'হস্তক্ষেপ'-এর সংজ্ঞাটি খুব সুনির্দিষ্ট নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণপন্থী চিন্তাবিদরা (যাঁরা চিন্তা করেন না তাঁরাও) বলেন যে বন্দুকের লাইসেন্স বিধি একটা ব্যক্তিস্বাধীনতা-খর্বকারী আইন। এ চিন্তার ভ্রান্তির উৎস হল এই বিশ্বাস যে সরকারই শুধু হস্তক্ষেপ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করতে পারে। একজনের বন্দুক ধারণের স্বাধীনতা যে আরেকজনের মানিব্যাগ ধারণের স্বাধীনতা খর্ব করতে সক্ষম এ বিষয়টা নজরেই পড়ে না।

সংক্ষেপে ১৯৯২-এর কেন্দ্রীয় বাজেট

১৯৯২-এর বাজেট একটা লক্ষণীয় বাজেট। তাতে রয়েছে অনেক সাহসী উদ্যোগ এবং পেশাদার অর্থনীতিবিদের মননকর্মের নিদর্শন। তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল টাকার আংশিক convertibility, আমদানি মাশুল হ্রাস এবং রাজস্ব ঘাটতি কম রাখার প্রয়াস। এ সবই প্রশংসনীয়। নৈরাশ্যজনক হল মৌলিক প্রয়োজনপূরণের বরাদ্দ বাড়াতে তার ব্যর্থতা এবং সরকারের অপচয়মূলক ব্যয় কমানোতে উদ্যোগের অভাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতকরা ১১০-এ সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার মাধ্যমে আমদানি মাশুল কমানো এবং ভবিষ্যতে তা আরো কমানোর আশ্বাস—অতীতের অর্থমন্ত্রীদের কথা ও কাজের থেকে এটা একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন, যা আমাদের অতি-সংরক্ষিত অর্থনীতিতে সমর্থনের যোগ্য।

আংশিক convertibitity পরিকল্পনাও সঠিক দিকে পদক্ষেপ, তবে তার বিপদগুলোও মাথায় রাখা উচিত। প্রথমত, এই পরিকল্পনায় ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে দেওয়া বিদেশি মুদ্রার (currency) শতকরা ৬০ ভাগ converted হবে বাজারের হারে, শতকরা ৪০ ভাগ সরকারি হারে। অনেকে যা বিশ্বাস করেন তার বদলে এতে দুই নয়, তিন বিনিময়-হারের ব্যবস্থার উদ্ভব হবে। কারণ যারা তাদের বিদেশি মুদ্রার কোনো অংশই সরকারি হারে ছাড়তে চাইবে না তারা হাওলার মাধ্যমেই কাজ চালাতে থাকবে এবং তার ফলে যত দিন বাজারি হার আর সরকারি হারের মধ্যে ফারাক থাকবে তত দিনই ও দুটোর পাশাপাশি থাকবে একটা হাওলা হার। আর ফারাক না থাকলে ৬০-৪০এর জটিল নিয়মটার কোনো মানেই হয় না।

দ্বিতীয়ত এই সব ব্যবস্থার সঙ্গে আমরা যদি পরিপূরক পরিবর্তনগুলি না করি —যাতে লোকে ফর্ম ভর্তি না ক'রে এবং এক গাদা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এক মুদ্রা থেকে অন্য মুদ্রায় টাকা ভাঙাতে পারে—তাহলে এই নতুন ব্যবস্থাগুলি নেহাতই লোক-দেখানো ব্যাপার হয়ে থাকবে, কার্যত তাদের ফল দাঁড়াবে অবমূল্যায়ন। আমার কাছে তাই এই convertibitity পরিকল্পনার মূল্য কেবল বিদেশি মুদ্রার বাজারে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ রূপেই। উক্ত লক্ষ্যে এগোনোর সময় আমাদের দুটি পরস্পরবিরোধী বিপদের মাঝখান দিয়ে সতর্কভাবে পথ ক'রে নিতে হবে। একটা বিপদ হল এতই আস্তে চলা যে তার ফলে কার্যত আংশিক convertibitity তেই ঠেকে থাকা ; অন্যটা হল বেশি দ্রুত চ'লে শেষে আবার উল্টো মুখে হাঁটতে হওয়া। কর্মপন্থার এ রকম দোদুল্যমানতা পুঁজি পলায়নের কারণ হতে পারে। এটা একটা দূরপরাহত বিপদের কথা নয়—সফলতম উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও কর্মপন্থার দোদুল্যমানতা দেখা গেছে। যেমন দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৮০ সালে ছিল পূর্ণ current-account convertibitity, ১৯৮৫তে তা থেকে পশ্চাদপসরণ ক'রে আরোপিত হল বিধিনিষেধ, তারপর ১৯৮৯তে আবার প্রবর্তিত হল convertibitity।

বাজারের বাধামুক্তি কেবল প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, দারিদ্র্য দূরীকরণের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকেও বাঞ্ছনীয় ; তবে স্বল্পমেয়াদে তা নানা দুঃখকষ্ট ডেকে আনতে পারে, যেমন বাড়িয়ে দিতে পারে বেকারির মাত্রা। এ সময় তাই ব্যয় বাড়ানো উচিত মৌল প্রয়োজনপূরণের খাতে—চিকিৎসায়, প্রাথমিক শিক্ষায়, গরিবদের জন্য খাদ্য-ভরতুকিতে। ভারতের বেলায় এর প্রয়োজন খুবই বেশি, কারণ চল্লিশ বছরের বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্যের মান শোচনীয়। এ কথা সত্য কেবল দুর্নীতি আর তছরুপের বিচারেই নয়, মোট বরাদ্দের বিচারেও। সদ্য প্রকাশিত World Development Report (১৯৯২)এ দেখা যায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আমাদের সরকারের ব্যয়ের ভাগ শতকরা ৪·১—যেখানে দক্ষিণ কোরিয়ার শতকরা ২১·৮, থাইল্যান্ডের ২৬·৯।

এ বছরের বাজেট-বরাদ্দ থেকে মনে হয় না এ অঙ্কগুলোর কোনো পরিবর্তন ঘটবে। উপরন্তু কাঠামোগত বেকারির প্রতিবিধানকল্পে যেসব বিশেষ ব্যবস্থা ঘোষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে—যেমন National Renewal Fund —সেগুলো বড়ই অকিঞ্চিৎকর। বিদ্যমান গণ বিতরণ পরিকল্পনার (public distribution scheme) পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন, যাতে শহুরে ধনীদের খাদ্য-ভরতুকি যোগানোর বদলে গ্রামের গরিবদের তার আওতায় আনা যায়—কিন্তু এ ক্ষেত্রেও প্রায় কিছুই করা হয়নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে এত সব করার টাকা জুটবে কোত্থেকে? মৌল প্রয়োজন পূরণের কর্মসূচী সম্প্রসারিত করতে গেলে রাজস্ব ঘাটতি কি বেড়ে যাবে না? এইখানেই সরকারের অপচয় সম্বন্ধে আমার ইতিপূর্বের মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। শুধু সরকারি অপচয় ও সার-ভরতুকির মতো অনুৎপাদক ভরতুকি বিলুপ্ত ক'রেই যথেষ্ট টাকা তোলা সম্ভব। আমি জানি, রাজনৈতিকভাবে এগুলো দুরূহ। ১৯৯১-এর কেন্দ্রীয় বাজেটের সার-ভরতুকি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব প্রভাব-জোটের চাপ ও রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে কিভাবে ধামাচাপা প'ড়ে গেল তা আমরা দেখেছি। তবু, মৌল প্রয়োজন-পূরক কর্মসূচী ও বাজারের মুক্তি-বিধানের প্রয়াস যে পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক, সেটা বোঝা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(প্রথম প্রকাশ ১৯৯২)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ঘণ্ট

অ-কালিক কারণ ১৩৫
অ-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ১২৬
অগুস্তাঁ কুর্নো ২৯
অগ্রহণীয় সহসম্পর্ক ১৩৬
অতীত প্রবণতার সরল অভিক্ষেপ ২৫-২৬
অধোগতিশীল কর ব্যবস্থা ৯৮
অনন্যতা-ধর্মসমূহ ১১৮
অনাভ্যন্তরিকতা ৪০, ৫৫, ১১২
অনুন্নত অর্থনীতির 'টেক অফ' ৫৪
অনুশাসনমূলক মতবাদ ১১১
অন্তঃশুল্ক ৫৭
অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির অর্থনীতি ১০০
অবাধ অর্থনীতি ২০, ১১১
অবাধ বাজার ৯৪
অবাধ বাণিজ্য ২১
অভিজ্ঞতামূলক প্রতিজ্ঞা ১৩৬
অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গণনা ২৫
অর্থনৈতিক সমীক্ষা ৮২
অসম জ্ঞানের সমস্যা ১২৬
অস্কার মর্জেনস্টের্ন ৩০
অ্যাডাম স্মিথ ২৭, ১১১
অ্যাব্রেসিভস অ্যান্ড কাস্টিংস লিমিটেড ৮৭

'আ লা রশের্শ দ্যুন দিসিপ্লিন একোনোমিক' ২৯
আঁদ্রে বেতেই ৩৬
আনন্দ চক্রবর্তী ৩৫-৩৬
আন্তর্জাতিক ঋণ ১০৪
আয়কর-দায়ী পর্যায়সমূহ ৬০
আয়করের পর্যায়-বিন্যাস ৬৩
আরবেলিয়া ৯১
আর্জেন্টিনা ১৪৮
আর্থিক জড়তা ৯৯
আলকেমি ২৬
আলে *দেখুন* মোরিস আলে

ইংলন্ড ৬১
'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি' ৫৮
'ইকনমিক জার্নাল' ২৩, ৩৪
'ইকোল নাসিওনাল দে দৎ মিন' ২৯
ইজরায়েল ৬১-৬২
ইন্ডিয়া অফিস (লণ্ডন) ৩৩
ইন্ডিয়ান ইকনোমেট্রিক সোসাইটি ১৫
ইতালি ৬৪
ইন্দোনেশিয়া ২৩
ইয়ানোস কোরনাই ৫৪
ইরাক ১৪৯

উত্তর আমেরিকা ৪২
উত্তর রাজস্থান ৪৫
উৎপাদক সরকার ৫৬
উৎপাদন অপেক্ষক ১৩৭
উৎপাদন-প্রতিবন্ধ ৫৫
উদারতর বাণিজ্যনীতি ৮০
উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি পীড়িত বাজার ২৮
উপদেষ্টা ব্যবসায় ১৪
উপসাগরীয় যুদ্ধ ১৪৩, ১৪৬

ঋণ সম্পর্কাবলী ১১৬

এক মজুরি ও আয় নীতি ৬১
এশিয়া ৫৮
এশিয়াড ৯২
'এশিয়ান ড্রামা' ৪৯
এস. এস. আর. সি-ব্রুকিংস ২৬
এসকর্টস ৪৩

'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' ৬৬
ওয়াশিংটন ৯৭, ৯৯
'ওয়েলথ অ্যান্ড প্রভার্টি' ১৯

কনোরিয়া ওভারসিজ লিমিটেড ৮৭
কর কাঠামোর প্রগতিশীলতা ৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর ফাঁকি ৭৩
করদায়ী আয় ৭৩
করদায়ী পর্যায় ৫৮
করপ্রণালী ৫৮
করের প্রান্তিক হার ৭৬
কর্মকাণ্ড ৫১
কলকাতা ৮৭, ৮৯
'কাজের বদলে খাদ্য' কার্যক্রম ৪৯
কার্টার (প্রেসিডেন্ট) ৯৯
কার্লেকর *দেখুন* মালবিকা কার্লেকর
কিউবা ১১৭
কিন্‌সের তত্ত্ব ১৩২
কুয়েত ১৪৯
কেইন্‌স *দেখুন* জন মেনার্ড কেইন্‌স
কেইন্‌সীয় পরিস্থিতি ১০০
কেনেথ অ্যারো ২৭
কোকা কোলা বিতাড়ন ৫৪
কোপার্নিকাস ২৬, ১২২
কোরিয়া ৬৬-৬৭
'ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড ফ্রিডম' ২০
ক্রমহ্রাসমান পড়তা ২৩
ক্রান্তি বিন্দু ৯৭

খিদিরপুর ডক ৮৭

গণ বিতরণ পরিকল্পনা ১৫১
গলব্রেথ ১৭, ৫৮
গান্ধি টুপি ৫৩
গান্ধিবাদী আদর্শ ৫৩
গান্ধিবাদী সততা ৫৩
গিল্ডার *দেখুন* জর্জ গিল্ডার
গুনার মিরদাল ৪৯
'গেম থিওরি' ১১২
গ্যালিলিও ১২২
গ্রামীণ উৎপাদন কারক ১২৩

ঘাটতি অর্থনীতি ১০১
ঘাটতি বাজেট ১০০

চক্রবর্তী *দেখুন* আনন্দ চক্রবর্তী
চার্লস পিয়ার্সন ৮৯
চীন ১৬, ২২-২৩, ৬৭, ১০৬, ১৪৮-১৪৯
'চুক্তি বলবৎকারী ব্যবস্থা' ১২৬-১২৭
চুক্তিপালনের অনুশাসন ১১৯
চর্নোবিল ১০২

জন উপযোগ ২৯
জন কুরিয়েন ৫৮
জন ফন নোম্যান ৩০
জন-বন্টন ব্যবস্থা ৮৪
জন বের্নুলি ৩০
জন মেনার্ড কেইন্‌স ৩২-৩৪, ৯৯-১০০, ১৩৮
জন স্টুয়ার্ট মিল ৭৬
জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধি ১০৫-১০৬
জর্জ গিল্ডার ১৭-১৯
জাতীয় আয় ৪৫
জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচী ৭৯, ৮১
জেরার্ড দেব্রু ২৭, ২৯
জ্যুল দুপ্যুই ২৯

টাকার পরিমাণতত্ত্ব ১৮
টোকিও ১০৫
ট্রোজান ঘোড়া' ৯৭

ডানকান গ্রান্ট ৩২-৩৩
ডাম্পিং ৩৯-৪০
ডিউক অব ওয়েলিংটন ৮৯
ডেনমার্ক ৬৩
ডেভিড হিউম ১২৮
ডেভিড হেন্ড্রি ২২

তাইওয়ান ৫৮, ১৪৯
তৃতীয় বিশ্বের ঋণ ১০৩
তেণ্ডুলকর *দেখুন* সুরেশ তেণ্ডুলকর

থাইল্যান্ড ১৪৯
থ্যাচার ২৭

দক্ষিণ এশিয়া ৪৯, ১০৭
দক্ষিণ কোরিয়া ১৬, ৫৬-৫৮, ৮৪, ১৪৯-১৫০
দর-সূচক ৬০
দানিয়েল ৩০
দামের স্তর ১৮
দারিদ্র্য-নিবারণী কর্মসূচী ৭৯
'দি অ্যাটলান্টিক মান্থলি' ৯৭
'দি ইকনমিস্ট' ২৭
দিল্লি ৪২, ৫২, ৯৩, ১১৪
দিল্লি বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৮ ৯৩
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ৪২, ৫২, ১১৪
দেব্রু *দেখুন* জেরার্ড দেব্রু
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২৫
দ্রব্য-বিনিময় ১১৭

নগদ-তত্ত্ব ১৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নব্য ক্লাসিকাল সাধারণ সুস্থিত তত্ত্ব ২৭
নব্য-প্রাতিষ্ঠানিক ধারা ১২৬
নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতি ১০০
নিউজিল্যান্ড ৬৭
নিও-ক্লাসিকাল অর্থনীতি ১০০
নিকোলাই শমেলিয়ভ ১০১-১০২
নিয়ন্ত্রক সরকার ৫৭
নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ১৩১
নির্ণয়বাদ ১৩৩, ১৩৯
নেদারল্যান্ড ৬৩
নেভিল *দেখুন* নেভিল কেইনস
নেভিল কেইনস ৩৩-৩৪
নোবেল পুরস্কার ২৫, ২৭, ২৯
'নোভি মির' ১০১
ন্যায্যতা ৪০

পয়সা সংকট ৪১-৪২
পরিবার-ব্যবস্থার ক্ষয় ১০৬
পরিভোক্তা তত্ত্ব ১৩৬, ১৩৮
পরিভোগ অপেক্ষক ১৩৭
পরিভোগকারী ২৩
পরিভোগকারীর উদ্বৃত্ত ২৯
পরিসংখ্যান বিভাজন ১৮
পল স্যামুয়েলসন ২৫, ৩০
পশ্চাৎমুখী আরোহ ১১৮
পশ্চিম এশিয়া ১৪৯
পাকিস্তান ৫৬
পারি ২৯
'পারেতো উন্নতি' ৭৮, ১২২-১২৩
'পারেতো কাম্যতা' ১১৩, ১১৫, ১২২-১২৩
পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ২৫
পেরেস্ত্রেইকা ৬৬, ১০১-১০২
পৌনঃপুন্য তত্ত্ব ১৩৮
প্রত্যক্ষবাদী অর্থনীতি ১১১
প্রত্যয়হীনতার সাহস ১২১
প্রবৃদ্ধি-পথ ১৬
প্রবৃদ্ধি হার ১৬
প্রভাবজোট ৮০
প্রত্যাবৃত্তি স্থাপন ২৩
'প্রাইস থিওরি' ২০
প্রাতিষ্ঠানিক আয়কর ৭৮
প্রান্তিক দক্ষতা ১৩৭
প্রান্তিক নীতি ৫২

ফিনল্যান্ড ৬১-৬২
ফ্রান্স ৬২
'ফ্রি টু চুজ' ২০
ফ্র্যাংক হান ২৩

'বন্দীর উভয় সংকট' ১১৮
বর্ণ-নিরপেক্ষ দেশান্তরণ-নীতি ৪৫
বর্ণ সম্পর্কাবলী ১১৬
বহিঃশুল্ক ৫৭
বহুল সম্ভাবনা ১১৮
বাংলাদেশ ২৩, ৪৯, ৫৭, ১১৭
বাজেট ও মূল্যস্ফীতি ৭১
বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন ৯৩
বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ৬৬
বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা ৭৮
বার্ট্রান্ড রাসেল ৩৩
বি. শিবরামাইয়া ৩৫
বিকল্প অনুমিতি ১৩৭
বিত্তকর ৭৮
বিশ্বব্যাঙ্ক ৮৩
বিহার ১৬
বেতেই *দেখুন* আঁদ্রে বেতেই
বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি ১৩
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের নীতি ৬৭
বোটানিকাল গার্ডেন ৮৭
বোম্বাই ৪১
বোয়াতো ৩০
ব্যক্তিগত আয়কর ৭৮
ব্যক্তিগত প্রণোদনা ১২২
ব্যয়-উপকার ২৯
ব্যাঙ্গালোর ১৫
ব্রহ্মানন্দ ১৫
ব্রাসেলস ২৩
ব্রিটেন ১৮
ব্রুকলিন ১০৭
ব্রেজিল ৬২-৬৩, ৬৭, ১০৩

ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ আইন ১২৪
ভার্জিনিয়া ৪২
ভারত *দেখুন* ভারতবর্ষ
ভারতবর্ষ ২২-২৩, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৯-৫০, ৫২-৫৩, ৫৬-৫৭, ৬০, ৬৬, ৭৭, ৮৩-৮৪, ৯৮, ১০৬, ১২১-১২২, ১২৫, ১৪৩, ১৪৭-১৪৯
'ভারতবর্ষে পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা' ১৫

ভিলফ্রেদো পারেতো ৬৪

মজবুত সহসম্পর্ক ১৩৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজুরি সূচকীকরণ ৬০-৬১
মনমোহন সিং (ডঃ) ১৪৩
মনোরঞ্জন মহাস্তি ৩৫-৩৬
মন্দা ১৩
মহা মন্দা ৩২, ৫২
মাঝারি মেয়াদের ফলশ্রুতি ১৫
মারুতি উদ্যোগ ৪৩-৪৪
মারোয়াড় ৪৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮, ৬০, ৯৯, ১০৩, ১০৭-১০৮, ১১৭, ১২৫
মালবিকা কার্লেকর ৩৫-৩৬
মালয়েশিয়া ১৪৯
মাল্যাঁভো ৩০, ১০০
মিখাইল গর্ভাচেভ ১০১
মিলটন ফ্রিডম্যান/মিল্টন ফ্রিডম্যান ১৭, ২০, ২২-২৪, ৬৩
মিশর ৫৭
মিশ্র অর্থনীতি ৫৬-৫৭
মুক্ত বাণিজ্যনীতি ৬৭
মুদ্রাসংকোচ ১৮
মুদ্রাস্ফীতি ১৮, ২৬, ৬১, ৬৩, ৮৩-৮৪, ৯৯, ১২৬-১২৭, ১৩৫, ১৪৬
মূল ৩৩
মূলধন বৃদ্ধি কর ৭৮
'মূল্যতত্ত্ব' ২৭
মূল্য ব্যবস্থা ১১২
মূল্যস্ফীতি ১৩, ২১-২২, ৪২, ৫৮, ৬০-৬৩, ৭১-৭৩, ৭৮-৮০, ৮৩, ৯৪, ১০১, ১৪৭
মেক্সিকো ৫৭, ১০৩
মেট্রো রেল ৮৯-৯০
'মেধা ক্ষরণ' ৪৫
মেনার্ড *দেখুন* জন মেনার্ড কেইন্‌স
মোট জাতীয় উৎপাদন ১৬, ২৬, ১৪৫
মোরিস আলে ২৯-৩০
মৌলকাঠামোর প্রতিবন্ধ ৫৪
'মৌলকাঠামোর সমস্যাবলী' ৫৪
মৌল প্রয়োজন পূরক কর্মসূচী ৮৪
'ম্যাকবেথ' ১৩৯
ম্যাক্স ওয়েবার ৩৫

যথোচিত মাত্রা ৫১
যুগোস্লাভিয়া ২৩
যোগান-পন্থী অর্থনীতি ৯৭
যোজনা কমিশন ৪৭
যৌগিক অপেক্ষক ১৪০

রজেটের থিসোরস ১৭
রয় হ্যারড ৩২, ৩৪
রাজস্থান ৪৫
রাশিয়া ২২-২৩
রিজার্ভ ব্যাংক ৪১, ১৪৮
রেগান (প্রেসিডেন্ট) ২৭, ৯৭, ৯৯
রোজ ফ্রিডম্যান ২০

লন্ডন ৩৩, ৮৯
লয়েড জর্জ ৩২, ৩৪
লরেন্স ক্লাইন ২৫
লাতিন আমেরিকা ১৪৪, ১৪৮
লাল কেল্লা ১১৪
লিওনার্ড স্যাভেজ ৩১
লিটন স্ট্র্যাচি ৩৩
লিডিয়া লোপোকোভা ৩২-৩৩
লোজান ঘরানার ধারণাবলী ৩০
'ল্যাফার লেখ' ৯৭

শ্‌মেলিয়ভ *দেখুন* নিকোলাই শ্‌মেলিয়ভ
শিকাগো ১৩৬
শেকসপিয়র ৯১, ১৩৯
শ্রমনিবিড় বিলাস পণ্য ৪৮
শ্রীলংকা/শ্রীলঙ্কা ১৬, ৫৬

সংরক্ষণপন্থী চিন্তা ৪৪
সংশয়বাদ ১৪
সংস্থান বন্টন ৪৭
সংস্থান ব্যবহারের দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধি ২৯
'সঁএ নাসিওনাল দ্য ল্য রশের্শ সিয়ঁতিফিক' ২৯
সততার স্থিতিস্থাপকতা ৭৫
সমতাবিষয়ক নীতি ৬১
সমষ্টিগত অর্থনীতি ৯৯-১০০
'সম্পদ ও দারিদ্র্য' ১৭
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ১১১
সমাধান-ধারণা ১১৮
সমানুপাতী চরিত্র ৫৮
সাদামাটা অর্থবাদী তত্ত্ব ৪২
সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব ১১৩
সাধারণ স্থিতি ২৩
সামাজিক অনুশাসন ১১৩, ১১৫, ১১৮
সালমান রুশদি ১৭
সিঙ্গাপুর ৬৬-৬৭, ১৪৯
সিদ্ধান্ত তত্ত্ব ৩০
'সীমিত চুক্তি বলবৎকারী ব্যবস্থা' ১২৭
সুইজারল্যান্ড ৬৩
সুখময় চক্রবর্তী ১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুযোগের সমতা' ৩৬
সুরেশ তেণ্ডুলকর ৩৫
সূচকীকরণ ৬০-৬১, ৬৩
সূচকীকৃত বন্ড ৬২
সেন্ট পিটার্সবুর্গ ৩০
সোভিয়েত ইউনিয়ন ১০১
সোমোজা ১০৪
স্কিডেলস্কি ৩২, ৩৪
স্টার্ন ৭৪
'স্থিতীয় কারণ' ১৩৫
স্থিতীয় তত্ত্বাবলী ১৩৭
স্পেন ৬৭
স্বতস্ফল প্রবৃদ্ধি ৫৪
স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব ১৩৮
স্বভাবজ জ্ঞান ২৫
স্যামুয়েলসন *দেখুন* পল স্যামুয়েলসন

হিউম ১৩৬
হিক্স (অধ্যাপক) ১৩১-১৩৮
হুগলী নদী ৮৭
হেত্বাভাস ১৩৯-১৪০
হোয়াইটহেড ৩৩
হোয়ার্টন স্কুল ২৬

A. Bagchi ৭৪
A. Gupta ৭৪
A wage and income policy ৬১
Abraham ১১৫-১১৬
Adewale Maja-Pearce ১১২
Akerlof ১১৫-১১৬, ১১৯, ১২৬
Andre Beteille ৩৫
Aristotle ৩৬
Arthur Laffer ৯৭
asymmetric information problems ১২৬

balance of payments ৬৭
balance of trade ৬৬
Brain drain ৪৫
Bruno de Finetti ৩১

'Cambridge Journal of Economics' ১২৩
Capital gain Tax ৭৮
Capital schedule ১৩৭
'Causality in Economics' ১৩১
Chandavarkar ১১৪
Clower ৯৯
Collected Works of John Maynard Keynes ১৩৭
Compulsory Deposit Scheme ৭৮
Consumer Preferance Theory ১৩৮
Consumer's surplus ২৯
Cost-benefit ২৯
Critical point ৯৭
customs ৫৭

D. Moggeridge ১৩৭
David Stockman ৯৭
deficit financing ১০০
deflation ১৮
deposit certificate scheme ৭২
'Distributional Equity, Government Revenue and Price and Tax Policies in India' ৭৪

Econometric model ২৫-২৬
'Economic and Political, weekly' ১৪৩
Economic Administration Reforms Commission ৯৩-৯৪, ১২৫
'Economica' ২২
Edemond Malinvaud ৯৯
'Elsaticity of Non-Corporate Income Tax in India' ৭৪
Equity ৪০, ৪৩
'Equality and Inequality' ৩৬
excise ৫৭
externalities ৪০

Father Thomas Caccini ১২২
'Free to Choose' ২৪

General equilibrium theory ২৩, ১১৩
George Akerlof ৯৩
George Simmel ১১৫
Gerard Debreu ২৭-২৮, ৩০
Great Depression ৩২, ৫২
Griffin ১১৪

Herbert Barringer ১০৭-১০৮
Herbert Simon ১৩৪

IMF ১৪৩
income tax brackets ৬০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

indexation ৬০
India Development Bonds ১৪৮
'Indian Economic Review' ৭৪
Institute of Economic Growth ৭৪
Integrated Rural Development Programme ৫৮

J. R. Lucas ১৩৩
Jan Tinbergen ২৫
Jefferys ১৩৮
John Maynard Keynes ৩২
'John Maynard Keynes: Hopes Betrayed, 1883-1920' ৩৪
Laffer curve ১৭, ৯৭
laissez-faire system ২০, ৯৪, ১১১
Leijonhufvud ৯৯
'lemons principle' ৯৩
Leon Walras ২৭
liquidity preference ১৩৭
Llewllyn ২২
Locke ৩৬
'London Magazine' ১১২
Lyons ১৩৯

M. Govinda Rao ৭৪
M. N. Murti ৭৪
macroeconomics ২৫, ৯৯, ১৩২, ১৩৭
macromodel ২৫-২৬
Manufacturers' Association ৬১
Marx ৩৬
Maurice Allais ২৯
medium-term prospect ১৫
Michel Levin ১০৭-১০৮
microeconomics ২১
Milton Friedman ২৪
Monetarist ৪২
multiple possibilities ১১৮

N. Stem ৭৪
National Housing Bank ১৪৬
National Renewal Fund ১৫১
National Rural Employment Programme ৫৮, ৭৯
neoclassical ১০০
new institutional school ১২৬

Optimal level ৫১

Peter Drucker ৬৬
Peter Xenos ১০৭-১০৮
Platteau ১১৫-১১৬
Population Research Institute ১০৫
price index ৬০
Price level ১৮
price mechanism ১১২
prisoner's Dilemma ১১৮
production function ১৩৭
progressive ৫৮
project ৫১
public-benefit ২৯
public distribution scheme ১৫১
Pyrrho ১৪'

Ragnar Frisch ২৫
Rawls ৩৬
resource allocation ৪৭
Robert Skidelsky ৩৪
Rose Friedman ২৪
Rousseau ৩৬
Russell ১৪

Saint-Exupery ৮১
solution concept ১১৮
Stagflation ৯৯
Stagnation ৯৯
'Studies in Economics Method' ১৩৪

T. C. Koopmans ১৩৪
Tax brackets ৫৮, ৭২
'Tax Reform: Income Distribution, Government Revenue and Planning' ৭৪
tax schedule ৫৮
'The Economic Consequences of Peace' ৩৪
'The Theory of Value' ২৭
'The Witches' Sabbath' ৬২
Thomas Mann ৬২
Tom Stoppard ১২১
trickle-down effect ৮০

uniqueness properties ১১৮

Vaclav Havel ১১৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

W. C. Wood ১৩৪
Witcomb ২২
Wittgenstein ১৪
World Development Report ৮৩, ১৫০
Yale University Press ১৩৪
Ysidro Edgeworth ২৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~